গদ্য-সমালোচনা সংখ্যা

সম্পাদকীয়

'ভাল লেগেছে', 'মোটামুটি', 'মন্দ হয়নি', 'চলনসই'— এসব মন্তব্য করা আর পাঠকৃতির সমালোচনা করা এক জিনিস নয়। সমালোচনার জন্যে মাপকাঠি চাই। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ লেখকরা বিভিন্ন সময়ে সমালোচনার বিভিন্ন মাপকাঠি তৈরি করে গেছেন। আই. এ. রিচার্ড কিংবা ওয়ার্ডসওয়ার্থ-শেলি-এলিয়ট অথবা বাখতিন-ঈগলটন-বার্ত-দারিদা-ফুকো সবাই সমালোচনার একেকটি ধারা ও ধরনের প্রবক্তা। সমালোচনা আর্কিটাইপ্যাল হবে, না পোস্ট-স্ট্রাকচারাল হবে, না কি ফর্মাল হবে সেটা নির্ভর করবে সমালোচকের ভাবাদর্শগত অবস্থানের ওপর। অর্থাৎ সমালোচক সমালোচনার কোন তত্ত্বে বিশ্বাস করেন তার ওপর নির্ভর করবে সমালোচনার ধরন। রোমান্টিকদের সঙ্গে বাস্তববাদীদের মতানৈক্য অনেক দিনের। ভাববাদীদের সঙ্গে বস্তুবাদীদের দা-কুমড়ো সম্পর্ক। ভাববাদীরা লেখককে তো ঈশ্বরই বানিয়ে ফেলেছেন। আর পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদ আজ যেখানে দাঁড়িয়ে আছে, সেখান থেকে বলা হচ্ছে লেখক সূত্রধারমাত্র, তাঁর পাঠকৃতিকে আদিবয়ন হিসেবে ধরে নিয়ে বলা হচ্ছে প্রকৃত পাঠকই সেই আদিবয়নকে বিনির্মাণ ও পুনর্নির্মাণ করেন। লেখকের প্রাধান্য সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁরা স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে, একটি লেখা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের মৃত্যু হয়, আর সেই সঙ্গে পাঠকৃতিকে ঘিরে শুরু হয়ে যায় পাঠকের নব নব অন্বেষণের পালা। রোলাঁ বার্ত এ ব্যাপারটার সপক্ষে জোরালো তাত্ত্বিক প্রতিবেদন উপস্থাপন করেছেন। পূর্বসূরী সমালোচক আই. এ. রিচার্ড-এর লেখায়ও তার সমর্থন মেলে যদিও. তবু রিচার্ড সমালোচনার অন্য ধারা অনুসরণ করেছিলেন। পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদের বিপরীতে যদি 'লেখক-প্রতিক্রিয়াবাদ' অভিধায় ভাববাদী সমালোচনার ধারাকে স্থাপন করা যায়, তা হলে দেখা যাবে প্রথমোক্তটির প্রক্রিয়া গণতান্ত্রিক এবং শেষোক্তটির প্রক্রিয়া এককেন্দ্রিক। সমালোচক যদি গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন হন তা হলে অবশ্যই তিনি পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদকে মানবেন, লেখককে দেবতার আসনে বসাবেন না।

কোনও কথা, কোনও তত্ত্বই যেহেতু শেষ কথা বলতে পারে না, যেহেতু আরও তত্ত্ব আসবে, পোস্ট-মডার্নিজমের পর আসতে পারে পোস্ট-পোস্টমডার্নিজম, অতএব সমালোচনার ধারাও পাল্টে যেতে পারে হয়তো। তবু একটি কথা অবশ্যই বলা যায়, সমালোচক একাধারে সচেতন পাঠক। কিন্তু সব পাঠকই পাঠক নয় যেরকম সব কবিই কবি নয়। যেহেতু সব পড়া-ই পড়া নয়, অতএব পড়া কাকে বলে সেটা সাব্যস্ত হওয়া দরকার। এক কথায় প্রকাশ করার মতো বলা যায়, পড়া মানে হয়ে-ওঠা। বাখতিন কথিত 'দ্রষ্টা চক্ষু' যার াছে, তিনিই প্রকৃত পাঠক। চিহ্নের জগতে অনন্ত চিহ্নায়িতের প্রবহমান ধারা থেকে যিনি ড়ুষমাত্র তুলে আনেন যা পূর্বোক্ত কোনও তাৎপর্যের পরিণতি কিন্তু নতুন কোনও বাচনের ৎস, তিনিই প্রকৃত পাঠক। 'স্বদেশ'-এর গদ্য-সমালোচনা সংখ্যা প্রকাশের সার্থকতা তখনই বে যখন এর পাঠক রোলাঁ বার্তের ভাষায় বলতে পারবেন, "I name, I unname, I ename, thus passes the text : it is a nomination in the becoming"

সুবর্ণলতা ঃ নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প

তপোধীর ভট্টাচার্য

'আপাতদৃষ্টিতে 'সুবর্ণলতা' একটি জীবনকাহিনী, কিন্তু সেইটুকুই এই গ্রন্থের শেষ কথা নয়। সুবর্ণলতা একটি বিশেষ কালের আলেখ্য। যে কাল সদ্যবিগত, যে কাল হয়তো বা আজও সমাজের এখানে সেখানে তার ছায়া ফেলে রেখেছে। 'সুবর্ণলতা' সেই বন্ধন-জর্জরিত কালের মুক্তিকামী আত্মার ব্যাকুল যন্ত্রণার প্রতীক।

আর একটি কথা বলা আবশ্যক। আমার 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' গ্রন্থের সঙ্গে এর একটি যোগসূত্র আছে। সে যোগসূত্র কাহিনীর প্রয়োজনে নয়, একটি 'ভাব'কে পরবর্তী কালের ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে।

সমাজবিজ্ঞানীরা লিখে রাখেন সমাজ-বিবর্তনের ইতিহাস, আমি একটি কাহিনীর মধ্যে সেই বিবর্তনের একটি রেখাঙ্কনের সামান্য চেষ্টা করেছি মাত্র।'

'সুবর্ণলতা'র বয়ান শুরু হওয়ার আগে আশাপূর্ণা দেবী এভাবে পরাপাঠ সম্পর্কে আমাদের অবহিত করে তোলেন। বুঝে নিই, এমন-এক উপন্যাস উন্মোচিত হতে যাচ্ছে, যা নিছক নান্দনিক তাগিদে রচিত নয়। এরও মর্মে রয়েছে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান এবং অস্থির ভেতর রয়েছে ইতিহাসচেতনা। রাজারানির ইতিহাস নয়, চলমান জীবনপ্রবাহের ইতিকথা। অসাধারণ সাধাবণ যাঁরা, সেইসব মানুষ-মানুষীর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি নিঙড়ে-নেওয়া বৃত্তান্ত। আর, সেইসব বৃত্তান্তের আলো-আঁধার, উচ্চাবচতা, সম্ভাবনা ও অন্ধবিন্দু। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে যে নারী-পরিসরের সন্ধান থেকে নারীর বয়ান প্রস্তাবিত হয়েছিল, তারই স্বাভাবিক বিস্তার ঘটেছে 'সুবর্ণলতা'য়। তবু, এ এক আলাদা পাঠকৃতি ; তাই নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য ও সামগ্রিকতা রয়েছে তার। 'একটি বিশেষ কালের আলেখ্য' বলেই নয় ; সমাজ-বিবর্তনের বৃহত্তর ইতিহাসের পটে একক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাহিত্যিক পাঠকৃতির নিজস্ব সংকেতগূঢ় ভাষায় ব্যক্ত করছে বলেই এর নিবিড় পাঠ জরুরি।

প্রজন্মের পরে প্রজন্ম আধিপত্যবাদী অচলায়তনের বিরুদ্ধে সচেতন ও অবচেতন লড়াই চালিয়ে যায়। সত্যবতীরা যতটুকু জমি অর্জন করতে পারে, তার পরিধি প্রসারিত করার পরিবর্তে পরবর্তী প্রজন্মের সুবর্ণলতারা হয়তো তাও হারিয়ে ফেলে। এক কদম এগিয়ে দু'কদম পিছিয়ে যাওয়ার মধ্যেও চলমান ইতিহাসের সত্য প্রমাণিত হয়। আশাপূর্ণার ত্রয়ী উপন্যাসে স্তরে স্তরে বিন্যস্ত রয়েছে পৌর সমাজের অবরুদ্ধ অন্দরমহলের নিরন্তর ভাঙাগড়ার ইতিবৃত্ত। এই ইতিবৃত্ত যেহেতু রচিত হয়েছে অন্তঃপুরবাসিনী এক নারীর কলমে, পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের দ্বারা গ্রস্ত ইতিহাস পুনঃপঠিত ও পুনর্বিবেচিত হয়েছে। উত্থান-পতনের কিংবা ক্রম-বিবর্তিত মূল্যবোধের যেসব ধারণার ওপর গড়ে ওঠে পৌর সমাজের ইতিহাস, আশাপূর্ণা দেখিয়েছেন, একে স্বতঃসিদ্ধ বলে বিনা প্রশ্নে গ্রহণ করা যায় না। পিতৃতন্ত্রের আগ্রাসী উপস্থিতিতে যে-পরিসর কার্যত অনুপস্থিত, তাকে আবিষ্কার করার জন্যে আশাপূর্ণা মূলত যাবতীয় যথাপ্রাপ্ত অবস্থানকে তীক্ষ্ণ জিজ্ঞাসায় বিদ্ধ করেছেন। পশ্চিমী তাত্ত্বিকেরা যে ধরনের interrogation কে নব্য পাঠকৃতির ভিত্তি বলে নির্দেশ করেছেন, আশাপূর্ণা নিজস্ব জীবনানুধ্যায় থেকে সেই

ক্রিয়াকে সুবর্ণলতার বয়ানে সক্রিয় করে তুলেছেন।

নারীর নিজস্ব সংবেদনা দিয়ে নারীর একান্ত আপন কথা লিখতে গিয়ে আশাপূর্ণা লিত নৈঃশব্দ্যের ঝরোখা সরিয়ে দিতে চেয়েছেন। এই ঝরোখার আড়ালে যুগের পথে যুগ ধরে অজ্ঞাত ও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে প্রকৃত নারীসত্তা। এই নৈঃশব্দ্য নির্মাণ করেছে পিতৃতন্ত্র; নারীর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে প্রতিমা হয়ে ওঠার নিশ্ছিদ্র আয়োজন। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের স্বেচ্ছাবৃত্ত পুতুল হওয়াতে নারীত্বের অবিচল প্রতিষ্ঠা — ধর্মতন্ত্র নিরলসভাবে এই আদর্শ প্রচার করে গেছে। পুরুষের ভাষা, চেতনা, বিশ্বাস, মূল্যবোধ যে-ছাঁচ তৈরি করেছে, তাকে সাগ্রহে ও প্রবল উন্মাদনায় মান্যতা দেয় যারা —তাদের আদর্শ নারী বলে বন্দনা করেছে রক্ষণশীল পৌর সমাজ। সত্যবতীর প্রতিবাদ ছিল অচলায়তনের এই সর্বগ্রাসী বৌদ্ধিক ও আস্তিত্বিক সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে। অন্তেবাসী নারীর মানুষ হয়ে ওঠার সেই প্রথম প্রতিশ্রুতি কিন্তু সরলীকৃত পাটিগণিতের নিয়মে রক্ষিত হয় না। কোনও-এক সুবর্ণলতা প্রতিবাদের স্ফুলিঙ্গ মননে জাগিয়ে রেখেও ইপ্সিত অগ্ন্যাধান করতে পারে না নিষ্ঠুর ও বিবেকশূন্য পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বাস্তব পরিস্থিতির চাপে। তবু, সমস্ত তাৎপর্য যেহেতু সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়, তার ব্যক্তিগত পরাজয়ও একমাত্রিক নয়। নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প উপন্যাসের নির্বিচার বার্তা হিসেবে সতর্ক পাঠকের কাছে ঠিকই পৌঁছে যায়। পাঠক লক্ষ করেন ঃ

'সুবর্ণলতা সেই দুর্লভ মেয়েদের একজন—যারা তাদের কালকে অতিক্রম করে যায় — এগিয়ে দেয় প্রবহমাণ কালের ধারাকে, যে ধারা মাঝে মাঝে স্তিমিত হয়ে যায়, নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়। এরা বর্তমান কালের পূজা পায় কদাচিৎ, এরা লাঞ্ছিত হয়, উপহাসিত হয়, সমসাময়িক সমাজের বিরক্তিভাজন হয়। এদের জন্য কাঁটার মুকুট, এদের জন্য জুতোর মালা। ... তবু এরাই একদিন স্মরণীয় হয়ে ওঠে— এদের দিয়েই সাহিত্যসৃষ্টি হয়। ... সুবর্ণলতা এইরকম একটি নারীচরিত্র।'

মূল বয়ানে পৌঁছানোর আগেই এভাবে অজস্র ভাষ্যের সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়ে যায়। যতো সাধারণ ভাবে পাঠক-প্রতিক্রিয়াবাদী দৃষ্টিকোন থেকে এ ধরনের বয়ানে লেখক-স্বরের আধিক্য যথেষ্ট আপত্তির কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকে। কিন্তু আশাপূর্ণার 'সুবর্ণলতা'য় ঔপন্যাসিকতার গ্রহনা আপন স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করে বিবরণ ও ভাষ্যের অন্যোন্যাশ্রয়িতায়। আশাপূর্ণার ঘোষিত পরাপাঠ বারবার নিজের প্রগাঢ় উপস্থিতিকে সঞ্চারিত করেছে। সুবর্ণলতার নারী-সত্তার অপূর্ণতা ও রিক্ততা সর্বগ্রাসী পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপের দ্বারা কীভাবে নির্ধারিত হয়েছে, ঔপন্যাসিক অজস্র অনুপুঙ্খের বিন্যাসে সেই কেন্দ্রীয় সত্যকে প্রকাশ করেছেন। স্বামী হয়ে পুত্র হয়ে প্রতিবেশী হয়ে ধর্মচেতনার স্বনিযুক্ত মুখপাত্র হয়ে নারীকে শাসন করে পিতৃতন্ত্র, কেড়ে নেয় তার আলো হাওয়া রোদ ঃ এই মর্মান্তিক বৃত্তান্তই তো সুবর্ণলতার। শুধু তা-ই নয়, ঔপন্যাসে বারবার আশাপূর্ণা দেখিয়েছেন, অজস্র প্রজন্ম ধরে পিতৃতন্ত্রের ছাঁচে-গড়া নারী কখনও শাশুড়ি হয়ে কখনও ননদ হয়ে, কখনও বা জা এমনকী কন্যা হয়েও সুবর্ণলতাদের আকাশ কেড়ে নেওয়ার বন্দোবস্ত করে। এদের মন পুরুষের, ভাষা পুরুষের, শ্বাসও পুরুষের যেহেতু এদের চেতনা নিশ্ছিদ্রভাবে ঔপনিবেশীকৃত। নিছক শারীরিক পরিচয়ে এরা নারী, অস্তিত্বগত নিরিখে নারী নয়। বরং নারীর শারীরিক ভিন্নতাকে এরা হীনতার জ্ঞান হিসেবে ধরে নেয় এবং শরীর দিয়েও পিতৃতন্ত্রের কাছে বলি-প্রদত্ত হওয়ার জন্যে

স্বেচ্ছায় তৈরি থাকে। শরীর সম্পর্কে এদের থাকে অদ্ভুত অশুচিতা-বোধ, যা নানা ধরনে উৎকট সংস্কারে ও আরোপিত বিধিনিষেধে ব্যক্ত হয়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র বয়ানে এই বিষয়ে আমরা বারবার লক্ষ করেছি; 'সুবর্ণলতা'য় এর পরিমাণ তুলনামূলকভাবে কম হলেও উপক্ষেণীয় নয়।

এমনকী নারীর রচিত বয়ানেও নারী-পরিসর স্পষ্ট হয় না সর্বদা, তা আমরা পাঠ-অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি। নারীর যথাপ্রাপ্ত লৈঙ্গিক অবস্থান আসলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নির্মিতি — এই অত্যন্ত জরুরি তথ্যও সমস্ত পাঠকৃতিতে প্রাপ্য গুরুত্ব পায় না। আশাপূর্ণা লিখেছেন সমস্ত আরোপিত ঝরোখা সরিয়ে দেওয়ার জন্যে। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে যদিওবা লেখক-অস্তিত্ব আখ্যান-প্রকল্প থেকে যত্ন-রচিত দূরত্ব বজায় রেখেছেন, 'সুবর্ণলতা'র বয়ানে আগাগোড়া অনুভব করি কথকস্বর — ভাষ্যকারের যুগলবন্দি উপস্থিতি। বস্তুত কিছু কিছু ক্ষেত্রে ভাষ্যকারের তীক্ষ্ণস্বর কথক-অস্তিত্বকেও আড়ালে সরিয়ে দিয়েছে। সুবর্ণলতার আপাত পরাজয়ের বেদনা মন্থন করে নারীর নিজস্ব জীবন-পাঠের নির্যাসকে সামূহিক বাচনে ঐতিহাসিকতায় উপস্থাপিত করেছেন আশাপূর্ণা।

দুই

প্রকৃতপক্ষে নিবিড়পাঠে এমন মনে হয় যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' নাতি-ধূসর অতীতের ও 'বকুল-কথা' ধূপছায়াময় বর্তমানের সাহিত্যিক নির্মিতি। কিন্তু 'সুবর্ণলতা' পড়তে পড়তে বারবার ঝাপসা হয়ে যায় এই সত্য যে এও আরেক সাহিত্যিক নির্মিতি। মনে হয় যেন বাঙালির পৌর সমাজের অন্তঃপুর আঁধার-ঘেরা অপর পরিসর হয়ে আমাদের হৃদয়েতে পথ কেটে চলেছে।

সুবর্ণলতার অশ্রুসজল আখ্যানে বারবার হারিয়ে যায় পাঠকের নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বের বোধ। এইজন্যে সুবর্ণলতার বেদনা-রক্তিম অশ্রুসজল উচ্চারণ অনুরণিত হতে থাকে পাঠকে মনে এবং একসময় সুবর্ণলতার উচ্চারণের সঙ্গে সংবেদনশীল পাঠকের কণ্ঠস্বরও মি যেতে থাকে। তাই ত্রয়ী উপন্যাসের সামগ্রিক পরিসরের মধ্যে 'সুবর্ণলতা' নিজস্ব পার্থক প্রতীতির অভিজ্ঞানে বিশিষ্ট। আশাপূর্ণার নারীপরিসর সন্ধান এবং নারীর নিজস্ব আখ্যান সম্পর্কিত তাত্ত্বিক প্রতিবেদন তৈরি করার জন্যে 'সুবর্ণলতা'র স্বতন্ত্র গুরুত্ব অবশ্য-স্বীকার্য। ভারতীয় পিতৃতন্ত্র কিংবা, বলা ভাল, ব্রাহ্মণ্য-তন্ত্র যুগযুগ ধরে নারীকে যেভাবে উনমানব বলে এবং পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী হিসেবে আপন সম্পত্তি বলে গণ্য করে নৃশংস অত্যাচার ও লাঞ্ছনা করেছে — তারই প্রতিনিধিত্বমূলক বয়ান দেখতে পাই 'সুবর্ণলতা'য়।

'স্তিমিত অন্তঃপুরের অন্তরালেও কি চলে না ভাঙাগড়ার কাজ?' — এই প্রশ্ন 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র পরাপাঠ হিসেবে ব্যক্ত হতে দেখেছি। যেন সেই জিজ্ঞাসার অধিকতর বেদনাময় বিস্তার উন্মোচিত হলো 'সুবর্ণলতা'য়। 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র বয়ান আপাত-সমাপ্তিতে পৌঁছে সত্যবতীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে তার আট বছরের মেয়ে সুবর্ণকে তারই অজ্ঞাতে গ্রামে বাড়িতে বিয়ে দেওয়ার বৃত্তান্তে। এই বৃত্তান্তের সূত্রে সুবর্ণলতা-কেন্দ্রিক পাঠকৃতিতে পৌঁছনো আগেই আমরা বুঝে নিই, প্রান্তিকায়িত নারীর উপস্থাপনা চিহ্নায়িত হয়ে গেছে। সত্যবতী জীবন-ব্যাপ্ত সংগ্রাম, প্রতিরোধ ও বিকল্প জীবনের সন্ধান পরবর্তী প্রজন্মে প্রসারিত হ

ারল না নিষ্ঠুর ও বিবেকশূন্য পিতৃতন্ত্রের প্রতিশোধ-স্পৃহায়। শাশুড়ি এলোকেশী ও স্বামী বকুমার পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনের প্রতিহাবী হয়ে সত্যবতীর দীর্ঘকালীন বিদ্রোহের জন্যে মাক্ষম প্রতিশোধ নিয়েছে। সুবর্ণলতাকে পিতৃতন্ত্রের যূপকাষ্ঠে বলি দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছে য মেয়ের ওপর মায়ের কোনও অধিকার নেই। ঔপন্যাসিক আশাপূর্ণাব দ্রষ্টাচক্ষুতে ধরা পড়েছে সুবর্ণলতার 'একজোড়া আহত পশুর চোখ'। অত্যন্ত মৌলিক জিজ্ঞাসার উপস্থাপনায় কাহিনি সংকেতগর্ভ হয়ে উঠেছে। নারীসত্তার চরম অবমাননার সঙ্গে আপস না-করে সত্যবতী মুহূর্তমধ্যে বিয়ের আসর ছেড়ে চিরকালের মতো পাড়ি দিয়েছে সম্ভাব্য বৃহত্তর জগতের সন্ধানে। বিয়ে মানে সত্যিই অনন্তকালের বন্ধন কী না, এই মীমাংসা করার জন্যে সে আসলে নিজের কালের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে উত্তীর্ণ হয়েছে সম্ভাব্য ভবিষ্যতে। তার উচ্চারণও হয়ে পড়েছে চিহ্নায়িত ঃ

'যা হয়ে গেছে তার চারা আছে কি না সেইটাই শুধু ভাবব বসে বসে বাকী জীবনটা ধরে... বাকী জীবনটুকু কী খুব বেশী হলো? অনেক গুলো জন্ম ধরে ভাবলেই কি সে ভাবনার শেষ হবে? উত্তর পাওয়া যাবে?... সব বিয়েতেই নারায়ণ এসে দাঁড়ায় কি না, সব গাঁটছড়াই জন্মজন্মান্তরের বাঁধন কি না, এই প্রশ্ন নিয়ে বাবার কাছে যাচ্ছি ...।'

স্বভাবত নবকুমারের মতো বৃত্তবন্দী স্থূলবুদ্ধি মানুষেরা এ ভাষার মানে বোঝেনি।

ভাঙা-গড়ার বহুস্বরিক ইতিবৃত্ত রচনা করতে গিয়ে আশাপূর্ণা আসলে নানা ধরনের নিরুচ্চার ও সোচ্চার জিজ্ঞাসার গ্রন্থনা তৈরি করেছেন। সারা জীবন ধরে অনেক প্রশ্ন জমিয়ে রেখেছিল সত্যবতী, কাশীতে বাবার কাছে সেসব কিছুর উত্তর সে পেয়েছিল কি না — আশাপূর্ণা জানাননি। হিস্টিরিয়া-গ্রস্ত মানুষের মতো নবকুমার স্বামিত্বের অহঙ্কারে অভিশাপ দেওয়ার কথা বলেছে যখন, অসামান্য জবাব দিয়েছে সত্যবতী ঃ 'তাই তো দিয়ে আসছো তোমরা আবহমান কাল থেকে। স্বামী হয়ে বাপ হয়ে ভাই হয়ে ছেলে হয়ে। ওটা নতুন নয়। অভিশাপেরই জীবন আমাদের।' এই 'তোমরা' ও 'আমাদের' সর্বনাম দুটি গভীর দ্যোতনাগর্ভ। বুঝে নিই, আশাপূর্ণার ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের পরাপাঠ কী! সত্যবতী ও সুবর্ণলতা কোনও একক বাচনের ধারক নয়, এরা আবহমান কাল ধরে লাঞ্ছিত, অপমানিত, সংযোগশূন্যতার অন্ধকারে প্রান্তিকায়িত নারী-পরিসরের বোবা যন্ত্রণার প্রতিনিধি। 'আগে এলে বিয়েয় বাধা দিত, তাই জানানো হয়নি' — নবকুমারের এই কথায় তো সত্যবতীর মতো মায়েদের সারাজীবনব্যাপী সাধনার পরিণাম সহ পিতৃতান্ত্রিক পিঞ্জরে তাদের প্রকৃত অবস্থানের সারমর্ম বিধৃত রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে সুবর্ণলতার ভবিষ্যৎও। শ্লেষগর্ভ বাচনে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সেই অমোঘ সমাপ্তিতে কথকস্বর বোরুদ্যমানা হতচকিত সুবর্ণের সঙ্গে সত্যবতীর চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটিয়ে দিয়েছিল এই বলে ঃ

'মার পিছুপিছু যাবে তার উপায় নেই, আঁচলের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা! অমোঘ অচ্ছেদ্য বন্ধন। অনন্তকালের ওপার পর্যন্ত নাকি যার ক্ষমতা ... ক্ষেত্র বিস্তৃত।'

এই ধর্মনৈতিক বিধানকে সত্যবতী প্রত্যাহ্বান জানাতে পেরেছিল সোচ্চারে। সুবর্ণলতা পারেনি যদিও নিরুচ্চার বয়ান সেও বহতা সময়ের কাছে পেশ করে গেছে। যেন তার নিরুপায় অবস্থার সাহিত্যিক ক্ষতিপূরণ করার জন্যে আশাপূর্ণা বয়ানে ভাষ্যকারের উপস্থিতিকে

প্রত্যক্ষগোচর করে তুলেছেন।

তিন

এই নিবন্ধের শুরুতে আশাপূর্ণার বক্তব্যে লক্ষ করেছি, 'একটি ভাবকে পরবর্তী কালে-ভাবধারার সঙ্গে যুক্ত করার প্রয়োজনে' ত্রয়ী কাহিনি গ্রন্থনার মধ্যে তিনি আন্তঃসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। সুবর্ণলতার বিয়ের নাটকীয় বৃত্তান্ত এইজন্যে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র সমাপ্তিতে দ্রুত গতি এনে দেয় নি শুধু, এর রৈখিকতাকেও হঠাৎ ভেঙে দিয়েছে। আমাদের উৎসুক করে তুলেছে সুবর্ণলতার জীবনকথা সম্পর্কে। 'সুবর্ণলতা'র বয়ানে সত্যবতী ধূসরায়িত স্মৃতিপট মাত্র ; শুধুমাত্র একবার মেয়ের কাছে লেখা চিঠির সূত্রে তার বিলম্বিত উপস্থিতি। তবু, অনুভবে টের পাই, সত্যবতীর অনুপস্থিতি তার মেয়ের বিড়ম্বিত জীবনে আগাগোড়া ছায়া ফেলে গেছে। আর, সুবর্ণের মেয়ে বকুল রয়েছে পাঠকৃতির শুরুতে এবং শেষে। হয়তো এই বকুল পরবর্তী 'বকুলকথা'য় অনেকখানি রূপান্তরিত, তবু তার উপস্থিতি প্রাগুক্ত ধারাবাহিকতা ও আন্তঃসম্পর্কের গ্রন্থনার প্রতি তর্জনি সংকেত করে। এই প্রেক্ষিতে 'সুবর্ণলতা' নামক পাঠকৃতির কেন্দ্রীয় অস্তিত্বকে মনে হয় দুটি মেরুর সংযোজক। কিন্তু শুধুমাত্র এই কী তার গৌরব? একান্ত নিজস্ব মহিমায় ম্লান ও বিষণ্ন গোধূলির সৌন্দর্যের মতো, সে কী স্মরণীয় নয়? প্রবহমান ধারা যখন নিস্তরঙ্গ, অস্তিত্ব যখন পরাজয়ের মর্মান্তিক বেদনায় বিধুর — তখনও তা চলমান ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বার্তা বয়ে আনে তিল-তিল করে অর্জিত হয় নারী-পরিসর। সল্‌তে পুড়ে যায় বলেই আলো জ্বলে পিদিমে।

সত্যবতী সমিধ সংগ্রহ করছিল। আলো হয়তো জ্বালতে পারেনি কিন্তু অন্ধকার তাকে গ্রাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তার মেয়ে সুবর্ণ জীবনের ভেতরে অন্য জীবনের অস্তিত্ব খুঁজতে-খুঁজতে অন্ধকার বলয়ে হারিয়ে গেল। তর বোধের কেন্দ্রে ছিল জঞ্জাল-পোড়ানো আগুন; কিন্তু পুঞ্জীভূত ছাইয়ের মধ্যে তার স্তিমিত অস্তিত্ব সুবর্ণকে দাহ দিয়েছে শুধু, দীপ্তি দেয়নি। আশাপূর্ণাকে এইসব লিপিবদ্ধ করে যেতে হয়েছে, কেননা আমাদের পৌরসমাজের প্রকৃত ইতিহাস রচিত হয়েছে সত্যবতী ও সুবর্ণদের নিরন্তর দ্বিরালাপে। এগিয়ে যাওয়া ও পিছিয়ে আসার সংঘর্ষে যে বিদ্যুৎ-দীপ্তি রচিত হচ্ছে অহরহ, তাতেই তো প্রমাণিত হচ্ছে বৃষ্টিগর্ভ মেঘের সঞ্চার। নইলে বকুল কী করে অনামিকা দেবীতে রূপান্তরিত হয়ে বিনির্মাণ করবে মা-ঠাকুমাদের জীবনমন্থনকথা, অতীতের বৃন্ত থেকে চয়ন করবে বর্তমানের কুসুম। সুবর্ণলতারা হয়তো মরুপথে হারিয়ে যায়, তবু তাদের বিস্মৃত হওয়া চলে না ; কেননা মোহনার সম্ভাবনা শুকনো খাতে, ক্ষীণ জলধারায়, ওরাই জাগিয়ে রাখে। তাই মূল বয়ানের প্রবেশকে আশাপূর্ণা জানান ঃ

'তবু এরা আসে।

হয়তো প্রকৃতির প্রয়োজনেই আসে।

তবে কোথা থেকে যে আসবে তার নিশ্চয়তা নেই। আসে রাজরক্তের নীল আভিজাত্য থেকে, আসে বিদ্যাবৈভবের প্রতিষ্ঠিত স্তর থেকে। আসে নামগোত্রহীন মূক মানবগোষ্ঠীর মধ্য থেকে, আসে আরো ঘন অন্ধকার থেকে।

তাদের অভ্যুদয় হয়তো বা রাজপথের বিস্তৃতিতে, হয়তো বা অন্তঃপুরের সঙ্কীর্ণতায়।

কিন্তু সবাই কি সফল হয়?

সবাইয়ের কি হাতিয়ার এক?

না।

প্রকৃতি কৃপণ, তাই কাউকে পাঠায় ধারালো তলওয়ার হাতে দিয়ে, কাউকে পাঠায় ভোঁতা বল্লম দিয়ে। তাই কেউ সফল সার্থক, কেউ অসফল ব্যর্থ। তবু প্রকৃতির রাজ্যে কোনো কিছুই হয়তো ব্যর্থ নয়। আপাত-ব্যর্থতার গ্লানি হয়তো পরবর্তী কালের জন্য সঞ্চিত করে রাখে শক্তি-সাহস।'

ধারালো তরোয়াল হাতে নিয়ে আসেনি সুবর্ণ, ভোঁতা বল্লম নিয়ে সে দুর্ভেদ্য অচলায়তনের একটি পাথরও খসাতে পারেনি। তার মা সত্যবতী ঘড়ির গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছিল তীব্র ঘৃণায়, বেদনায় ; কিন্তু সুবর্ণের জন্যে কূপই নেতিবাচক অর্থে হয়ে উঠল অকূল সমুদ্র। তবু তার 'আপাত-ব্যর্থতার গ্লানি'র মধ্যেই সঞ্চিত ছিল পরবর্তী কালে তার মেয়ে বকুলের অনামিকা দেবী হয়ে ওঠার ইতিহাস। এ কেবল রাতের সমস্ত তারার দিনের আলোর গভীরে থাকার কথা নয়, তার চেয়ে বেশি কিছু। এ হলো জীবনের, প্রগতির ধীরমন্থর দ্বিবাচনিকতা। পশ্চিম দিগন্তকে অন্ধকার করে যখন সূর্য অস্ত যায়, পূর্ব দিগন্তকে আলোয় ভরিয়ে দিয়ে সূর্য উদিত হয় তখন। উপন্যাসের প্রতিবেদন শুরু হয়েছে ছায়াছবির ফ্ল্যাশ ব্যাক-এর ভঙ্গিতে। সুবর্ণলতার মৃত্যুর তাৎপর্য দিয়ে। তার মা সত্যবতী তবু দাপটের সঙ্গে জীবনের একটা বড়ো অংশ কাটাতে পেরেছিল, যথাপ্রাপ্ত পিঞ্জরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে বিকল্প জীবনের সন্ধানে কলকাতায় পাড়ি দিয়েছিল। এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে চূড়ান্ত অবিশ্বাস্য সত্যের উদ্‌ভাসন ঘটেছিল তার ; নারী হিসেবে, জায়া ও জননী হিসেবে, আসলে কোথাও তার পরিসর নেই। স্বামী-পুত্র-কন্যাকে অন্ধকারের সংক্রমণ থেকে সে বাঁচাতে পারেনি, কেননা তার অবস্থান চোরাবালির উপরে; এতদিন শূন্যে সৌধ নির্মাণ করেছিল সে। অতএব নিজেকে চিরস্থায়ী বহিরাগত বলে বুঝতে পেরে আত্মমর্যাদা অটুট রাখার জন্যে সত্যবতী পা' বাড়িয়েছিল বাইরে। অন্দর ও বাহির একাকার হওয়ার সীমাহীন যন্ত্রণা ও গ্লানির সঙ্গে আপস করা সম্ভব হয়নি তার পক্ষে।

নরওয়েজীয় নাট্যকার ইবসেনের 'A Doll's House' (১৮৭৯) নাটকের নায়িকা নোরার পরিস্থিতি ছিল পুরোপুরি ভিন্ন ; কিন্তু দুই কালের দুই সমাজের দুই সংস্কৃতির দুই নারীর মধ্যে কোথাও যেন ঐক্যসূত্র রয়েছে। নোরার স্বামী হেলমের পিতৃতান্ত্রিক ঔদ্ধত্য নিয়ে একবাচনিক সম্পর্কের সূত্রধার হিসেবে এই তাৎপর্যপূর্ণ কথা বলেছিল, *'You just lean on me, I shall give you all the advice and guidance you need .... you are safe and sound under my wing ... I'll take all the decisions for you.'* এই অসহনীয় নিরেট ঔদ্ধত্যের জবাব দিয়েছে নোরা সমস্ত প্রান্তিকায়িত নারীর পক্ষ থেকে। গৃহত্যাগ করার আগে সে তার স্বামীকে এই কথাগুলি বলে গেছে ঃ

'... Never have we exchanged one serious word about serious things, ... I passed out of Daddy's hands into years. You arranged everything to your tastes and I acquired the same tastes ... I have

been your doll wife ... that's been our marriage, torvald '

নবকুমার আপাতদৃষ্টিতে সত্যবতীকে পুতুল ভাবতে পারেনি ; কিন্তু মোক্ষম মুহূর্তে সে হেলমেরের মতোই (যদিও পিতৃতন্ত্রের দ্বারা উপনিবেশীকৃত সংস্কারপিণ্ড এলোকেশীর প্রভাবে) সমস্ত সিদ্ধান্ত নিজেই নিয়েছে। যেন সুবর্ণ শুধু তারই মেয়ে, সত্যবতী শুধু জন্মদাত্রী। এক মুহূর্তে সত্যবতী, নোরার মতোই নিজের এত বছরের দাম্পত্যকে চিনে নিয়েছে। কিন্তু সুবর্ণের স্বামী প্রবোধ তো নবকুমারের চেয়েও অধম, কামসর্বস্ব এক পুরুষ। সুবর্ণকে সে আগাগোড়া প্রতারণা ও সন্দেহ করে গেছে। বাড়ি তৈরি থেকে সুবর্ণের কেঁদাকবড়ী যাওয়া বানচাল করার ঘটনা পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে, প্রবোধ নিজেকে রক্ষণশীল অচলায়তনের মনশূন্য প্রহরী এবং অন্ধকারের ভ্রূল ও উৎকট প্রতিনিধি বলে প্রমাণ করেছে। এই প্রেক্ষিতে সুবর্ণলতার ট্র্যাজিক বেদনা আরও দু'কূলপ্লাবী হয়ে ওঠে। সে ও নোরা ভিন্ন উৎস-জাত ও ভিন্ন সামাজিক ইতিহাসের বাসিন্দা ; তাই নোরার মতো সে স্পষ্ট ঘোষণা করতে পারত না যে স্বামী ও সন্তানদের প্রতি প্রশ্নহীন দায় পালনকে সে 'most sacred duty' মনে করে না। কিংবা পুরুষের চোখে ভালো স্ত্রী ও মা হয়ে ওঠার বদলে 'my duty to myself 'কে মনে করে নবার্জিত জীবনবোধের ভিত্তি। নোরার কাছে যখন তার স্বামী হেলমের আট বছরের দাম্পত্যের পরেও হঠাৎ অপরিচিত হয়ে যায়, তার তিন-সন্তানের জননী হয়েছে ভেবে নোরা নিজেকে টুকরো টুকরো করে ফেলতে চায়। অতএব স্ত্রী ও মা হয়ে ওঠাকে নারীর পবিত্র কর্তব্য বলে সে আর গণ্য করে না। বলে *'I believe that first and foremost I am an individual, just as much as you are — or at least I am going to try to be. I know most people agree with you, torvald, and that's also what it says in books. But I am not content any more with what most people say, or with what it says in books. I have to think things out for myself, and get things clear.'*

চার

স্পষ্টত এজাতীয় উচ্চারণে সুবর্ণলতা কখনও কাউকে বোঝাতে পারেনি যে সে নিতান্তই নিজের মতো করে সবকিছু ভেবে নিতে চাইছে। একজন ব্যক্তি হয়ে স্পষ্টতার দাবি সে করতে পারেনি কখনও। ১৮৭৯ সালে নোরা যে-কথা স্বচ্ছন্দে বলতে পেরেছে, বঙ্গীয় সমাজের গৃহবন্দিনী বধূ সে-কথা বিশ শতকের প্রথম দিকে, স্বদেশি আন্দোলনের মুক্তি-কামী সময়ের পরিধিতেও, কল্পনা করতে পারেনি। আট বছরের দাম্পত্য শেষে নোরা তবুও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছিল। কিন্তু সুবর্ণলতার বাস্তব বহুমাত্রিক ঔপনিবেশিকতায় ধ্বস্ত। তাই বাড়ি তৈরির সময়ে নিষ্ঠুর মিথ্যায় তাকে প্রতারিত করে গেছে তারই স্বামী প্রবোধ। আট বছর বয়সে বিয়ে হওয়ার পরে ছ'বছর সে কাটিয়েছে এজমালি শ্বশুর-বাড়িতে। নতুন বাড়িতে তার ইচ্ছেকে দাম দেওয়ার জন্যে কোথাও বারান্দা তৈরি হয়নি যেখানে সে ক্ষণিকের জন্যে মুক্তির স্বাদ পেতে পারত। আর, সেই বাড়িতেই তো ত্রিশটা বছর কাটিয়ে গেছে সুবর্ণলতা, সেখান থেকেই বর আষ্টেক আঁতুড়ে গেছে, কেঁদেছে, হেসেছে, খেটেছে, বিশ্রাম করেছে, সংসারলীলার

যাবতীয় লীলাতেই অংশগ্রহণ করেছে, তবু পিঞ্জরের যন্ত্রণাবোধে অহরহই ছটফট করেছে। মা সত্যবতী কিংবা ভিনদেশের পূর্বসূরি নোরার মতো সুবর্ণলতা পিতৃতান্ত্রিক অচলায়তনকে উপেক্ষা দিয়ে প্রত্যাঘাত করতে পারেনি। কিন্তু লেখিকা তাঁর উপন্যাসের শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে নিজের চূড়ান্ত রুদ্ধতার মধ্যেই সেও অন্তত প্রতীকীভাবে নির্মম নিষ্ঠুর সংসার থেকে নিজেকে শেষ পর্যন্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছিল ঃ *'দক্ষিণের এই চওড়া বারান্দাটায়, যেখানে শুয়ে থাকত সুবর্ণলতা সংসার থেকে চোখ ফিরিয়ে'*। কায়িক মৃত্যুর আগেই দৃষ্টিহীন চোখের অধিকারী-গণদের কাছে সুবর্ণ নিজের আত্মিক অবলুপ্তি যেন ঘোষণা করেছিল, চোখ ফিরিয়ে নেওয়া নিঃসন্দেহে চিহ্নায়িত।

কাহিনি গ্রন্থনায় যাঁর প্রশ্নাতীত নৈপুণ্য ত্রয়ী উপন্যাসে বারবার ব্যক্ত হয়েছে, সেই আশাপূর্ণা বিবরণের সঙ্গে কথকতার উদ্বৃত্ত সম্পর্কেও প্রখর ভাবে সচেতন ছিলেন। *'সুবর্ণলতা তার স্বামীত্যাগিনী মায়ের নিন্দনীয় ইতিহাসের সম্বল নিয়ে মাথা হেঁট করে শ্বশুর-ঘর করতে এসেছিল'*— এই তথ্য অজস্র না-বলা কথার বীজবাণীতে ঠাসা। পিতৃতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান এতই নিরেট অচলায়তন এবং এত নির্দয়ভাবে একপেশদর্শী যে কোনও নারীর বিদ্রোহকে মেনে নেওয়া তার পক্ষে পুরোপুরি অসম্ভব। প্রশ্নহীন আনুগত্য নিয়ে পুরুষসর্বস্ব সমাজের কাছে আত্ম-সমর্পণ না-করে সত্যবতী এর শাসন অস্বীকার করেছিল। তার মেয়ে সুবর্ণের ওপর যাতে পরোক্ষে মায়ের ছায়া না পড়ে, তা নিশ্চিত করার জন্য পিতৃতান্ত্রিক দুর্গের ত্রস্ত প্রহরীরা মাত্রাতিরিক্ত নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছে। তার শাশুড়ী মুক্তকেশী যে বাড়িতে কেউ বেড়াতে এলেই *'সুবর্ণলতাকে তার বিয়ের দরুন পাওয়া জরিতে জবড়জঙ্গ বেগুনী রঙা বেনারসী শাড়ী আর বড় বড় কলকাদার লাল মখমলের জ্যাকেট পরিয়ে সাজিয়ে ফেলত আর ....., সাতখানা করে নিন্দে করতো বৌয়ের আর বৌয়ের বাপের বাড়িরা'*—তাতে অবরোধবাসিনীর চূড়ান্ত গ্লানিকর পরাধীনতা স্পষ্ট। প্রজন্মের পরে প্রজন্ম ধরে এমন ব্যবহারই ধারাবাহিকভাবে পেয়ে এসেছে গৃহবন্দিনীরা। সত্যবতী স্পষ্ট বিদ্রোহ দিয়ে এবং সুবর্ণলতা তুষের আগুনে পুড়ে-পুড়ে কালো হয়েও নিজের স্বতঃস্ফূর্ত আভিজাত্যময় স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ওই ধারাবাহিকতায় ছেদ এনে দিয়েছে। নইলে প্রান্তিকায়িত নারী-পরিসরের যন্ত্রণা আখ্যানের আধেয় হতে পারত না। মৃত্যু তো জীবনের দ্বিবাচনিক দর্পণ ; এতে প্রতিফলিত হলো সুবর্ণলতার সমূহ পরাজয় থেকে উঠে-আসা নতুন আরম্ভের নির্যাস। তাই এই আখ্যানেই আশাপূর্ণাকে বকুল-কথার আসন্ন পাঠকৃতি সম্পর্কে ইশারা রেখে যেতে হল। আখ্যানের সূচনায় এবং সমাপ্তিতে। দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার অমোঘ উপস্থিতি এতে স্বীকৃত হল যেন।

এইজন্যে মোহনায় দাঁড়িয়ে উৎসের দিকে তাকানোর ভঙ্গিতে প্রতিবেদনের সূচনায় লিখেছেন আশাপূর্ণা ঃ

> *'তাই সে (সুবর্ণ) জেনেছিল সে কেবল তার অসার্থক জীবনের গ্লানির বোঝা নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিচ্ছে। জেনেছিল তার জন্য কারো কিছু এসে যাবে না। সুবর্ণলতার মৃত্যুতে যে সুবর্ণলতার সতেরো বছরের আইবুড়ো মেয়ে পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পায়নি, এ খবর জেনে যায়নি সুবর্ণলতা। জেনে যেতে পারেনি ওই মেয়েটার কাছে সুবর্ণলতার মৃত্যুদিনই জন্মদিন।'*

খুব তাৎপর্যপূর্ণ ও ইশারাময় এই উপস্থাপনা। বকুল তার মায়ের মৃত্যুর মোহনায় না-

দাঁড়ালে মায়ের সারাজীবনের উপাখ্যানকে নতুন চোখে দেখতে পারত না। বুঝতে শিখত না একক বাচনের মধ্যে সামূহিক বাচনের উদ্‌ভাসন এবং এক বঞ্চিত ও অবজ্ঞাত নারীর জীবনকথায় পরিসর-সন্ধানী নারীবিশ্বের উন্মোচন। যতক্ষণ দৈনন্দিন বাস্তবের সংলগ্নতায় অতি প্রকট ছিল সুবর্ণলতা, বকুল তার কাছে যেতে পারেনি। মৃত্যু যখন অমোঘ দূরত্ব রচনা করল, মায়ের জীবন থেকে নারীর নিজস্ব বার্তা পাঠ করার অবকাশ তৈরি হলো। প্রতিবেদনের শেষ প্রান্তে কথকস্বর মর্মরিত হয়ে উঠল এভাবে ঃ

'নিত্য সংঘর্ষের গ্লানিতে যে জীবনকে খণ্ড ছিন্ন অসমান বলে মনে হয়, দূর পরিপ্রেক্ষিতে সেই জীবনই একটি অখণ্ড সম্পূর্ণতা নিয়ে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে বিস্মৃতির মহিমায়, ব্যাপ্তির মহিমায়। নিতান্ত নিকট থেকে যে আগুন শুধু দাহ আর উত্তাপের অনুভূতি দেয়, দূরে গেলে সেই আগুনই আলো যোগায়।

দূরত্বই সম্ভ্রম, দূরত্বই প্রত্যয়।'

এই দূরত্বের বিপ্রতীপে রয়েছে যে অতি সান্নিধ্য, তার ভেতরকার ভয়াবহ ক্রূরতা ও শূন্যতার ছবি তো রচিত হয়েছে উপন্যাসের প্রতিবেদন জুড়ে। নিরেট নিশ্ছিদ্র প্রাচীর পেরিয়ে বাইরের জল-হাওয়া-রোদ এসে পৌঁছানোর কথা নয়। তবু অঘটন ঘটেছিল। সুবর্ণলতা ঘরের জানালা থেকে পাশের বাড়ির একটা ছোট ছেলের হাতে সুকৌশলে খাতার পয়সা এবং তার ঘুড়ি-লাট্টুর পয়সা চালান করে মাসে মাসে বাঁধানো রুল টানা খাতা আনাত। সেই খাতাগুলি দীর্ঘকালের সঙ্গী ছিল, তিলে তিলে ভরে উঠেছিল বহু সুখ-দুঃখের অনুভূতির সম্বলে। লোকচক্ষুর অন্তরালেই সম্পর্কিত ভাসুর জগন্নাথের ছাপাখানায় বইও ছাপিয়েছিল। কিন্তু নিজেরই সন্তান, স্বামী ও পরিবারের অন্য মহিলাদের চরম স্থূল ও সংবেদনাশূন্য প্রতিক্রিয়ায় সুবর্ণের তিল তিল করে গড়ে ওঠা স্বপ্ন মুহূর্তে ধ্বস্ত হয়ে গেল। নিজেদের বাড়ির ছাদে পাঁচশ বই এবং সেইসঙ্গে সমস্ত খাতা সে পুড়িয়ে ছাই করে দিল।

এই ঘটনা প্রকৃতপক্ষে বহুস্বরিক। কথকস্বর আপাত-নির্মোহ ও নিরাসক্ত বাচনে জানিয়েছে ঃ

'ধ্বংস হয়ে গেল আজীবনের সঞ্চয়। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল চিরকালের গোপন ভালবাসার ধনগুলি। সুবর্ণলতার আর কোনও খাতা রইল না।'

ঘাতক পিতৃতন্ত্র নারীসত্তার স্বাতন্ত্র্য প্রকাশের কোনও অভিজ্ঞানকে সহ্য করতে পারে না। এই অসহিষ্ণুতায় শুধুমাত্র সুবর্ণলতার লিখন-উদ্যম নয়, তার আত্ম-অভিজ্ঞান সন্ধানী সত্তাও পরাভূত ও নিশ্চিহ্নায়িত হয়ে গেছে। সুবর্ণ যখন নিজেই নিজের স্বপ্ন-সাধের চিতা জ্বালিয়েছে, আকস্মিকভাবে এই অভাবনীয় দৃশ্য বকুলের চোখে পড়ে গিয়েছিল। সেই মুহূর্তে এর তাৎপর্য বোঝা যায়নি। নিজের মায়ের মৃত্যুর দর্পনে যখন লাঞ্ছিত ও অপমানিত নারী-পরিসরের বার্তা খুঁজতে চেয়েছে বকুল, তখন এই আগুনে-সমর্পিত শব্দপুঞ্জের মর্মান্তিক হাহাকার সে উপলব্ধি করেছে। সুবর্ণের আরেক মেয়ে পারুলও কিন্তু কবিতা লিখতে পারেনি, তার স্বামী অমলবাবুর সন্দেহবাতিক তার স্রষ্টাসত্তাকে মুছে দিয়েছিল। এইজন্যে পূর্বসূরিদের যাবতীয় বেদনা ও পরাজয়ের প্রেক্ষিত থেকে সম্ভাবনার নির্যাস নিঙড়ে নিয়ে বকুলকে ত্রয়ী উপন্যাসের অন্তিম প্রতিবেদনে আমরা অনামিকা দেবী হয়ে উঠতে দেখলাম। আর, এও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় যে আশাপূর্ণা তাকে অবিবাহিতা হিসেবে উপস্থাপিত করলেন। বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠান নারী-সত্তার

পক্ষে কৃষ্ণবিবর, ইশারায় একথা যেন জানানো হলো। বই ও খাতা যখন আগুনে পোড়াচ্ছে সুবর্ণ, বকুলের চোখে পড়েছিল ঃ

'প্রচণ্ড রোদের মাঝখানেও সুবর্ণর মুখে আগুনের আভার ঝলক। ... সেই আভায় চিরপরিচিত মুখটা যেন অদ্ভুত এক অপরিচয়ের প্রাচীর নিয়ে স্থির হয়েছিল।'

আগেই লিখেছি, কথক-ভাষ্যকারের যুগলবন্দি উপস্থিতি এই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনের গোত্রলক্ষণ। অতএব ঠিক তার পরের তিনটি বাক্যে প্রশ্নছলে মীমাংসা প্রস্তাবিত হয়েছে ঃ

"কিন্তু ওই অপরিচিত মুখটার প্রত্যেকটি রেখায় রেখায় ও কিসের ইতিহাস আঁকা? জীবনব্যাপী দুঃসহ সংগ্রামের? না পরাজিত সৈনিকের হতাশার, ব্যর্থতার, আত্মধিক্কারের?"

বকুল কীভাবে এর উত্তর খুঁজেছে মায়ের সম্ভাব্য অথচ আকর্ষিত জীববিশ্বে এবং পরে তা প্রসারিত হয়েছে বিবর্তনশীল সাধারণ নারীপরিসরে — এখানে সেই-তথ্য প্রাসঙ্গিক নয়। তবু এই সূত্রে একথা উল্লেখ্য যে আশাপূর্ণা গভীর সংকেতগূঢ় বিষণ্ন বাচনে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতে পৌছানোর পথ ও পাথেয় নির্দেশ করে গেছেন। সুবর্ণের আত্ম-নিরাকরণ যেন বা দধীচির অস্থি, যা দিয়ে পরবর্তী প্রজন্মে নির্মিত হলো বজ্র। পারাপারহীন অভিমানে-বেদনায়-গ্লানিতে নিজের জীবনের প্রকাশ-সূচক যাবতীয় চিহ্নায়ক সুবর্ণ মুছে ফেলেছিল বলেই তো বকুল, কিংবা বকুলেরা, প্রবল দীপ্তি নিয়ে জেগে উঠেছে।' একের দহনে অন্যের আলো ঃ এই বার্তায় কূটাভাস আছে, আছে নিষ্ঠুরতাও। তবু এটাই নারীসত্তা নির্মাণের ধারাবাহিক প্রকল্প। তাই 'সুবর্ণলতা'র অন্তিম পরিচ্ছেদে 'বকুল' হাতে তুলে নিয়েছে পতাকা, বিনির্মিত জীবন থেকে নতুন বয়ান রচনার অঙ্গীকার ঃ

'এই ছাতেরই ওই কোটায় আর এক চিতা জ্বলতে দেখেছিল সে। কোনদিন জানলো না কী ভস্মীভূত হয়েছিল সেদিন।

আজ ঘুমের আগে মা'র ফেলে যাওয়া সমস্ত কিছু তন্নতন্ন করে দেখছিল সে, কোথাও পায়নি একটি লাইন ও হস্তাক্ষর। সুবর্ণলতা যে নিরক্ষর ছিল না, সে পরিচয়টা যেন একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে গেছে সুবর্ণলতা।

বকুল ছাতের সেই চিতার কোণটায় বসে রইল অন্ধকারে।'

পাঁচ

বলা যায় এই অন্ধকার আলোর অধিক কেননা সেখানে বকুলের দ্রষ্টাচক্ষু জেগে উঠেছে। নিশ্চিতভাবে এই প্রথম তার মা সুবর্ণলতার সম্পূর্ণ জীবনের অন্তঃসার অথবা অন্তঃসারশূন্যতা তার কাছে ধরা পড়েছে। অন্তত বকুল তো সুবর্ণলতার প্রথম সন্তান চাঁপার মতো নয় যে তার মাকে 'বৌ' হয়ে থাকতে দেখেছে, অথচ দেখেছে তার অনমনীয়তা আর দেখেছে বাড়িসুদ্ধ সকলের বিরূপ মনোভঙ্গি। এবং পিতৃতন্ত্রের ছায়ায় লালিত হয়ে পূর্বজাদের যান্ত্রিক অনুকৃতি হিসেবে চাঁপার মতো চূড়ান্ত অগভীরতার পরিচয় দেয়নি বকুল। মুক্তকেশীদের বহতা ধারার প্রতিনিধি হিসেবে চাঁপা ব্যস্ত থেকেছে 'শাশুড়ীর চোখে ছানি, পিসিশাশুড়ীর বাত, খুড়শ্বশুরের উদরী ; দ্যাওরপোদের হাম-পানবসন্ত, নিজের ছেলেদের রক্ত-আমাশা, হুপিং কাসি' নিয়ে।

'তাছাড়া চাঁপার ভাসুরঝির বিয়ে, ভাসুরপোর পৈতে, ভাগ্নীর সাধ, মামাশ্বশুরের শ্রাদ্ধ, আর সর্বোপরি চাঁপার বরের মেজাজ' তো আছেই। এতসব সামলে মায়ের মৃত্যুশয্যায় চাঁপার আসার ফুরসৎ হয়নি। বর্ণনার এই নাতিপ্রচ্ছন্ন শ্লেষ কার্নিভালের ছোঁয়ায় শাণিততর হয়ে ওঠে যখন লেখিকা জানান ঃ

'মায়ের নবাবী, মায়ের বিবিয়ানা, মায়ের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তিহীনতা, মায়ের ছেলেদের-বৌদের আদিখ্যেতা দেওয়া, আর কোলের মেয়েকে আস্কারা দেওয়ার বহর— এই সবই হলো চাঁপার গল্প করবার বিষয়বস্তু।'

শুধু কী শ্লেষ! সীমাহীন বেদনাও জেগে ওঠে কোথাও ; কেননা, বুঝতে পারি, সুবর্ণলতার সন্তান হয়েও চাঁপা আসলে তার মায়ের সেই পর যাতে আলো পড়ে না। বকুল-পারুল ছাড়া অন্য সবাই মূলত প্রবোধের সন্তান, পিতৃতন্ত্রের কৃষ্ণ মহাদেশে তাদের জন্ম ও বৃদ্ধি ঘটেছে। এই প্রেক্ষিতে সুবর্ণের জীবন-ব্যাপ্ত বেদনাসিন্ধুতে উত্তাল হয়ে ওঠে না-ঝরা চোখের জলের জোয়ার।

অতএব অক্ষরের চিতা জ্বলে উঠেছিল যেখানে, সেখানকার নিস্তব্ধ অন্ধকারে বাঙ্ময় হয়ে উঠল অক্ষর-স্থাপত্যে পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা। বকুলের চেষ্টায় সুবর্ণলতার পারাপারহীন হাহাকারের গ্রন্থনা থেকে পুনর্জীবিত হবে তার জীবনের পাঠকৃতি, সৃজনশীল কল্পনা তাতে বাস্তবকে অনুসরণ করার সংলগ্ন ছায়ার মতো। কিন্তু সুবর্ণলতা-কেন্দ্রিক ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে সেইসব ইশারা মাত্র। বকুল তার মায়ের পাণ্ডুলিপির খোঁজে জগন্নাথের কাছে গিয়ে জানতে পারে প্রেসের কর্মচারী প্রেসের যাবতীয় জিনিসপত্র শিশি-বোতল-ওয়ালাকে বেচে দিয়েছে। এভাবে সুবর্ণের অক্ষর-বিশ্ব নিঃশেষে মুছে গিয়েছে। এই বর্ণহীন আকারহীন শূন্যতা থেকেই শুরু হয় বকুলের অভিযাত্রা এবং সুবর্ণলতার জীবন-কথার পুনর্নির্মাণও। উপন্যাসের সমাপ্তিতে বকুল মনে-মনে বলে ঃ

'মা, মাগো! তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করব। সব কথা আমি নতুন করে লিখব। দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণার ইতিহাস। যদি সে পৃথিবী সেই ইতিহাস শুনতে না-চায়, যদি অবজ্ঞার চোখে তাকায়, বুঝব আলোটা তার আলো নয়, মিথ্যা জৌলুসের ছলনা। ঋণ শোধের শিক্ষা হয়নি তার এখনও।'

এই প্রগাঢ় উচ্চারণের আন্তরিকতা কার্যত কল্পনা-নির্মিতির সঙ্গে পাঠকের চিরাচরিত বাস্তব জগতের ব্যবধান মুছে দিয়েছে। জীববিশ্বের এই কথকতা শিল্প ও জীবনের মান্য ব্যবধানকে অবান্তর করে দিয়েছে যেন। তাই প্রতিবেদনের এমন মোহনায় পৌঁছে সুবর্ণলতার জীবন-বৃত্তান্তের তাৎপর্য আমাদের কাছে আমূল পাল্টে যায়। নারী-পরিসরের সন্ধান-বিষয়ক প্রকল্পটির নিবিড়তর পুনঃপাঠের সূচনা হয় তখন। সত্যবতী ও বকুলের সংযোজক অস্তিত্ব হিসেবে নয় শুধু, অন্ধকারের বোবা যন্ত্রণায় জ্বলে-পুড়ে খাক হয়ে গিয়েও সুবর্ণলতা তীব্র বেদনার কালকূট আপন অস্তিত্বে শুষে নিতে নিতে নিজস্ব মহিমায় আত্মদীপ হয়ে ওঠে।

যেহেতু এই উপন্যাসে লেখিকা নিজেই নিয়েছেন ভাষ্যকারের ভূমিকা, সত্যবতীর তুলনায় সুবর্ণলতার আপাত-দৃষ্টিতে পিছিয়ে যাওয়ার কারণও বয়ানের মধ্যে চমৎকার ভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। বারবার শাশুড়ি ও অন্যান্যদের কাছে গঞ্জনা পেয়েও বিশেষভাবে প্রবোধের

মতো কামুক ইতর সন্দেহ-প্রবণ স্বামীর দ্বারা অপমানিত হয়েও কেন সুবর্ণ বিদ্রোহ করতে পারেনি ঃ এর কারণ জানাতে গিয়ে লেখিকা বাস্তব পরিস্থিতির বাস্তব বিশ্লেষণ করেছেন। নারীর পরিসর সন্ধান তো একরৈখিক হতে পারে না কখনও। এইজন্যে আশাপূর্ণা এভাবে তাঁর বয়ান উপস্থাপিত করেন যে সত্যবতীর মেয়ে হয়েও সুবর্ণলতা মায়েব অনুকরণ করতে পারে না। তার মা স্বামীর বিশ্বাসঘাতকতা সইতে না পেরে এককথায় স্বামী সংসার ত্যাগ করে গিয়েছিল, আর ফেরেনি। সে ব্যক্তি হয়ে উঠতে পেরেছিল কী না তার সংকেত নিহিত রয়েছে সুবর্ণের কাছে লেখা দীর্ঘ চিঠিতে। আসলে যে-কথাগুলি আখ্যানের নিজস্ব ব্যাকরণ অনুযায়ী আশাপূর্ণা প্রকাশ করতে পারেননি, তা দীর্ঘ চিঠির সূত্রে ব্যক্ত করেছেন।

বেশ কিছু মৌলিক প্রশ্ন, উপন্যাসের গন্ডির মধ্যে মীমাংসা না-হওয়ায় সম্ভাবনা সত্ত্বেও তীক্ষ্নভাবে উত্থাপিত হয়েছে। সত্যবতী এই আশা প্রকাশ করেছিল যে সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে সুবর্ণ এগিয়ে যেতে পারবে। সংসার থেকে দূরে সরে গিয়ে যাদের বুদ্ধিহীন বলে ভেবেছে সত্যবতী, ভেবেছে যে তারা বড়জোর বিরক্তি ও করুণার পাত্র, ক্রোধের যোগ্য নয় — গৃহবন্দিনী সুবর্ণ সম্ভবত নিজের অভিজ্ঞতা দিয়ে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারত না। সত্যবতী নানা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে হিন্দু বিবাহেব মূল তাৎপর্য ও লক্ষ্য সন্ধান করেছে ; কিন্তু তথাকথিত জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন পুরুষ ও নারীর পক্ষে সমান নয় কেন — এর কোনও সদুত্তর পায়নি। তবে এই চিঠিতে যেসব জিজ্ঞাসা তীক্ষ্ণ শলাকার মতো উঠে এসেছে, মূল আখ্যানের অন্তর্গত না-হয়েও প্রতিবেদনের পরাপাঠ প্রতিষ্ঠার পক্ষে তা আবশ্যিক। যেমন ঃ

> *'ক্রমশ বুঝিয়াছি এর উত্তর পুরুষ দিতে পারিবে না, ভবিষ্যৎ কালই দিবে। কারণ কোনো একটি সম্পত্তিতে ভোগ দখলকারী ব্যক্তি স্বেচ্ছায় সহজে দানপত্র লেখিয়া দেয় না। স্ত্রীলোকের যাহা কিছুতে অনধিকার, তাহার অধিকার অর্জন করিতে হইবে স্ত্রী-জাতিকেই।'*

ওই চিঠিতে সত্যবতী আক্ষেপ করেছিল যে মেয়ে-মানুষের কর্মজীবন নেই যেখানে পুরুষের মতো তারও জীবনের সার্থকতা-অসার্থকতা নির্ণীত হতে পারে। নিঃসন্দেহে এই বক্তব্য পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীদের পক্ষে চিন্তারও অগোচর। সত্যবতী কাশীতে মেয়েদের স্কুল করতে পেরেছিল। নারী-সত্তার সামাজিকীকরণ যে তার মুক্তির প্রধান সোপান, এই ইঙ্গিত রইল এখানে। অভিজ্ঞতার পাঠ থেকেই সত্যবতী এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল ঃ

> *'আশা হয় এইভাবেই কালের চেহারার পরিবর্তন হইবে। মানুষের বুদ্ধি বা শুভবুদ্ধি সহজে যাহা করিয়া তুলিতে সক্ষম না হয়, প্রয়োজন আর ঘটনাপ্রবাহই তাহাকে সম্ভব করিয়া তোলে। কেবলমাত্র পুঁথিপত্রে বা কাব্যে গানে নহে, ভবিষ্যতে জগতের সর্বক্ষেত্রেই পুরুষ মানুষকে একথা স্বীকার করিতেই হইবে মেয়ে-মানুষও মানুষ। বিধাতা তাহাদেরও সেই মানুষের অধিকার ও কর্মদক্ষতা দিয়াই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন। এক পক্ষের সুবিধা সম্পাদনের জন্যেই তাহাদের সৃষ্টি নয়।'*

নিঃসন্দেহে সত্যবতী কালান্তরের পথিক, নিজের সময় থেকে অনেক বেশি এগিয়েছিল বলেই দেশের পরাধীনতা ও স্ত্রীজাতির পরাধীনতা দূর করার কথা সে একই নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছে। শুধু নিজের মেয়ের জন্যে নয়, দেশের সহস্র সহস্র সুবর্ণলতার জন্যে কেঁদেছে

সত্যবতী। ন'বছর বয়সে সুবর্ণের বিদ্যাশিক্ষার ইতি হয়েছিল বলে মায়ের মনে দ্বিধা ছিল, হয়তো এতদিন পরে তার কথা মেয়ে বুঝবে না। আসলে সুবর্ণের মা নিজেকে জানিয়ে গেছে, সুবর্ণকে জেনে যায়নি। সুবর্ণ কিন্তু 'স্তব্ধ, মৃত্যুর মত স্তব্ধ' হয়ে গিয়েছিল, *'ধৈর্যের, সহ্যের, ত্যাগের এবং ক্ষমার তপস্যা'* সে কম করেনি। আর, অভিজ্ঞতা তাকেও এই পাঠ দিয়েছে যে মায়ের পরিস্থিতির সঙ্গে তার পরিস্থিতির আকাশ-পাতাল তফাৎ।

ছয়

অতএব মা যা করতে পেরেছিল, সুবর্ণ তা করতে পারেনি। মায়ের তেজের কণিকামাত্র পায়নি সে, তাও ঠিক সিদ্ধান্ত নয়। কারণ, 'সুবর্ণর মা'র জীবনের পৃষ্ঠপিটে ছিল এক অত্যুজ্জ্বল সূর্যজ্যোতি, সত্যবতীর বাবা সত্যবতীর জীবনের ধ্রুবতারা, সত্যবতীর জীবনের বনেদ, সত্যবতীর মেরুদণ্ডের শক্তি।

সুবর্ণর পৃষ্ঠপিটে শুধু এক টুকরো বিবর্ণ ধূসরতা। সুবর্ণর কাছে বাবার স্মৃতি — বাবা প্রতারণা করে তার বিয়ে ঘটিয়ে জীবনটাকে ধ্বংস করে দিয়ে নির্লিপ্ত হয়ে বসে আছে।

'সুবর্ণর বাবা সুবর্ণর ভাগ্যের শনি।

আর স্বামীভাগ্য?

সেও কি কম তফাত?

সত্যবতীর স্বামী অসার অপদার্থ ছিল কিন্তু অসভ্য অশ্লীল ছিল না। সত্যবতীর স্বামী অযোগ্য হতে পারে, তবে সে অত্যাচারী নয়। কিন্তু সুবর্ণলতার ভাগ্যে তো মাত্র ওই দ্বিতীয় বিশেষণগুলোই। আজীবন সুবর্ণকে একটা অসভ্য, অশ্লীল আর অত্যাচারীর ঘর করতে হচ্ছে।

ত্যাগ করে চলে যাবে কখন?

সোজা হয়ে দাঁড়াতে শেখবার আগেই তো ঘাড়ে পিঠে পাহাড়ের বোঝা উঠছে ক্রমে।'

সত্যবতীর ছিল হাল্কা ছোট্ট সংসার ; কিন্তু সুবর্ণলতা একান্নবর্তী পরিবারের অন্ধকূপে বন্দিনী। তার ওপর কামুক প্রবোধের জান্তব চাহিদা মেটাতে গিয়ে তাকে বারবার আঁতুড়ঘরে যেতে হয়েছে। তাই তো সুবর্ণ মনে-মনে মাকে বলেছে ঃ

'তোমার মেয়ে মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো তেজটা ফলাবে তবে কোন্ পতাকাতলে দাঁড়িয়ে? ... সকলের জীবন সমান নয়, সবাইকে একই মাপকাঠিতে মেপে বিচার করা যায় না। যাকে বিচার করতে বসবে, আগে তার পরিবেশের দিকে তাকিও।'

বস্তুত এই বোধ দ্বিবাচনিক জীবন-সত্যের প্রধান প্রাক-শর্ত। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদন জুড়ে এই বিরুদ্ধ পবিবেশের অমানবিক হিংস্রতার ছবি অজস্র অনুপুঙ্খে ব্যক্ত হতে দেখেছি। সুবর্ণ এমন এক রক্ষণশীল পরিবারের পঙ্ককুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, যাদের কাছে বহতা সময়ের কোনও বার্তা পৌছায় না, বাইরের জগতের রূপান্তর কোনও তাৎপর্য নিয়ে আসে না। কিন্তু সুবর্ণ রাজনৈতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি কামনার উত্তাপ অনুভব করে, কবিতার সূক্ষ্ম আবেদন তার মনে শিহরণ জাগায়। সবচেয়ে বড়ো কথা, মানবিক সম্পর্কের নিজস্ব মহিমার তাৎপর্যও সে অনুভব করে। কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সন্দেহ-প্রবণ সংকীর্ণ-চিত্ত স্বামী প্রবোধ সমস্ত আলো শুষে নেয়। এই পরিবেশের রূঢ় বাস্তবের কথাই মনে মনে ভেবেছে সুবর্ণ। বারবার

নিষ্ঠুর আঘাতের মধ্যে তাকে আবিষ্কার করতে হয়েছে; তার শ্বশুরবাড়িও যেন *'সাদামাটার একটা প্রতীক, না আছে শ্রী না আছে ছাঁদ।'* একে একে সে জেনেছে স্ত্রীর মতামতের কোনও দাম নেই কেননা স্ত্রীর মত নিয়ে কাজ করলে লোকে বলবে স্ত্রৈণ! প্রতিবেদনের শুরুতে আশাপূর্ণা দেখিয়েছেন অজস্র অপমান সইতে সইতে ও বিবাহিত জীবনের প্রথম পর্যায়ে *'নিজের ক্ষমতার উপর অনেকখানি আস্থা আর আশা ছিল সুবর্ণলতার'*। কীভাবে সব কিছু ঝরে গেল তার, নিজের একান্ত গ্লানিময় পরাধীন অবস্থানের প্রতীতি শুষে নিল তার জীবন-বাসনা ঃ তারই রক্তিম বিবরণ ছড়িয়ে আছে উপন্যাসের পাতায়-পাতায়। আর, ঠিক এখানেই 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'র তুলনায় 'সুবর্ণলতা'র পরিবেশের মৌলিক ভিন্নতা স্পষ্ট।

সত্যবতীর পিঠে তার শাশুড়ি এলোকেশী কিল বসিয়ে দিয়েছিল বলে সদ্য শ্বশুরঘর করতে আসা সত্যবতী বলে উঠেছিল, 'তুমি আমায় মারলে যে!' সামাজিক বিধি অনুযায়ী শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলা নিষেধ, তবু সে ন্যায্য প্রতিবাদ জানানোর জন্যে নিয়ম ভাঙতে দ্বিধা করেনি। তখন তার মুখে ছিল 'আগুনের আভা'। পাঠকের মনে পড়ে, সুবর্ণলতার মুখমণ্ডলেও ওই আগুনের আভা ফুটে উঠেছিল অন্য-এক পরিস্থিতিতে। বউ তিত করতে চ্যালাকাঠ পিঠে ভাঙবে, এই শাসানিতে ভয় পায়নি সত্যবতী ; প্রত্যাহ্বান জানিয়েছে, *'মারো না দেখি, তোমার কত চ্যালাকাঠ আছে'*। সুবর্ণলতা অবশ্য শাশুড়ির সঙ্গে কথা বলতে পারত ; কিন্তু তাতে পরিস্থিতি খুব একটা ইতর-বিশেষ হয়নি। সব বিষয়ে তার প্রবল ইচ্ছা পিতৃতন্ত্রের নিশ্ছিদ্র দুর্গে প্রতিহত হতে-হতে অবশ্যাম্ভাবী ভাবে হারিয়ে গেছে নৈঃশব্দ্যের সংযোগশূন্য অন্ধকারে। যুক্তির ভাষা মুক্তকেশীদের বোধগম্য হয়নি কখনও। নতুন বাড়ি তৈরির সময় সুবর্ণের কোনও কথা গ্রাহ্য হয়নি ; আক্ষরিক ও রূপক— কোনও অর্থেই বারান্দা ছিল না তাতে। বর্হিজগতের সঙ্গে নারীর সংযোগের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনাকে অঙ্কুরে বিনষ্ট করে পিতৃতন্ত্র। তাই চব্বিশ বছর বয়সেই প্রবোধ ইতরতায় ও চিত্ত-মালিন্যে দেহে-মনে জরাগ্রস্ত বৃদ্ধের সঙ্গে পাল্লা দেয়। সন্দেহ-প্রবণ মনে কুটিল কথা ও কদর্য ভাবনার যত প্রমাণ সে ভবিষ্যতে দিয়েছে, তার সূত্রপাত হয়েছিল সুবর্ণকে বাড়ি-তৈরি না দেখানো এবং বারান্দার ব্যবস্থা না করার মধ্য দিয়ে। চৌদ্দ বছর বয়সেই সুবর্ণ পরিচিত হয়েছে জলজ্যান্ত মিথ্যে ধাপ্পার সঙ্গে ; বুঝেছে, স্বামী প্রবোধ শুধু নিরবচ্ছিন্নভাবে তার বাড়ন্ত শরীরকে ভোগ করতে চায়। সুবর্ণের মন নিয়ে প্রবোধের কোনও মাথাব্যথা নেই। এইজন্যে একের পরে এক সন্তানের জন্ম দিয়ে সুবর্ণ শুধু তার নিঃসঙ্গতাবোধই প্রসারিত করেছে। তাকে এই অলঙ্ঘ্য বিধি জেনে নিতে হয়েছে যে, *'বেটাছেলের আবার কিছুতে দোষ আছে নাকি? মেয়েমানুষকেই সব কিছু মেনে-শুনে চলতে হয়।'* মেয়েমানুষের কোনও আকাঙ্ক্ষা থাকার কথা নয় ; তার মুখে কখনও উচ্চারিত হতে পারবে না, 'আমার চাই'। যদি কেউ এই স্পর্ধা দেখায়,'সীমাহীন নিষ্ঠুরতা দিয়ে তাকে শাসন করে পিতৃতন্ত্র। যতদিন বালিকা ছিল সুবর্ণ, তার মায়ের গৃহত্যাগের জন্যে মরমে মরে থাকত। তার মা যে মেয়েমানুষ হওয়ার বদলে ব্যক্তি-মানুষ হতে চেয়েছে এবং পাওয়াকে মহিমান্বিত করেছে, এই সত্যের উদ্ভাসন হয়েছে অনেক পরে।

কথকস্বর জানিয়েছে ঃ

'তা অনেক দিন পর্যন্ত অপরাধিনী-অপরাধিনী হয়েই ছিল সুবর্ণ। তারপর দেখল এরা শক্তের ভক্ত, নরমের যম। যত নীচু হও ততই মাথায় চড়ে এরা; অতএব শক্ত হতে

শিখল।'

অবশ্য শক্ত শুধু ভেতরে-ভেতরে, উপন্যাসের বয়ানে তেমন স্পষ্ট বহিঃপ্রকাশ দেখিনি, যেমনটি দেখেছি সত্যবতীর ক্ষেত্রে। আবার ফিরে আসে অমোঘ পরিবেশের প্রসঙ্গ। আর, কে না জানে, দ্বিবাচনিকতার প্রাথমিক সূত্র অনুযায়ী, প্রতিটি প্রসঙ্গ চায় যথার্থ প্রেক্ষিতের সমর্থন। সত্যবতী তবু বাবার কাছে যেতে পেরেছিল মাঝে-মাঝে, অন্তত মনে ছিল বাবার উজ্জ্বল উপস্থিতি। কিন্তু সুবর্ণের তো বাবার কাছে যাওয়ার উপায় ছিল না। অতএব নির্গমশূন্য চক্রব্যূহে বন্দিনী হয়েই সে মনের গভীরে লালন করেছে অনন্বয়ের নিজস্ব প্রতিরক্ষা কৌশল। যারা শৌখিন নয়, সভ্য নয়, রুচি-পছন্দের মানে বোঝে না, উদার আবহাওয়ার স্বাদ জানে না, বই পড়তে শেখেনি — তাদের বাধ্যতামূলক গ্লানিকর সাহচর্যের মধ্যে থেকে সুবর্ণ 'জীবনসৌন্দর্যের মাপকাঠি' খুঁজেছে ঃ এটাই তার প্রতিবাদ। প্রথম অবস্থায় ভেবেছে ঃ *'এই জীবনের মধ্যেই মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে সুবর্ণকে'* কিন্তু পারেনি। ঔপন্যাসিকের বয়ন-কৌশলে বাচনে আমরা পেয়েছি বহুস্বরিক উদ্বৃত্তের ইশারা ঃ

> *'... সুবর্ণ এ-দরজা ও-দরজা পার হয়ে একই ঘরে বারবার আসে বিমূঢ়ের মত, বুঝতে পারে না কোন্ দরজাটি দিয়ে বেরোতে পারলে সেই গোপন রহস্যে ভরা পরম ঐশ্বর্যলোকের দরজাটি দেখতে পাবে। ঘুরেফিরে তো শুধু দেয়াল। রিক্ত শূন্য খাঁ খাঁ করা সাদা দেয়াল।'*

যেন উপন্যাসের নিজস্ব ভাষায় আশাপূর্ণা মাত্র দুটি বাক্যে সুবর্ণলতার জীবনবৃত্তান্তের সারমর্ম তুলে ধরেছেন ; প্রকৃতই এরপর আখ্যান যত ডালপালা ছড়িয়েছে, দেখতে পেয়েছি প্রবঞ্চিতা ও অপমানিতা সুবর্ণের জীবনে শুধু ঘুরেফিরে সাদা দেয়াল যা রিক্ত যা শূন্য যা গ্রীষ্মের দুপুরে মরুভূমির মতো খাঁখাঁ করে। তাতে কখনও কোনও ছবির আদল তৈরি হয় না। মিথ্যাবাদী, বিবেকশূন্য, লজ্জাহীন প্রবোধ বরং ঠকানোর কথায় চোটপাট করে আরও। *'বেটাছেলে পুরুষ-বাচ্চা ভেড়ুয়ার মতন পরিবারের কথায় ওঠবোস'* করবে না, কিন্তু সেই রাতেই স্ত্রী-শরীর থেকে প্রাপ্য সুখ লুণ্ঠন করবে ঠিকই। সুবর্ণ যাবে রান্নাঘরে এবং 'অপরিসীম একটা ধিক্কারে দীর্ণ-বিদীর্ণ' হবে। অল্প বয়সে যদি কোনও প্রতিজ্ঞা করেও, পরবর্তী পর্যায়ে তার সন্তানেরা পিতৃতন্ত্রের পতাকাই বহন করবে, মায়ের অভিমানের কোনও খবর এরা রাখবে না।

'সুবর্ণলতা'-কেন্দ্রিক এই ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনেও আশাপূর্ণা নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্প উপস্থাপিত করেছেন ; তবে তা রয়েছে 'প্রথম প্রতিশ্রুতি'তে ব্যক্ত প্রকল্পের বিপ্রতীপে। সত্যবতীর ক্ষেত্রে বড়ো হয়ে উঠেছে নারী কী হতে পারে; আর সুবর্ণের উপস্থাপনায় প্রাধান্য পেয়েছে, নারী কী হতে পারে না। 'কেন' নিরুচ্চার যদিও, অব্যক্ত নয়। এই দুটি প্রতিবেদন না-হলে দ্বিবাচনিকতার প্রক্রিয়া ও প্রকরণ সম্পূর্ণ হতে পারে না, এই হলো আশাপূর্ণার প্রত্যয়। যান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত বিবাহের মধ্য দিয়ে নারীপুরুষের জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধন কতখানি সত্য, ওই বন্ধন ছিন্ন করার দুঃসাহস দেখিয়ে তা যাচাই করতে চেয়েছিল সত্যবতী। তার মেয়ে সুবর্ণ চৌদ্দ বছর বয়সেই শরীর-লুব্ধ স্বামী সম্পর্কে এই উপলব্ধিতে পৌঁছেছিল ঃ

'লোকটার ওই পরিতৃপ্ত ঘুমন্ত দেহটার দিকে তাকিয়ে কেমন ঘৃণা আসে, অপবিত্র লাগে লোকটাকে। এই কিছুক্ষণ আগেই যে ওর আদরের দাপটে হিমশিম খেতে হয়েছে, তা ভেবে বুকটা কেমন করে ওঠে।'

কিন্তু হীন প্রবৃত্তিসম্পন্ন ওই লোকটার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার কথা ভাবতে পারেনি। যৌনতা ও প্রতাপের নিগূঢ় সম্পর্কের দিকটি আলতাভাবে ছুঁয়ে গেছেন ঔপন্যাসিক। যেহেতু সুবর্ণ নিরালম্ব ও নিঃসহায়, নারীসত্তার অবমাননা মেনে নিয়েই তাকে শুকনো কাঠে কিশলয় জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখতে হয়েছে। নিজের মধ্যে প্রচ্ছন্ন 'ভালোবাসার আর ভালোবাসা পাবার বাসনা'য় চোখ বুজে আশ্রয় খুঁজতে হয়েছে। কেননা ওই পাষণ্ড স্বামী 'নেব না' বললে দাঁড়াবে কোথায় সুবর্ণ? তার তো কোনও পাদুপাদপ নেই সত্যবতীর বাবার মতো।

সাত

সুতরাং আমৃত্যু সুবর্ণ রয়ে গেল নিষ্ক্রমণশূন্য পিঞ্জরে। মাঝেমাঝে আকাশ হাতছানি দিয়েছিল তাকে, শুনেছিল বড়ো সময় ও বড়ো পরিসরের ঊর্মিমালার দূরাগত আহ্বান। আপন শূন্যতাকে ভরিয়ে দেওয়ার জন্যে শূন্যকে নিঙড়ে নিয়ে তৈরি করেছিল একান্ত নিজস্ব বয়ান। কিন্তু বারবার সব কিছু তলিয়ে গেছে চোরাবালিতে ; নিজের নিভৃত আকাঙ্ক্ষার চিতা রচিত হতে দেখেছে। অমোঘ এই অসম্পূর্ণতার বয়ান থেকে নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্পই পাঠকের অভিনিবেশ দাবি করে ঃ

'সুবর্ণলতা ভব্যতা চেয়েছে, সভ্যতা চেয়েছে, মানুষের মত হয়ে বাঁচতে চেয়েছে। সুবর্ণলতা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে নাড়ীর যোগ রাখতে চেয়েছে, দেশের কথা ভাবতে চেয়েছে, দেশের পরাধীনতার অবসান চেয়েছে।'

অতএব সত্যবতীর মতো দুঃসাহসী না-হলেও সুবর্ণ প্রতিস্পর্ধা জানিয়েছে নিশ্চয়। প্রতিস্পর্ধা বলছি কারণ তার চারদিকে ছিল ঘোর অন্ধকারের কৃষ্ণবিবর। চূড়ান্ত রক্ষণশীল পরিবারের বউ হয়েও সুবর্ণের সমস্ত সত্তা মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে, 'বর্হিজগতে বহমান বাতাসের স্পর্শ চায়। আর, পায়নি বলেই পনেরো বছর বয়স থেকেই মৃত্যুকামনা করতে-করতে পঞ্চাশ বছর বয়সে মারা যায়। তার শ্বশুরবাড়ির বাসিন্দাদের 'বোধের জগৎটা ওদের তৈরি বাড়ির ঘরের মতো। কোথাও এমন একটা ভেন্টিলেটার নেই যেখান দিয়ে চলমান বাতাসের এক কণা ঢুকে পড়তে পারে। দর্জিপাড়ার এই গলিটার বাইরে আর কোনও জগৎ আছে, 'এ ওরা শুধু জানে না তা নয়, মানতেও রাজী নয়।' সুবর্ণ 'খবরের কাগজ পড়া মেয়েমানুষ' বলে তাদের কাছে ভয়াবহ ও দুর্বোধ্য। চূড়ান্ত অশিক্ষা ও কুসংস্কারের কাছে বাইরের আলো-হাওয়া-রোদ পরাভূত হয়েছে বলেই সুবর্ণের জীববিশ্বও পূর্ণতা পায়নি।

ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে অজস্র অনুপুঙ্খ গ্রন্থনার মধ্যে অনিবার্য ভবিতব্যকে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি, এমন বলব কী? বাপের বাড়িতেও তো *'একটু বিষণ্ণতার আধারে ভরা একখণ্ড মূল্যবান রত্ন'* বলে গণ্য-হওয়া সুবর্ণর দাম মুহূর্তে কমে গিয়েছিল। তার ব্যক্তিত্বহীন সংবেদনাশূন্য নবকুমার যখন মেয়ের সংকটকে বোঝার চেষ্টা না-করে পুরোনো অভ্যাসে সত্যবতীকে গালাগাল দিয়েছে, সুবর্ণ পলকে বুঝে নিয়েছে, নবকুমার ও প্রবোধের মধ্যে তফাত শুধু মাত্রাগত, চরিত্রগত নয়। আর, তার ভাই সধনও পিতৃতন্ত্রের প্রহরী ; মা সত্যবতী তার কাছে যতখানি অস্বস্তিকর, ততখানি বোন সুবর্ণও। প্রকৃতপক্ষে নারীর পরিসর কোথাও নেই, না বিবাহ-পূর্ববর্তী অবস্থানে না বিবাহ-পরবর্তী পিঞ্জরে। নিজের কপালটা ঠাই ঠাই করে

দেওয়ালে ঠুকতে ঠুকতে সুবর্ণ যখন আর্ত প্রশ্ন করে, *'কেন? কেন তোমরা সবাই মিলে আমাকে অপমান করবে? কেন ? কেন?'* — তাতে সমস্ত প্রান্তিকায়িত নারীসত্তার সামূহিক বাচনই ব্যক্ত হয়। আসলে এই বিন্দুতে শেষ হতে পারত আখ্যান, তাতে ঔপন্যাসিকতার হানি হত না কোনও। কেননা পরবর্তী তিনশ' পৃষ্ঠা ধরে ওই সামূহিক স্বরই বিস্তৃত হয়েছে কেবল। এখানে 'তোমরা' সর্বনাম বিশেষ তাৎপর্যবহ। আর, 'আমার' আসলে আমাদের। ওই আর্ত প্রশ্নের তীব্র বিচ্ছুরণ শেষ হতে-না-হতে ভাষ্যকার-কথকস্বর জানায় ঃ

'ভেতরকার অব্যক্ত যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার আর কোনো ভাষা খুঁজে পায় না বলেই সুবর্ণলতা ওর এতদিনকার বিবাহিত জীবনের পুঞ্জীভূত সমস্ত প্রশ্নকে এই একটিমাত্র শব্দের দ্বারা ব্যক্ত করতে চায়।'

কিন্তু কাদের কাছে? সেইসব নবকুমার-প্রবোধ-সাধনদের কাছে যারা বাবা হয়ে, স্বামী হয়ে, ভাই হয়ে নির্বিকার ও নির্বিবেক পীড়নকে নিশ্ছিদ্র করে তুলেছে? সেইসব মনুষ্যবেশী জন্তুদের কাছে, শতধৌত হলেও যেসব অঙ্গারের মালিন্য মোচন হয় না? অতএব সুবর্ণলতাদের প্রশ্ন আসলে বহতা কালের কাছে, কোনও-এক দিন মীমাংসা উঠে আসবে, এই প্রত্যাশায়। আপাতত কথকস্বর নারীপরিসরের সম্ভাব্য নির্মাণ-প্রকল্পের প্রতি তর্জনি সংকেত করতে পারে শুধু ঃ

'হয়তো বা শুধু তাও নয়, সমস্ত অবরুদ্ধ নারীসমাজের বিরুদ্ধে প্রশ্নকে মুক্তি দেবার দুর্দমনীয় বাসনা এটা; যা সত্যকার কোনো পথ না-পেলে এমন উন্মত্ত চেষ্টায় মাথা কুটে মরে।

হয়তো বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধেও সভ্যতা আর প্রগতির চোখ-ঝলসানো আলোর সামনে গজিয়ে রাখা রঙচঙে পুতুল মেয়েদের পিছনের অন্ধকারে আজও কোটি কোটি মেয়ে এমনিভাবে মাথা কুটে কুটে প্রশ্ন করছে— কেন? কেন?

সুবর্ণলতার যুগ কি শেষ হয়ে গেছে?

কোনো যুগই কি কোনোদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে শেষ হয়ে যায়?

হয়তো যায় না।

হয়তো বৃদ্ধা পৃথিবীর শীর্ণ পাঁজরের খাঁজে খাঁজে কোথাও কোনোখানে আটকে থাকে ফুরিয়ে যাওয়া যুগের অবশিষ্টাংশ এখানে ওখানে উঁকি দিলে তার সন্ধান মেলে।

যেখানে মাথাকোটার প্রতিকার নেই। যেখানে লক্ষ লক্ষ 'কেন' ছুটোছুটি করে মরছে।'

একদণ্ডের জন্যে পাহারা সরায় না পিতৃতন্ত্র ; নিজের সত্যিকারের জীবনে ফিরে যাওয়ার প্রশ্ন মিলিয়ে যায় একসময়। ভালোবাসাহীন দাম্পত্যের দৈনন্দিন নিষ্ঠুরতা ও কদর্যতা মেনে নিতে-নিতে নিথর হয়ে যায় সুবর্ণলতাদের মন। তবু সারাটা জীবন কাঠিন্যের তপস্যা করে সুবর্ণ নারীসত্তার নির্মাণ-আকল্পকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। অবিরাম যুদ্ধ করে যেতে হয় *'বিকিয়ে যেতে দেব না'* পণ করে। ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া আত্মাকে পুনর্গঠনের স্বপ্ন দেখতে হয়। এক প্রজন্মে তা হয় না। এ এক ধারাবাহিক লড়াইয়ের ইতিকথা। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সুবর্ণ বুঝেছিল, সত্যবতী তার জীবনের অন্তরালে রয়েছে আলো হয়ে গান হয়ে। তেমনই বকুলও মা সুবর্ণকে জেনেছে পথ-চলার প্রেরণা হিসেবে। ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে ধারাবাহিক যুদ্ধের মধ্য দিয়ে নারীসত্তা ও নারীপরিসরের আবিষ্কার ও ধীরবিলম্বিত প্রতিষ্ঠার বৃত্তান্ত উপস্থাপিত

হয়েছে। ভাষ্যকার কণ্ঠস্বর বারবার জানিয়েছে ঃ

'শুধু একজন সুবর্ণলতাই নয়, এমন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ সুবর্ণলতা এমনি করে দিনে দিনে তিলে তিলে ধ্বংস হচ্ছে। কেউ লড়াই করে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে, কেউ ভীরুতায় অথবা সংসারের শান্তির আশায় আপন সত্তাকে বিকিয়ে দিয়ে পুরুষ সমাজের ইচ্ছের পুতুল হয়ে বসে আছে।'

এভাবে আশাপূর্ণা বঙ্গীয় সমাজের গভীরে অনতিপ্রচ্ছন্ন কৃষ্ণ মহাদেশের ঘোর অন্ধকারের উৎস থেকে উৎসারিত আলোর মহাকাব্যিক কথকতা করেছেন। যন্ত্রণার দহনকথাই তাঁর সংবেদনশীল লিখনবিশ্বে হয়ে উঠেছে সমান্তরাল যুদ্ধেরও আখ্যান। জিজ্ঞাসার বিশিষ্ট উপস্থাপনায় বিধৃত রয়েছে সম্ভাব্য মীমাংসার বিশল্যকরণী। না, কবি যা-ই বলুন, নারীকে পুরুষ 'সৌন্দর্য সঞ্চারি' গড়ে তোলেনি। এ যে কত বড় প্রকাণ্ড মিথ্যা, আশাপূর্ণার ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনে ধরা রয়েছে তারই ক্রমিক ও অনুপুঙ্খ বিবরণ। নারীসত্তার নির্মাণ-প্রকল্পের সূত্রধার ও অভিযন্তা সত্যবতী-সুবর্ণলতা-বকুলের মতো নানাপ্রজন্মের নারী এবং অন্তঃপুরের কারাগারে তুষের আগুনে পুড়ে ছাই হলো যারা প্রতিনিয়ত। নারীসত্তা ও নারীপরিসর নিয়ে নারীর যথার্থ বয়ান কী হতে পারে, আশাপূর্ণা সেই প্রাথমিক জিজ্ঞাসাকে আখ্যানে রূপান্তরিত করেছেন। *'আমি নারী, আমি মানুষ'* ঃ এই তো সত্যবতী-সুবর্ণলতাদের মুখ্য বার্তা ; তাদের কথা তারা নিজেরা বলেছে — বাংলা সাহিত্যে এ এক নতুন আরম্ভের ঘোষণা।

এর তাৎপর্য চমৎকারভাবে প্রকাশ করে গেছেন সিমোন দ্য বোর্ভোয়া, তাঁর যুগান্তকারী 'The second Sex' বইতে ঃ "*A man would never think of writing a book on the specified situation of males in the human race. But if I want to define myself, I must first of all declare : 'I am a woman', this truth is the background from which all further claims will stand out. A man never begins by affirming that he is an individual of a certain sex; that he is a man goes without saying.*"

এই নিরিখে জীবনের জয়-পরাজয় নয়, আখ্যানবিশ্বের টানাপোড়েনে সূত্রধার হওয়া না-হওয়া নয় — সময়স্রোতে ভাসমান কোনও-এক বাঙালিনীর যুগপৎ নারী এবং মানুষ বলে পরিচিত হওয়ার ন্যূনতম দাবি জানানোর ঔপন্যাসিক প্রতিবেদনই হল 'সুবর্ণলতা'।

■ *লেখক আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যশস্বী অধ্যাপক, ভাষা ও সাহিত্য অনুষদের অধ্যক্ষ এবং বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট তাত্ত্বিক সমালোচক, কবি ও প্রাবন্ধিক।*

P23687

'গোরা' উপন্যাসের সমাজতত্ত্ব

জন্মজিৎ রায়

রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' বাংলা কথাসাহিত্যের বহু-আলোচিত ধ্রুপদী উপন্যাস। উপন্যাসটির উৎসর্গপৃষ্ঠায় লেখা আছে ঃ 'শ্রীমান রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর কল্যাণীয়েষু / ১৪ মাঘ ১৩১৬।' সঙ্গে খ্রিস্টীয় সনের উল্লেখ নেই। সেটা হবে ২৭ জানুয়ারি, ১৯১০। রবীন্দ্র-তনয় রথীন্দ্রনাথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানের স্নাতক হয়ে দেশে ফিরে আসেন ১৯০৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে তখন চলছে ভারত-চিন্তা ও অধ্যাত্মচিন্তার তুরীয়তা। দেশে ফিরে আসার চার মাসের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর ছেলের বিবাহ দিলেন। গগনেন্দ্রনাথের বোন বিনয়িনী দেবীর বালবিধবা কন্যা প্রতিমা দেবীর সঙ্গে রথীন্দ্রনাথের বিবাহ হল। সেকালের আদি ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে এটা একটা বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। এই বিবাহ উপলক্ষেই পুত্রকে 'গোরা' উপন্যাস উৎসর্গ করেন পিতা রবীন্দ্রনাথ। 'গোরা' প্রথমে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে শুরু করে 'প্রবাসী' পত্রিকায়। ১৯০৭ সালের আগস্ট মাসে প্রকাশিত হতে শুরু করে ১৯১০ সালের মার্চে শেষ হয়। একই সালে উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময়কার রচনার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলি এবং ওই গ্রন্থভুক্ত 'ভারততীর্থ' কবিতাটি। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচিন্তা ও চেতনা তখন তুঙ্গস্পর্শী, আবার অন্যদিকে তিনি ভারতবর্ষের স্বরূপ-সন্ধানে তৎপর। সামাজিক কুসংস্কার থেকে সমাজ ও ধর্মকে তিনি মুক্ত করতে আগ্রহী। আদি ব্রাহ্মসমাজের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতা তখন তাঁর অভিপ্রেত নয়। 'গোরা' উপন্যাস পড়ে নাকি অনেকের এ-রকম ধারণা হয়েছিল যে, রবীন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল অংশের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজের পরিবর্তনকামী অংশের বিরোধ তখনকার সামাজিক জীবনের একটা সমস্যা। অনুরূপ সমস্যা হচ্ছে খ্রিষ্টধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের বিরোধ এবং পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ভাবধারার সংঘাত।

কেশবচন্দ্র সেনের খ্রিষ্ট-ভক্তি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অপছন্দ ছিল। বৈষ্ণবধর্ম-প্রভাবিত কেশবচন্দ্রের ভক্তিবাদও অপছন্দ ছিল তাঁর। রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক কারণেই হয়েছেন মধ্যপন্থী ও সমন্বয়বাদী। যে সালে 'গোরা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়, সেই ১৯১০ থেকে শান্তিনিকেতনে মহাপুরুষদের জন্মোৎসব পালিত হতে শুরু করে। রবীন্দ্রনাথ চৈতন্যদেবের আবির্ভাব ও তিরোভাব উপলক্ষে ভাষণ দান করেন। ১৯১১ সালের লোকগণনার সময় নৈষ্ঠিক ব্রাহ্মরা নিজেদের হিন্দু বলতে চাননি এবং ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না, এ-জাতীয় বিতর্কও উঠেছিল। বিতর্কে মীমাংসাসূত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে, ব্রাহ্মসমাজ স্বতন্ত্র সমাজ নয়, একটি সম্প্রদায় মাত্র এবং ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাব হিন্দুসমাজেরই ইতিহাসের একটি অঙ্গ। অর্থাৎ, ব্রাহ্মধর্ম বৃহত্তর হিন্দুধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত এবং ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন হিন্দুধর্ম ও সমাজেরই একটি সংস্কার-প্রয়াস।

রবীন্দ্রনাথ 'গোরা' উপন্যাস রচনা আরম্ভ করেন ১৯০৭ সালে। উনিশ শতক অস্তমিত হয়ে তখন বিশ শতক এগিয়ে চলেছে। বিশ শতকের সূচনালগ্নে, ১৯০১ সালে, রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ। তারপর প্রতিষ্ঠা করেছেন 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। কালিদাসের

যুগের ভারতকে তিনি বর্ণাঢ্য ও স্বপ্নরক্তিম করে এঁকেছিলেন 'কল্পনা' কাব্যে, বৌদ্ধযুগের ভারতকে এঁকেছিলেন 'কথা ও কাহিনী' কাব্যে। প্রাচীন ভারতের শিক্ষা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির সারাংসার চিত্রিত হল 'নৈবেদ্য' কাব্যের সনেটকল্প কবিতায় ১৯০১ সালে। ভারতাত্মার স্বরূপ-সন্ধান ও ভারতের ইতিহাস-জিজ্ঞাসা তাঁর প্রবন্ধগুলিতে রূপায়িত হতে লাগল ১৯০১ থেকে ১৯১০ সালের মধ্যে। এই সময়কার প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হচ্ছে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' (১৯০১), 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' (১৯০২) ও 'তপোবন' (১৯০৯)। এই তিনটি প্রবন্ধে প্রকাশিত তাঁর চিন্তা, সিদ্ধান্ত ও উপলব্ধিকে 'গোরা' উপন্যাসে নতুন করে আমরা দেখতে পাই।

এ-সকল প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সভ্যতা, সংস্কৃতি এবং সমাজ সম্পর্কে যে বেদোজ্জ্বলা অনুভূতিদীপ্ত মন্তব্য করেছেন, তার কিছু স্মরণীয় নমুনা এখানে প্রণিধানযোগ্য। যেমন,

১. *প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানবসাধারণের। আমাদের দেশে বর্ণাশ্রমধর্মে যখন সেই উচ্চতর ধর্মকে আঘাত করিল তখন ধর্ম তাহাকে আঘাত করিল : ধর্ম এব হতো হন্তি ধর্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ। (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা)*

২. *আমাদের হিন্দুসভ্যতার মূলে সমাজ, য়ুরোপীয় সভ্যতার মূলে রাষ্ট্রনীতি। সামাজিক মহত্ত্বেও মানুষ মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে, রাষ্ট্রনীতিক মহত্ত্বেও পারে। কিন্তু আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় ছাঁদে নেশন গড়িয়া তোলাই সভ্যতার একমাত্র প্রকৃতি এবং মনুষ্যত্বের একমাত্র লক্ষ্য, তবে আমরা ভুল বুঝিব। (তদেব)*

৩. *ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যে অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা, বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা। (ভারতবর্ষের ইতিহাস)*

৪. *য়ুরোপীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা বিরোধমূলক; ভারতবর্ষীয় সভ্যতা যে ঐক্যকে আশ্রয় করিয়াছে তাহা মিলনমূলক। য়ুরোপীয় পোলিটিক্যাল ঐক্যের ভিতরে যে বিরোধের ফাঁস রহিয়াছে তাহা তাহাকে পরের বিরুদ্ধে টানিয়া রাখিতে পারে, কিন্তু তাহাকে নিজের মধ্যে সামঞ্জস্য দিতে পারে না। এইজন্য তাহা ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, রাজায় প্রজায়, ধনীতে দরিদ্রে বিচ্ছেদ ও বিরোধকে সর্বদা জাগ্রত করিয়াই রাখিয়াছে। (তদেব)*

৫. *আমরা জানি, আমাদের পিতামহগণ দেশ-অধিকার ও বাণিজ্য-বিস্তার করেন নাই। এইটে জানাইবার জন্যই ভারতবর্ষের ইতিহাস। (তদেব)*

৬. *য়ুরোপে রিলিজন বলিয়া যে শব্দ আছে ভারতবর্ষীয় ভাষায় তাহার অনুবাদ অসম্ভব; কারণ, ভারতবর্ষ ধর্মের মধ্যে মানসিক বিচ্ছেদ ঘটিতে বাধা দিয়াছে— আমাদের বুদ্ধি বিশ্বাস আচরণ, আমাদের ইহকাল পরকাল, সমস্ত জড়াইয়াই ধর্ম। (তদেব)*

৭. *ভারতবর্ষের সত্য হচ্ছে জ্ঞানে অদ্বৈততত্ত্ব, ভাবে বিশ্বমৈত্রী এবং কর্মে যোগসাধনা।*

(তপোবন)

উনিশ শতকের বাংলা রেনেসাঁসের বাত্যাবিক্ষুব্ধ বাংলা। নবজাগরণের বাংলায় ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম জ্ঞানীর বুদ্ধিচর্চা নয়, আবার নৈষ্ঠিক সদাচারীর আচারধর্মও নয়। তাঁর কাছে ধর্ম পরোপকার, পরহিতব্রত ও মানবতা। রবীন্দ্রনাথও মানবতাবাদী ও মানবধর্মে বিশ্বাসী। বিশ শতকের প্রারম্ভে 'নৈবেদ্য' কাব্যের কবিতায় কবি যে-ভারতের স্বর্গীয় সমুন্নতি কল্পনা করেছেন, সেই ভারতে 'কর্মধারা ধায় অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়' এবং 'আচারের মরুবালুরাশি বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি'। উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণের মূলমন্ত্র ছিল যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। নারীস্বাতন্ত্র্যবাদও এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আদর্শের অন্তর্ভুক্ত। 'গোরা' উপন্যাস যেন নবজাগরণের বাংলার চিন্ময় রূপ। নবযুগের ধর্ম মানুষের চিদ্‌বৃত্তি ও হৃদ্‌বৃত্তির সহাবস্থান ও সমন্বয়ে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তায় এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাস ও এই উপন্যাসের নাট্যরূপ 'বিসর্জন' (১৮৯০) সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের ধর্মচিন্তার তিনটি বৈশিষ্ট্য বা প্রবণতাকে পাঠকসমক্ষে তুলে ধরেছিল। এগুলি হচ্ছে : মূর্তিপূজার বিরোধিতা, হিংসা ও পশুবলির বিরোধিতা ও আচার-অনুষ্ঠান-নিরপেক্ষ হৃদয়ধর্মের শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস। 'গোরা' উপন্যাস রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন কঠোর নিরামিষাশী।

'গোরা' উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনার কাল হচ্ছে ১৮৮২। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয় ১৮৮২ সালে। এই সময়কার আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা রামকৃষ্ণ পরমহংসের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের মিলন। এই মিলন প্রথম ঘটে সম্ভবত ১৮৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে। এক হিসেবে গোরা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথেরই অদৃশ্য অন্তরাত্মা, বয়সে প্রায় তাঁরই সমবয়স্ক। রবীন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৬১ সালে। আর গোরার জন্ম সিপাহি বিদ্রোহের বহ্নিবলয়ের মধ্যে ১৮৫৭ সালে। 'গোরা' উপন্যাসের নায়ক গোরার জীবনেতিহাস উনিশ শতকের নবজাগরণের সমাজচিন্তা, রাষ্ট্রচিন্তা, ধর্মচিন্তা ও জাতীয় চেতনার ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস। আবার এই ইতিহাস রবীন্দ্রনাথের আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মমীমাংসারও ইতিহাস। উনিশ শতকের নবজাগরণের বাংলা ও বাঙালির মন, মনন ও মনীষাকে জানতে হলে এবং সেকালের সংশয়, সমস্যা ও সমাধানকে বুঝতে হলে বঙ্কিমচন্দ্র-বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথ-অরবিন্দের জীবনী ও রচনা যেমন অবশ্যপাঠ্য, তেমনি অবশ্যপাঠ্য হচ্ছে দুখানা বই ঃ শিবনাথ শাস্ত্রীর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'। সুতরাং বলা যেতে পারে, 'গোরা' নবজাগরণের চিন্ময় বাংলার শিল্পরূপায়ন।

'গোরা' উপন্যাসের শৈল্পিক বা নান্দনিক মূল্যায়ন এখানে আমাদের বিবেচ্য নয়। এখানে আমাদের সকল তন্ময়তার কেন্দ্র, সকল মনোযোগ ও সন্ধিৎসার বিষয় উপন্যাসের শিল্পকায়ার ভেতরে শ্রুতিগম্য সেই অতিক্রান্ত শতকের কলকল্লোল ও শঙ্খরব, সকল গীতলতা ও মেঘমন্দ্র।

'গোরা' উপন্যাসের পটভূমিকায় উনিশ শতকের বাংলার সামাজিক জীবন কীভাবে ছায়াপাত করেছে, এখানে তার কিছু দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রকাশ (১৮৭২) বাংলার সারস্বত-সামাজিক ইতিহাসে অত্যন্ত স্মরণীয় ঘটনা। রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রসঙ্গত মনে পড়ে ঃ

'অবশেষে বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন আসিয়া বাঙালির হৃদয় একেবারে লুট করিয়া লইল। একে তো তাহার জন্য মাসান্তের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতাম, তাহার পরে বড়োদলের পড়ার শেষের জন্য অপেক্ষা করা আরও বেশি দুঃসহ হইত।' (জীবনস্মৃতি)

১৮৭২ সালে 'বঙ্গদর্শন' যখন প্রকাশিত হয়, তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স এগারো, আর গোরার বয়স পনেরো। 'গোরা' উপন্যাসে দেখতে পাই ঃ

'বিনয় নূতন-প্রকাশিত বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' লইয়া আনন্দময়ীকে শুনাইতেছিল — পানের ডিবা হাতে লইয়া সেখানে আসিয়া মহিম তক্তপোশের উপরে ধীরে ধীরে বসিলেন।' (গোরা, বিশ্বভারতী ১৩৮৩ সংস্করণ, পৃ. ২৩৪)

'গোরা' উপন্যাসে দেখা যায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালি সমাজে গ্রন্থপাঠ ও তর্কবিতর্ক-আলোচনার উৎসাহ। আরো কিছু উদাহরণ প্রাসঙ্গিক। যেমন,

'পরেশবাবু ঘরে আলো জ্বালাইয়া এমার্সনের গ্রন্থ পড়িতেছিলেন।'

(গোরা, পৃ. ২৭৯)

উপন্যাসে উল্লিখিত 'এমার্সন' সম্ভবত আমেরিকার কবি-প্রাবন্ধিক র‍্যাল্‌ফ ওয়াল্ডো এমারসন (১৮০৩-১৮৮২)। 'গোরা' উপন্যাসের ঘটনাকাল ১৮৮২ এমারসনের মৃত্যুবর্ষও বটে। তাঁর একটি উল্লেখযোগ্য কবিতা হচ্ছে 'ব্রহ্মা' (Brahma), যেটি ব্রাহ্মধর্মের অন্যান্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথও মনে হয় পড়েছিলেন। কবিতার প্রারম্ভিক স্তবকটি এ-রকম ঃ

If the red slayer think he slays,
Or if the slain think he is slain,
They know not well the subtle ways
I keep, and pass, and turn again.

গ্রন্থপাঠের ক্ষেত্রে গ্রন্থনির্বাচনকে যে সেকালে প্রভাবিত করত ধর্ম-সাম্প্রদায়িকতা বা ব্রাহ্মিকতা ও ছুঁৎমার্গী দৃষ্টিভঙ্গি, রবীন্দ্রনাথ সেটা উল্লেখ করেছেন।

'সে সময়ে বাংলাদেশে ইংরেজি-শিক্ষিত দলের মধ্যে ভগবদ্‌গীতা লইয়া আলোচনা ছিল না। কিন্তু, পরেশবাবু সুচরিতাকে লইয়া মাঝে মাঝে গীতা পড়িতেন; কালীসিংহের মহাভারতও তিনি প্রায় সমস্ত সুচরিতাকে পড়িয়া শুনাইয়াছেন। হারানবাবুর কাছে তাহা ভালো লাগে নাই। এ-সমস্ত গ্রন্থ তিনি ব্রাহ্ম পরিবার হইতে নির্বাসিত করিবার পক্ষপাতী। তিনি নিজেও এগুলি পড়েন নাই। রামায়ণ-মহাভারত-ভগবদ্‌গীতাকে তিনি হিন্দুদের সামগ্রী বলিয়া স্বতন্ত্র রাখিতে চাহিতেন। ধর্মশাস্ত্রের মধ্যে বাইব্‌ল্‌ই তাঁহার একমাত্র অবলম্বন ছিল।' (গোরা, পৃ. ১০২)

সেকালে ব্রাহ্মদের মধ্যে যাঁরা খ্রিস্টধর্মের দ্বারা কিংবা বাইবেলের দ্বারা এতটা প্রভাবিত ছিলেন না, তাঁদের পাঠ্যতালিকায় ছিল 'ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট' (Imitation of christ)।

'সুচরিতা আজ প্রাতঃকাল হইতে নিজের শোবার ঘরে নিভৃতে বসিয়া 'খৃস্টের অনুকরণ' নামক একটি ইংরেজি ধর্মগ্রন্থ পড়িবার চেষ্টা করিতেছে।' (গোরা, পৃ. ১৬৩)

সেকালের উৎসাহী ব্রাহ্মের চেহারা কী-রকম ছিল? হারানচন্দ্র নাগ বা পানুবাবুর মধ্যে সেটা দেখতে পাওয়া যায়। পানুবাবুর বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

'ব্রাহ্ম সমাজের সকল কাজেই তাঁহার হাত ছিল — তিনি নৈশস্কুলের শিক্ষক, কাগজের

সম্পাদক, স্ত্রীবিদ্যালয়ের সেক্রেটারি — কিছুতেই তাঁহার শ্রান্তি ছিল না।' (গোরা, পৃ. ৯৯)

অনেক ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কবি বা গীতিকারের নামোল্লেখ না করে তাঁদের রচনার উল্লেখ করে উনিশ শতকের ঐতিহাসিক বাতাবরণ ও যুগাবহ তৈরি করতে চেয়েছেন। লালন ফকিরের গান ('খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কমনে আসে যায়', পৃ. ৭), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা ('স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতিকোটি মানবের বাস', পৃ. ৩২) প্রসঙ্গত স্মরণীয়। ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন অবশ্য স্বনামেই উপস্থিত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ঃ

'এদিকে কেশববাবুর বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া গোরা ব্রাহ্মসমাজের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়িল।' (গোরা, পৃ. ৩৩)

১৮৮২ সালের কলকাতার ভাব-সংঘাত ও ধর্মাদর্শ-সংঘাত 'গোরা' উপন্যাসের পটভূমিকায় নেপথ্যসঙ্গীতের মতো নিরন্তর শ্রবণগোচর হলেও রানি রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে রামকৃষ্ণ পরমহংসের সনাতন হিন্দুধর্মের আন্দোলন এখানে প্রত্যক্ষভাবে অনুক্ত ও অনুপস্থিত। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারক হয়ে শেষ পর্যন্ত যিনি পুনরায় বৈষ্ণবীয় ভক্তিবাদে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন, সেই বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও এখানে স্বনামে-বেনামে অনুপস্থিত। বরং শশধর তর্কচূড়ামণিই যেন এখানে নামান্তরে সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি। সেকালের বাংলায় শশধর তর্কচূড়ামণি রক্ষণশীল হিন্দুধর্মের প্রধান পুরোধা। এ-জাতীয় আরেকজন পুরোধা ছিলেন পরিব্রাজক কৃষ্ণপ্রসন্ন সেন বা পরবর্তীকালের স্বামী কৃষ্ণানন্দ। শশধর তর্কচূড়ামণি সনাতন হিন্দুধর্মের প্রতিটি প্রথা ও অনুশাসনকে সমর্থন করতেন। তিনি টিকি রাখার প্রথার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। ১৮৭৬ সালে রাশিয়া থেকে এল থিওসফি, কর্নেল অলকট, মাদাম ব্লাভাট্স্কি ও অ্যানি বেসান্ট থিওসফিস্ট আন্দোলনের সূচনা করেন। তাঁরা টিকি রাখার বৈদ্যুতিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। গোরাকে দেখা যায় টিকি রাখতে।

'... গোরা গঙ্গাস্নান ও সন্ধ্যাহ্নিক করিতে লাগিল, টিকি রাখিল, খাওয়া-ছোঁওয়া সম্বন্ধে বিচার করিয়া চলিল।' (গোরা, পৃ. ৩৪-৩৫)

গোরা ধর্মীয় আচার-প্রথার দ্বারাই দেশের জনসাধারণের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে চেয়েছে। তার ত্রিবেণীসঙ্গমে স্নান করতে যাওয়ার পেছনেও একই উদ্দেশ্য নিহিত।

'গোরা যে ত্রিবেণীতে স্নান করিতে সংকল্প করিয়াছে, তাহার কারণ এই যে, সেখানে অনেক তীর্থযাত্রী একত্র হইবে। সেই জনসাধারণের সঙ্গে গোরা নিজেকে এক করিয়া মিলাইয়া দেশের একটি বৃহৎ প্রবাহের মধ্যে আপনাকে সমর্পণ করিতে ও দেশের হৃদয়ের আন্দোলনকে আপনার হৃদয়ের মধ্যে অনুভব করিতে চায়।' (গোরা, পৃ. ৪০)

দেশের সাংস্কৃতিক ও ধর্মাচারগত ঐতিহ্যের সঙ্গে একাত্মতাবোধের বাসনা অবশ্যই রক্ষণশীলতা নয়। পরেশবাবুর ব্রাহ্ম পরিবারে গোরার প্রথম আবির্ভাবে যেন উনিশ শতকের সংস্কারকামী ব্রাহ্মধর্ম এবং সনাতনপন্থী রক্ষণশীল হিন্দুধর্মকে মুখোমুখি হতে দেখতে পাওয়া যায়।

'গোরার কপালে গঙ্গামৃত্তিকার ছাপ, পরনে মোটা ধুতির উপর ফিতে-বাঁধা জামা ও

মোটা চাদর, পায়ে গুঁড়-তোলা কটকি-জুতা। সে যেন বর্তমান কালের বিরুদ্ধে এক মূর্তিমান বিদ্রোহের মতো আসিয়া উপস্থিত হইল।' (গোরা, পৃ. ৫৩)

এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে, ১৮৮২ সালে ইংরাজিয়ানা বা সাহেবিয়ানা ও খ্রিস্টীয় প্রভাব (রবীন্দ্রনাথ-কথিত খৃস্টানি) সমাজ-জীবনে অস্তায়মান। ডিরোজিও প্রয়াত হয়েছেন প্রায় অর্ধশতক পূর্বে এবং তখন 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের উন্নাসিকতাও ভীতিপ্রদ নয়। ডিরোজিও-শিষ্যদলের অগ্রগণ্য কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৩-১৮৮৫) ১৮৩২ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন এবং ১৮৩৭ সালে খ্রিস্টধর্মের আচার্য পদে উন্নীত হন। ডিরোজিও-শিষ্য মহেশচন্দ্র ঘোষও ধর্মান্তরিত হয়েছিলেন। 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের মধ্যে হিন্দুধর্ম-বিরোধিতা ও স্বাজাতিবিদ্বেষ উৎকটরূপে দেখা দিলেও এগুলি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। প্রসঙ্গত বলা যায়, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৫০ সালে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের নেতা রাধাকান্ত দেবকে ব্যঙ্গপুস্তিকায় গাধাকান্ত নামে অভিহিত করলেও ১৮৬১-৬২ সালে হিন্দুদর্শন বিষয়ে গবেষণামূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর আরেকখানা বই Aryan Witness বা আর্যশাস্ত্রের সাক্ষ্য ১৮৭৫ সালে প্রকাশিত হয়। সুতরাং 'গোরা' উপন্যাসের ঘটনাকালে, অর্থাৎ ১৮৮২ সালে ডিরোজিও-শিষ্যবর্গের হিন্দুদ্রোহিতা ছিল না। সঙ্গতকারণেই মনে হয়, ব্রাহ্ম-হিন্দু বিরোধের পরিবর্তে ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্বিরোধই 'গোরা' উপন্যাসে বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখের খ্রিস্ট-বিরোধিতার মূল কারণ ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের হিন্দুদ্রোহিতা, স্বজাতিবিদ্বেষ ও খ্রিস্টধর্ম-অনুরাগ। এই মনোভাব ব্রাহ্মসমাজের একাংশের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কেশবচন্দ্র সেন বেরিয়ে এলেন আদি ব্রাহ্মসমাজ থেকে। তিনি প্রথমে ছিলেন খ্রিস্টধর্ম-প্রেমিক। কেশবপন্থী প্রতাপচন্দ্র মজুমদার বই লিখলেন 'প্রাচ্যদেশীয় খৃষ্ট'। আত্মরক্ষার তাগিদে স্থাপিত হল 'হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়'। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর হলেন এর প্রথম সম্পাদক। 'গোরা' উপন্যাসে আমরা দেখি, 'হিন্দুহিতৈষী সভা'-র সম্পাদক গোরা। আদি ব্রাহ্মসমাজের রক্ষণশীলতা ও আভিজাত্যগর্বের প্রকাশ দেখা যায় রামকৃষ্ণ পরমহংসকে দেবেন্দ্রনাথের নিমন্ত্রণ ও পরবর্তী প্রত্যাখ্যানের ঘটনায় এবং কেশবচন্দ্রের সম্পর্কচ্ছেদে। রামকৃষ্ণের ধর্মপ্রচারের মূলে ছিল বেদ ও তন্ত্রের সমন্বয়ের চেষ্টা, খ্রিস্ট-বিরাগ ও ইসলাম-বিদ্বেষ দূর করার প্রয়াস। এক কথায়, সর্বধর্ম-সমন্বয়। অন্তর্বিরোধ প্রবল ছিল বলেই কালক্রমে ব্রাহ্মসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে। রামকৃষ্ণের শিষ্যবর্গের মধ্যে একটি বৃহৎ অংশ ছিল অব্রাহ্মণ। যেমন, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম), গিরিশচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ), রাখালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী ব্রহ্মানন্দ), কালীপ্রসাদ চন্দ্র (স্বামী অভেদানন্দ), সারদাপ্রসন্ন মিত্র (স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ), নিত্যনিরঞ্জন ঘোষ (স্বামী নিরঞ্জনানন্দ), যোগীন্দ্রনাথ চৌধুরী (স্বামী যোগানন্দ), বাবুরাম ঘোষ (স্বামী প্রেমানন্দ), গোপালচন্দ্র ঘোষ (স্বামী অদ্বৈতানন্দ)। দেখা যাচ্ছে, রামকৃষ্ণের নব্যহিন্দু আন্দোলনের মূলে ছিল তার লোকায়তিক চরিত্র, মূর্তিপূজার আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠা এবং অব্রাহ্মণ্য প্রভাব। তুলনা করলে দেখা যাবে, 'গোরা' উপন্যাসের অধিকাংশ চরিত্রই ব্রাহ্মণ সমাজভুক্ত নারীপুরুষ। যেমন, পরেশবাবু (পদবী ভট্টাচার্য) ও গৌরমোহনের পালকপিতা কৃষ্ণদয়াল। সুচরিতার আসল নাম রাধারানি মুখোপাধ্যায়। বিনয়ের সম্পূর্ণ নাম বিনয়ভূষণ চট্টোপাধ্যায়। সুচরিতার মাসিও ব্রাহ্মণকন্যা, পালসার বিখ্যাত রায়চৌধুরী পরিবারে তার বিবাহ হয়। এদের মধ্যে গোরা একান্তই সঙ্গতিহীন ও বেমানান। সে কেবল অব্রাহ্মণই নয়,

অহিন্দুও। উনিশ শতকের শেষ চরণে নব্যহিন্দু ধর্মান্দোলনের প্রগতিশীল দিকটি 'গোরা' উপন্যাসে সঠিক প্রতিফলিত হয়নি। অনুরূপভাবে ব্রাহ্মসমাজের প্রগতিশীল অংশের, কিংবা কেশবচন্দ্রের 'ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ'-এর সঠিক প্রতিফলন 'গোরা' উপন্যাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। আদি ব্রাহ্মসমাজের প্রাচীনপন্থী দলের নেতা ছিলেন দেবেন্দ্রনাথ, অন্যদিকে কেশবচন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন যুবকদলের নেতা। কেশবচন্দ্রের অনুগামী নবীন ব্রাহ্মগণ উপবীত ত্যাগ করেন এবং জাতিভেদের বিরোধিতা করেন। ১৮৬৪ সাল থেকে তাঁরা অসবর্ণ বিবাহ কার্যকর করতে সচেষ্ট হন এবং উপবীতধারী ব্রাহ্মণ আচার্যদের ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসে উপাসনা পরিচালনার বিরোধিতা করেন। ১৮৬৬ সালে কেশবচন্দ্র আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। সেকালে বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীও উপবীত ত্যাগ করেছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে হারানচন্দ্র নাগ ও সুচরিতার অসবর্ণ বিবাহের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেটা হয়নি। গোরা ও সুচরিতার বিবাহটাও হয়নি, তবে মিলনদৃশ্য আছে। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আদি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। দেবেন্দ্রনাথের তিরোধানের পর আদি ব্রাহ্মসমাজকেই যেন তিনি যুগোপযোগী ও সুসংস্কৃত করে তুলতে চেয়েছিলেন। 'গোরা' উপন্যাসে এ-জাতীয় চিন্তাচেষ্টার নিদর্শন পাওয়া যায়। সুতরাং আলোচ্য উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে হিন্দু-ব্রাহ্ম ভাবসংঘাতের পরিবর্তে ব্রাহ্মদের অন্তর্বিরোধই মূল সুরটি রচনা করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পরেশবাবুর মধ্যে যেন রয়েছে আদি ব্রাহ্মসমাজের ঔদার্য, অন্যদিকে তাঁর স্ত্রী বরদাসুন্দরীর মধ্যে নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উৎকেন্দ্রিকতা। বরদাসুন্দরী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বর্ণনা প্রণিধেয় ঃ

> *'পৃথিবীতে কোন্ জিনিসটা ব্রাহ্ম এবং কোন্‌টা অব্রাহ্ম তাহারই ভেদ লইয়া তিনি সর্বদাই অত্যন্ত সতর্ক হইয়া থাকেন। সেইজন্য রাধারানীর নাম পরিবর্তন করিয়া তিনি সুচরিতা রাখিয়াছেন।' (গোরা, পৃ. ৪৯)*

ব্রাহ্মদের আভিজাত্যবোধও দেখা যায় বরদাসুন্দরীর মধ্যে ঃ

> *'মেয়েদের পায়ে মোজা দেওয়াকে এবং টুপি পরিয়া বাহিরে যাওয়াকে তিনি এমনভাবে দেখেন যেন তাহাও ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতের একটি অঙ্গ।' (গোরা, পৃ. ৪৯)*

অন্যদিকে কৃষ্ণদয়ালের মধ্যে যেন দেখতে পাওয়া যায় এককালের ব্রাহ্মসমাজের প্রচারক ও পরবর্তীকালের বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বিজয়কৃষ্ণর ছাপ ঃ

> *'ইনি সর্বদাই গেরুয়া রঙের পট্টবস্ত্র পরিয়া আছেন, হাতের কাছে পিতলের কমণ্ডলু, পায়ে খড়ম। মাথার সামনের দিকে টাক পড়িয়া আসিতেছে, বাকি বড়ো বড়ো চুল গ্রন্থি দিয়া মাথার উপরে একটা চূড়া করিয়া বাঁধা।' (গোরা, পৃ. ৩১)*

গোরা চরিত্রের মূলে স্বামী বিবেকানন্দ কিংবা ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের প্রভাবের কথা অনেক সমালোচক বলে থাকেন। বিবেকানন্দের তিরোধানের (১৯০২) পর সেকালের বঙ্গদেশে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁর চিন্তাধারার ক্রমবর্ধিষ্ণু প্রভাব অনুভব করা যায় কার্জনের বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা (১৯০৫) এবং তৎপরবর্তী আন্দোলনে, বিশেষ করে ভগিনী নিবেদিতা ও অরবিন্দ ঘোষের চিন্তাচেতনা ও কর্মধারায়। রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারাও অনেকক্ষেত্রে বিবেকানন্দের চিন্তাধারার খুব কাছাকাছি চলে এসেছিল বলে মনে হয়। তবে বিবেকানন্দের দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাধারার সঙ্গে গোরার জীবনবীক্ষা ও মতবাদের যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, তেমনি বৈসাদৃশ্যও। ধর্মসম্প্রদায়-নির্বিশেষে বিবেকানন্দ ছিলেন ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের পক্ষে ঃ

> *'I donot care whether they are Hindus or Mohammedans or Christians, but those that love the Lord will always command my service.'*

(Swami Gambhirananda, History of the Ramkrishna Math and Mission, P. 93)

স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস ছিল যে, দেশের অনগ্রসরতার মূল কারণ জাতিভেদপ্রথা ঃ

'India's doom was sealed the very day they invented the word Mlechchha and stopped communion with others.' (তদেব, পৃ. ৯৩)

বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত বেলুড় মঠের সংবিধানের ২২ সংখ্যক ধারায় তাই বলা হয়েছে ঃ

'The root of all misery in India is the wide gulf between the lower and the upper classes.' (তদেব, পৃ. ১৩৬)

জাতিভেদের সমাধানসূত্রে বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন *'from caste to equality through culture by a process of levelling up rather than levelling down.'* বিবেকানন্দের জীবনীকার ড০ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর আর্থনীতিক চিন্তাধারার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মেরি লুই বার্ক তাঁর 'Vivekananda : New Discoveries' (পৃ. ৫৯৬) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকার মধ্যাঞ্চল পরিভ্রমণের সময় তিনি (বিবেকানন্দ) শ্রমিক-কৃষকদের সঙ্গে সরাসরি কথাবার্তার মাধ্যমে তাদের অবস্থা জানতে চেষ্টা করেন। নিজের দেশেও সম্ভবত তিনি এটা করেছিলেন।

উনিশ শতকের ভারতবর্ষে আর্থনীতিক চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে তিনজন স্মরণীয় পুরুষ হচ্ছেন দাদাভাই নওরোজি, রমেশচন্দ্র দত্ত ও গোবিন্দ রানাডে। বিবেকানন্দে এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার দেখতে পাই আমরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ঈশ্বর গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৪৭ থেকে ১৮৯২ সালের মধ্যে ষাটটি অর্থনীতি-বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উনিশ শতকের কিংবা স্বামী বিবেকানন্দের আর্থ-সামাজিক বা আর্থনীতিক চিন্তাধারার প্রভাব-প্রতিফলন সাধারণ বিচারে 'গোরা' উপন্যাসে দেখতে পাই না আমরা। তবে মাঝে মাঝে গোরার সংলাপের মধ্যে যেন বিবেকানন্দের উক্তির প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। যেমন, গোরা বলছে সুচরিতাকে ঃ

'ভারতবর্ষের পরিবর্তন ভারতবর্ষের পথেই হওয়া চাই। হঠাৎ ইংরেজি ইতিহাসের পথ ধরলে আগাগোড়া সমস্ত পণ্ড ও নিরর্থক হয়ে যাবে।' (গোরা, পৃ. ৪১৫)

প্রসঙ্গত স্বামী বিবেকানন্দের উক্তি মনে পড়ে যায় আমাদের ঃ

'দেখা যাইতেছে যে, শতবর্ষব্যাপী সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের ফলে সমগ্র দেশে কোনো সুফল হয় নাই। ... আমাদের অধিকাংশ আধুনিক সংস্কার পাশ্চাত্য কার্যপ্রণালীর বিচারশূন্য অনুকরণমাত্র।' (বাণী ও রচনা, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৪)

গোরা যে জন্মসূত্রে আইরিশ, এই পরিকল্পনার মূলে ভগিনী নিবেদিতার প্রভাব থাকতে পারে। 'গোরা' উপন্যাসে পক্ষ-প্রতিপক্ষের যুক্তি-তর্ক-সংলাপের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ভারতেতিহাস-জিজ্ঞাসাই যেন দ্বিধাদ্বন্দ্ব উত্তীর্ণ হয়ে একটি পরিণতি ও মীমাংসার ক্ষেত্রে উপনীত হতে চেয়েছে। গোরা চরিত্রটিকে শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের অন্তরতম ব্যক্তিপুরুষের বহিঃপ্রকাশ বা *alter ego* বলে গ্রহণ করে নিলে আপত্তির কিছু থাকে না।

■ *লেখক করিমগঞ্জ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান, বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক এবং বাংলা সাহিত্যের গবেষক।*

'চোখের বালি' থেকে 'চার অধ্যায়' ঃ শিশু-কিশোরের লীলারঙ্গ

বিশ্বতোষ চৌধুরী

১. জীবনলীলার চালচিত্রে শৈশব-কৈশোরের ছবি

রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে পরিণত বয়স্কদের সমস্যাবহুল জটিল জীবনাবর্তের চিত্র যেমন নানাভাবে ফুটে উঠেছে, তার পাশে অপরিণতবুদ্ধি বালকবালিকা, শিশু-কিশোরদের সূক্ষ্ম-মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণও আমাদের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। আপন শৈশব-কৈশোরের প্রতি সুস্পষ্ট পক্ষপাতই হয়তো তাঁকে সুদীর্ঘ জীবন-পরিক্রমায় বারবার পেছন ফিরে দেখার নেশায় প্রবুদ্ধ করেছে। জীবনের প্রান্তবর্তী লগ্নে এসে বারবার দেখি যে তিনি শৈশব-কৈশোরের আনন্দ-বেদনাময় দিনগুলির কথা ভুলতে পারেননি।

কবিতা ও গল্পের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস এবং নাটকে শিশু-কিশোরের উপস্থিতি অবশ্য অপেক্ষাকৃত অপ্রতুল। কোথাও কোথাও তাদের ভূমিকা কাহিনির মূল সূত্রকে দৃঢ় করেছে। বলাবাহুল্য, রবীন্দ্র উপন্যাসের শিশু-কিশোরেরা সাধারণের নিকট তেমন পরিচিত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ইতিহাস, রোমান্স ও সমাজমনস্ক উপন্যাসগুলিতে শিশু-কিশোরদের প্রবেশের অধিকার দেননি। রবীন্দ্র-পরবর্তী শরৎচন্দ্র বা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়া মানিক, তারাশঙ্কর, সতীনাথ কেউই শিশু-কিশোর বালক-বালিকাকে উল্লেখযোগ্যভাবে তুলে ধরেননি তাঁদের উপন্যাসে। শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ, শ্রীকান্ত আর বিভূতিভূষণের অপু, দুর্গা তো আমাদের বহু পরিচিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধ্রুব, বসন্ত, সতীশ, লীলা, অমূল্য, মতিলাল, সুরমা বা যতিশংকরের সঙ্গে আমাদের তেমন পরিচয় কোথায়?

রবীন্দ্রনাথ কৃত্রিম যন্ত্র সভ্যতার অক্টোপাশ থেকে মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষায় জীবনের নানা বাঁকে শিশুদের জগতে ফিরে গেছেন বারবার। অবগাহন করেছেন শৈশবের রঙিন কল্পনায়। যৌবনে ভাইঝি ভাইপোর সংস্পর্শ, পরবর্তীতে মাতৃহারা পুত্রকন্যাদের সঙ্গদান আর শেষ বয়সে গুটিকতক নাতি-নাতনি নিয়ে তিনি ছিলেন মগ্ন। এর মধ্যে জীবনের শৈশবের দিনগুলি মিলেমিশে যেকোনও জটিল পরিবেশে শিশু-কিশোরের হাত ধরে পৌঁছে গেছেন সমাধানের অন্তিম বিন্দুতে।

রবীন্দ্রনাথের বারোটি উপন্যাসের (করুণা ছাড়া) মধ্যে প্রায় সবগুলিতেই কোনও না কোনওভাবে শিশু কিশোর, বালক-বালিকারা নিঃসংকোচে প্রবেশাধিকারেব ছাড়পত্র পেয়েছে। 'বউ-ঠাকুরাণীর হাট' (১৮৮৩) উপন্যাসে নামহীন একটি শিশুকন্যাকে আমরা অনিবার্যভাবে পেয়ে যাই। যদিও আনুমানিক তিন বছরের এই শিশুকন্যাটি উদয়াদিত্যের সন্তান নয়। সম্রাট প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের কোনও সন্তান ছিল না। উদয়াদিত্যের স্ত্রী সুবমার স্নেহ ও প্রশ্রয়ে প্রতিবেশীর একটি শিশুকন্যা রাজবাড়িতে প্রায়ই যাতায়াত করত। 'সুরমার মৃত্যুর পর ইহার মা ইহাকে আর রাজবাড়িতে পাঠান নাই।'

এবার মূল প্রসঙ্গে আসা যাক।

২. বয়স্কের অরণ্যজটিল হৃদয়ে বাল-রৌদ্ররেখা ঃ

'চোখের বালি' (১৯০৩) থেকেই রবীন্দ্র উপন্যাস তো বটেই, বাংলা উপন্যাসেও যেন এক বিরাট পালাবদল ঘটল। উপন্যাসে 'আঁতের কথা' বের করে আনার সূত্রপাত এই 'চোখের বালি'তেই। উপন্যাসটির প্রধান চরিত্র বিহারী, বিনোদিনী আশা-মহেন্দ্র। প্রধান চারটি চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই উপন্যাসটির মূল উপজীব্য বিষয়।

অবিবাহিত বিহারী, সদ্য বিবাহিত আশা ও মহেন্দ্র এবং বিধবা বিনোদিনীর জটিল জীবনাবর্তে আট বছরের বালক বসন্ত যেন তাদের সমস্ত লুব্ধতা, মত্ততা ও সমূহ সর্বনাশের মধ্যে এক বিন্দু শিশির। কাহিনির ব্যক্তি-চরিত্রের সঙ্গে ব্যক্তির প্রতিটি সংঘাতের মুহূর্তে গৌরসুন্দর বালক বসন্তের ভূমিকা না থাকলেও যখনই আশা-বিহারী, মহেন্দ্র-বিনোদিনী চরম মানসিক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে তখন বালক বসন্তই যেন তাদের সহজ স্বাভাবিক সুন্দর পথের নিশানা দেখিয়েছে। বিহারী বিনোদিনী মহেন্দ্র — এই তিন চরিত্রই ঘটনার নানা প্রতিকূল বাঁকে অর্বাচীন একটি বালকের সম্মুখে কখনও নিজের উত্তেজনা প্রশমিত করেছে, কখনও বা কেউ তাকে আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় হিসাবে অবলম্বন করেছে, আবার কেউ বা তাকে নিয়ে মানসিক আঘাতের গ্লানি থেকে মুক্তি পেয়েছে। অথচ বালক বসন্ত তাদের কারো সঙ্গেই রক্তের বা নাড়ীর সম্পর্কে আবদ্ধ নয়। মুখ্য চরিত্র ত্রয়ের অনাত্মীয় একটি শিশু কিভাবে কামাচার, ঈর্ষা-বিদ্বেষ ও দুর্বৃত্তায়নের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নীরবে সমস্ত কিছু প্রতিহত করেছে তার উজ্জ্বল নিদর্শন এই চরিত্র। চোখের বালির চরম কোলাহলের মধ্যে যেন বালক বসন্ত এক মুখর নৈঃশব্দ্য।[১]

দরিদ্রব্রাহ্মণ রাজেন্দ্র চক্রবর্তীর সন্তান বসন্ত। বিহারীর আশ্রয়ে পালিত সে। মেডিক্যাল কলেজে ফাইন্যাল পরীক্ষার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বিহাবী যখন মেডিক্যাল পড়া ছেড়ে দিল, তখন বিহারী বালক বসন্তের সংস্পর্শে আসে। বসন্তের সান্নিধ্যে বিহারীর মানসিক তুফান তোলা অস্থিরতা হ্রাস পেল। বিহারী বসন্তকে পড়াত, কখনও বা গড়ের মাঠে নিয়ে যেত, এমনকী মিউজিয়ামে নিয়ে গিয়েও শিক্ষাদানের চেষ্টা করত। অতএব বিহারীর চরম-মনোবল ভাঙনের মুখে গভীরভাবে বসন্তের সঙ্গলাভ তাকে যেন সব ব্যর্থতার সাময়িক উপশমে সহায়তা করেছে।

'চোখের বালি'তে বিনোদিনী যেন যৌবনের *'উত্তপ্ত লৌহ কটাহে টগবগ করিয়া ফুটিতেছিল'*। একদিকে সে মহেন্দ্রের সংসারকে তছনছ করে দিয়েছে, অন্যদিকে বিহারীর প্রত্যাখ্যানের গভীর শূন্যতার বেদনা থেকে মুক্তিলাভের একমাত্র বিশ্বস্ত আশ্রয় হিসাবে বেছে নিয়েছে বালক বসন্তকে। যৌবনের অপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিতা, দিশেহারা, 'বিনোদিনী তাহাকে (বসন্তকে) দুই হাতে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ঝরঝর করিয়া কাঁদিতে লাগিল'। বুকের পাথরের ভার সাময়িকভাবে লাঘব করার এমন নিশ্চিন্ত আশ্রয়স্থল আর কী হতে পারে?

তৃতীয় ঘটনা আরও রোমাঞ্চকর। মহেন্দ্রের বাড়ি থেকে বিনোদিনী হঠাৎ পালিয়ে গেল। বিনোদিনীর খোঁজে উন্মত্ত মহেন্দ্র বিহারীর বাড়িতে উপস্থিত হল। সে ভেবেছে নিশ্চয়ই বিহারী বিনোদিনীকে লুকিয়ে রেখেছে। চরম ক্রোধে-ক্ষিপ্ত মহেন্দ্রের পাগলপ্রায় ভয়ঙ্করতার সামনে দাঁড়িয়ে ভয়ে, কুঁকড়ে গিয়ে বসন্ত চিৎকার করে উঠল। শুধু তাই নয়, মহেন্দ্রের অস্বাভাবিক আচরণের যথোচিত জবাব বিহারী সেদিন দিতে পারত, কিন্তু একমাত্র বালক বসন্তের করুণ ভয়ে বিহ্বল দৃষ্টির সামনে বিহারী নিজেকে সংযত রেখেছে। কারণ তা না হলে

হয়তো বা সেদিন বিহারীর অঙ্গন রক্তের বন্যায় ভেসে যেত।

একান্ত অপরিহার্য না হলেও 'চোখের বালি' উপন্যাসে বালক বসন্তই যেন অন্তত বিহারী, মহেন্দ্র ও বিনোদিনীর অন্তর্জগৎকে আমাদের সামনে এক এক করে খুলে দিয়েছে। তাদের 'আঁতের কথা' বের করে আনার চালকশক্তিরূপে যে একটি ক্ষুদ্র তুচ্ছ বালক এমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে, তা একমাত্র রবীন্দ্রনাথের মতো অদ্বিতীয় কথাকোবিদের পক্ষেই সম্ভব।

'চোখের বালি'র বসন্তের তুলনায় পরবর্তী উপন্যাস 'নৌকাডুবি'র (১৯০৬) উমেশের চরিত্র আরও গুরুত্বপূর্ণ, আরও বিস্তৃত। 'চোখের বালি'র মতো 'নৌকাডুবি' নরনারীর জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মী উপন্যাস নয়। রবীন্দ্রনাথ নরনারীর ত্রুটি-বিচ্যুতি, পাপ-পূণ্য, নীতিবোধ ও সংস্কারবোধের অতীত সেই চিরন্তনবোধের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন এই উপন্যাসে। তাছাড়া বালক উমেশ চরিত্রটি উপন্যাসের কাহিনিতে যেখানেই নানা আকস্মিক ঘটনা এসেছে, সেখানেই সেই আকস্মিকতার শূন্যতা পূরণে সমর্থ হয়েছে। এই বিচারে উমেশের ভূমিকা পূর্ববর্তী 'চোখের বালি' উপন্যাসের বালক বসন্তের থেকে অনেক বেশি সক্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। উমেশ অত্যন্ত প্রাণচঞ্চল এবং আশ্চর্যরূপে সজীব চরিত্র। সে কমলার আশ্রিত এক কায়স্থ বালক। যদিও এখানে তার বয়স যে তাকে এই সজীবতা ও সক্রিয়তার প্রধান সহায়ক হয়েছে, একথা উল্লেখ করতেই হয়। বসন্তের বয়স আনুমানিক আট বছর, আর নৌকাডুবির উমেশ যে আনুমানিক চৌদ্দ পনেরো বছরের, একথা আমাদের ভুললে চলবে না।

পশ্চিমের পথে পাড়ি দেবার জন্যে রমেশ যেদিন কমলাকে নিয়ে স্টিমারে রওয়ানা হল, সেই একই স্টিমারে ছিল উমেশ। সে কাশীতে তার মাতামহীর কাছে যাচ্ছিল পালিয়ে 'বিমাতা-শাসিত গৃহের উপেক্ষিত' উমেশ স্টিমারে জলতোলা বাসনমাজা ইত্যাদি কাজে নিযুক্ত হল। উমেশ কমলাকে বলল, *'মা, যদি তোমাদের কাছেই রাখ তবে আমি আর কোথাও যাই না।'* কমলা, রমেশের বিবাহিতস্ত্রী নয় একথা রমেশ জানলেও কমলা জানত না। রমেশকে স্বামী ভেবেই কমলা তার সংসার সাজিয়ে তুলছিল। স্টিমারে সেই *'কায়স্থ অনাথ বালকের মুখে 'মা' সম্বোধন শুনে কমলার 'কোমল হৃদয়ের কোন্ এক গভীর দেশ হইতে জননী সাড়া দিল।'*

রমেশ স্বভাব সংযত এবং নীতিজ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তি-বলেই সবসময় সে কমলার সঙ্গে দূরত্ব রক্ষা করে চলেছে। আর কমলার অপ্রাপ্তিজনিত শূন্যতার বেদনা যেন উমেশের উপস্থিতিতে আংশিক লাঘব হয়েছে। এবং অনাথ বালকের সঙ্গে নানাভাবে কমলার সম্পর্ক গভীর আত্মীয়তার বন্ধনে বাঁধা পড়েছে। এইভাবেই স্টিমারের 'ছলনা বিড়ম্বিত' দিনগুলিতে উমেশই হয়ে উঠেছে কমলার একমাত্র অবলম্বন। মাতৃস্নেহের গভীরতা দিয়ে কমলা উমেশকে সমস্ত প্রকার রোদ-জল-ঝড় থেকে বাঁচিয়ে মমতাঘন স্নেহচ্ছায়ায় লুকিয়ে রেখেছে। উমেশও কমলাকে সশ্রদ্ধ সহানুভূতি জানিয়ে সে যেন কমলার স্নেহঋণ স্বীকার করতে দ্বিধা করেনি। উমেশ নানাভাবে কমলাকে মাতৃজ্ঞানে যত্ন করত, পীড়িতা অশ্রুভারাক্রান্ত দেখলেই সহানুভূতি জানাত আর *'এই গৃহহীন দরিদ্র বালকটার কাছ হইতে একটা যত্নের কথা শুনিবামাত্র কমলা আপনার বুকভরা অশ্রুর ভার' চেপে রাখতে পারত না।'*

উমেশ ছিল চৌর্যপটু ভোজনরসিক বালক। সংসার চালাবার সহজ কৌশলগুলি তার

জানা ছিল। স্টিমার থামলে নদীতীরের গ্রামের কারও চাল, কারও খেত থেকে তরিতরকারি সংগ্রহেই তার এই পরিচয় পাওয়া যায়। পিডিং শাকের 'চচ্চড়ি বড়ো সরেস হয়' — উমেশের এহেন উক্তিই তার ভোজনরসিকতার উজ্জ্বল উদাহরণ।

গাজিপুরের বৃদ্ধ চক্রবর্তীর সঙ্গে উমেশের পরিচয় হল। কমলার স্নেহরাজ্যের এই শরিককে তার ভাল লাগেনি। উমেশের সকালবেলাকার ঝুড়িটি নিয়ে রোজ হৈ চৈ লেগে যেত ; রমেশের মনে হত এ নিশ্চয়ই উমেশ চুরি করেছে। উমেশের কাছে হিসাব চাইলে একবারের হিসাবের সঙ্গে অন্যবারের হিসাব মিলত না। উমেশ বলত, *'আমি যদি হিসাব ঠিক রাখিতে পারিব তবে আমার এমন দৃশ্য হইবে কেন? আমি তো গোমস্তা হইতে পারিতাম, কী বলেন দাদাঠাকুর?'*

রমেশের আপত্তি থাকলেও উমেশ গাজীপুরে কমলা রমেশের সংসারে পুনরায় আশ্রয় পেল। একদিন রমেশের অনুপস্থিতিতে কমলার কাছে পাঁচ টাকা এবং দুজোড়া শাড়ি উপহার পেয়ে যাত্রা দেখতে গেল। কিন্তু সকালে ফিরে এসে কমলাকে আর খুঁজে পেল না। গৃহত্যাগী কমলার গঙ্গায় আত্মবিসর্জনের সম্ভাবনায় উমেশ গঙ্গাতীরে এসে জলের মধ্যে পড়ে পাগলের মতো হাতড়াতে লাগল। মুখ দিয়ে জল ফেলতে ফেলতে বলল, *'আমি উঠিব না, আমি উঠিব না। মা গো, তুমি আমাকে ফেলিয়া যাইতে পারিবে না।'* শ্রান্ত উমেশ তীরের উপর লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল।

এখানেই উমেশের ভূমিকা শেষ হয়ে যায়নি। যে উমেশ তার অসহায়ত্ব, একাকীত্ব কাটিয়ে কমলার স্নেহ ও প্রশ্রয়ে মাথার উপর চাল আর পায়ের নীচে মাটি খুঁজে পেয়েছিল, কমলার আকস্মিক অন্তর্ধানে সেই উমেশ পুনরায় অনাথ, সহায় সম্বলহীন হয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। হঠাৎ একদিন মোগলসরাই স্টেশনে অন্য আরেকজনের পাচিকারূপে কমলাকে দেখতে পেয়ে সেখান থেকে কমলাকে নিয়ে এল এই উমেশ। ইতিমধ্যে কমলা তার সঠিক স্বামী নলিনাক্ষকে দেখেছে, পরিচয় জেনেছে কিন্তু নবীনকালীর দাসীত্বের গন্ডি ছেড়ে বেরিয়ে আসতে পারছে না। উমেশ কমলাকে সেই কাঙ্ক্ষিত মুক্তিই এনে দেয়নি, চক্রবর্তী খুড়োর নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে কমলাকে রেখে, সে চলে গেল ডাক্তার নলিনাক্ষের মা ক্ষেমংকরীর কাছে। লেখক এই বলেই উমেশের ভূমিকার যবনিকা টেনেছেন যে, *'ক্ষেমংকরীর স্নেহ লাভ করিয়া উমেশ এইখানেই রহিয়া গেল।'* শিকড় হারানো উমেশ আবার তার মাথা গোজার ঠাঁই পেল।

নৌকাডুবি উপন্যাসের অল্প কয়েকটি চরিত্রের মধ্যে বালক উমেশ মূল কাহিনির চরিত্র না হয়েও মুখ্যচরিত্র ও কাহিনির দৃঢ় পিনদ্ধ রূপাবয়বে অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রমেশ কমলার মধ্যবর্তী স্থানে যে ছেদ চিহ্নের অবকাশ তৈরি হয়েছিল, উমেশ যেন তা পূরণ করেই ঘটনার গতিতে যেমন ঠিক তেমনি পরিণতিতে, কমলার অন্তর্ধান ও পুনরাবিষ্কারে অত্যন্ত জরুরি ভূমিকা পালন করেছে। কমলার বিবাহিত জীবনে মাতৃসত্তার জাগরণেও উমেশই হয়ে উঠেছে প্রধান সহায়ক শক্তি।[২]

এই উপন্যাসে শুধুমাত্র উমেশই নয়, আরেকটি শিশু চরিত্র পেয়েছি। সে ত্রৈলোক্য চক্রবর্তীর দু'বছরের নাতনি ও শৈলজার মেয়ে উমা। উমেশের মাতৃ সম্বোধনে কমলার যে জননীসত্তা সাড়া দিয়ে উঠেছিল উমাকে দেখে তার সেই সত্তাই পরম স্নেহমমতায় শিশু উমাকে কোলে তুলে নিল। এমনকি শৈলজার রমেশকে নিয়ে হাস্যপরিহাসের সময়ও কমলা যেন এই

শিশুটির সঙ্গে আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে বেঁচেছে। এখানেও কমলার সঙ্গে শৈলজার গভীর অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠলে শিশু উমা উভয়ের মনোযোগ তার নিজের দিকে আকর্ষণ করত। শিশু মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিটি শিশু এভাবেই পরিণত বয়স্কদের চরম ব্যস্ততম মুহূর্তগুলো টেনে তাদের নিজেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চায়। শিশুদের এই স্বভাব বৈশিষ্ট্যকেও রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেননি। তাকে উমার মাধ্যমে শিল্পীত সুষমায় মন্ডিত করেছেন।

কমলা উমাকে আদর করে একজোড়া সোনাব ব্রেসলেট তার ছোট্ট দুই হাতে পরিয়ে দিল। কিন্তু শৈলজা, পরিণত বয়স্কের স্বাভাবিক জটিলতা ও কেজো স্বভাবের জন্যেই এ দান গ্রহণ করতে নারাজ। তাই শৈলজা ব্রেসলেট দুটি কমলাকে ফিরিয়ে দিল। কিন্তু শিশুর মন সহজ, সরল আপন পর ভেদাভেদহীন বলেই তাতে শিশু উমা চীৎকার করে কাঁদতে লাগল। গহনাগুলি না পেলে সে দুধ খেতে চাইত না। এ সমস্ত শিশুর অনাবিল মুক্ত স্বচ্ছন্দবিহারী মনের প্রকাশ। কমলা চলে যাবার পরও দুহাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে উমা বলত 'মাসি গ—গ গেছে।'[৩]

উপন্যাসে উমা বা উমির ভূমিকা মূল কাহিনিতে স্বতন্ত্র মাত্রা বৃদ্ধি করেনি ঠিকই কিন্তু বালিকা বধূ কমলার মাতৃসত্তার সহজ স্বাভাবিক রূপকে প্রকাশ করতে সাহায্য করেছে, সন্দেহ নেই। কারণ উমাকে আদর করে একজোড়া সোনার ব্রেসলেট উপহার দানের মধ্যেই সেই রূপের প্রকাশ ঘটেছে, বললে কি বেশি বলা হবে?

৩. প্রধান সমস্যায় নবীনের সমাধানসূত্র ঃ

রবীন্দ্রনাথের মহাকাব্যধর্মী উপন্যাস গোরা (১৯১০) সুবিশাল পটভূমিকায় রচিত। অসংখ্য চরিত্র, বিস্তৃততব পটভূমিকা, যুগজীবনের দ্বন্দ্ব-সংঘাতে এই উপন্যাস রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি হিসাবে পরিগণিত। কিন্তু মন্ত্রস্বরের এই উপন্যাসেও শিশু কিশোর চরিত্রের সৌন্দর্য ও মাধুর্য-রসে আমরা বিস্ময় বিমুগ্ধ না হয়ে পারি না। গোরার ধ্যানের ভারতবর্ষ ও বাস্তব ভারতবর্ষের মধ্যে সংযোগ স্থাপনের মধ্য দিয়ে নবচেতনার উন্মেষ ঘটানোই ছিল এই উপন্যাস রচনায় লেখকের অন্বিষ্ট। যুগে যুগে কালে কালে নবতর জীবনচেতনার উন্মেষ সাধনে নবীনেরা এই ব্রত উদ্‌যাপন করেছে। তাই উপন্যাসের সেতুবন্ধনে বালক সতীশের উপরই লেখক যেন সেই গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে স্বস্তি পেয়েছেন। আধ্যাত্মিক শূন্যতাবোধের ভেতর দিয়ে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমায়ের বন্দনাগান রচনা করেছেন গোরায়। অন্তর বিকশিত করে অন্তরতর সত্তার উদ্বোধনই এই উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় হয়ে উঠেছে।

ভারতাত্মার অনুসন্ধানী ব্রত স্বাভাবিকভাবেই সুন্দরের প্রতীক শিশু কিশোরকে বাদ দিয়ে হতে পারে না। মুক্ত একক শিশু-কিশোরই তাই এই ব্রত সাধনে লেখকের যথার্থ সহচর হয়ে উঠেছে। গোরা উপন্যাসে আমরা দুটি বালক-বালিকা পাই। একটি সুচরিতার সাত আট বছরের ভাই সতীশ, অন্যটি ললিতার দশ বছরের বোন লীলা।

পিতৃমাতৃহীন সতীশ তার দিদি সুচরিতার সঙ্গে পরেশবাবুর ঘরে আশ্রিত। স্কুল পড়ুয়া বালক সতীশ এত বকবক করত যে, তার দিদি সুচরিতা তাকে নাম দিয়েছিল বক্তিয়ার। খুদে নামধারী ছোট্ট একটি কুকুর ছিল তার। কুকুরটি এক পা তুলে সেলাম করত, মাটিতে মাথা

ঠেকিয়ে প্রণাম করত, একখণ্ড বিস্কুট দেখলে লেজের উপর বসে দু পা জড়ো করে ভিক্ষে চাইত। কেউ বেড়াতে এলে কুকুরটির যত রকম বিদ্যা জানা তা সতীশ দেখিয়ে দিত।

সতীশ ছিল খুব চটপটে। কাহিনির সূচনাতেই সুচরিতার পাঠানো খামটি সে বিশ্বস্ত বাহকের মতো বিনয়ের হাতে তুলে দিয়েছে। বিনয়ের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতেই সতীশ বিনয়ের অত্যন্ত স্নেহ ও আদরের পাত্র হয়ে উঠল। সতীশের সঙ্গে বিনয়ের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে ওঠাতেই পরেশবাবুর বাড়িতে বিনয়ের অবাধ প্রবেশাধিকার সহজ হয়ে যায়। *"এমনি করিয়া সতীশ মাঝখানে থাকাতে অল্প অল্প করিয়া বিনয়ের সংকোচ ভাঙিয়া গেল এবং ক্রমে সুচরিতার সঙ্গে মাঝে মাঝে মুখ তুলিয়া কথা কহাও তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল না।"* 'গোরা'র মত গম্ভীর উপন্যাসে এহেন শিশু কিশোর হয়তো বা তেমন প্রয়োজনীয় নয় কিন্তু ঘটনার নব-নব বাঁকে সতীশের মধ্যবর্তী ভূমিকাকে অবলম্বন করে বিনয়-সুচরিতা এবং বিনয়-ললিতা সম্পর্কের ভিত্তিভূমি রচনায় সতীশ অপ্রয়োজনীয়ও নয়। বরং সতীশের উপস্থিতি স্বতন্ত্র মাত্রাবৃদ্ধি করেছে। কখনও কখনও বালক-বালিকাদের ভূমিকা একান্ত অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

বিনয় ও সতীশ দুই 'অসমবয়সী বন্ধু'। রবীন্দ্র গল্প-উপন্যাস-নাটকে এহেন অসমবয়সী বন্ধুত্বের উদাহরণ রয়েছে অসংখ্য। পরিণত বয়স্কের একাধিক সমস্যা ও সংকটে ছোটরা যেন সমাধান সূত্রের ইঙ্গিতবাহী। সহজ স্বচ্ছন্দ সারল্যে এই ছোটরাই বড়দেরকে মুক্তিপথের নিশানা দেখিয়েছে। তাদের নিজেদের সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে ভরিয়ে তুলেছে চারপাশ।

বিনয়ের সঙ্গে যত সহজে সতীশ মিশে যেতে পেরেছে, সেভাবে পারেনি গোরার সঙ্গে মিশতে। কারণ বিনয় ছোটদের সঙ্গে ছোট হতে জানে। আর গোরা ছিল গম্ভীর প্রকৃতির, তাত্ত্বিক, নীতিবাদী ও হিন্দু ধর্মের ধ্বজাধারী। তাই গোরাকে সতীশের মোটেই পছন্দ নয়, সে কথা অনায়াসে সতীশ বিনয়কে বলে দিয়েছে। বিনয় গোরার বন্ধুত্বকেও সতীশের ভালো লাগত না। কিন্তু পরেশবাবুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে সতীশ বিনয়ের ঘরের মধ্যে ঢুকে গিয়ে বলল, *'আচ্ছা বিনয়বাবু ... কুকুর রাখেননি কেন?'* এই প্রগল্‌ভতায় পরেশবাবু সতীশের বক্তিয়ার নামকরণের অর্থ ব্যাখ্যা করলেন। সতীশ নিজের গৌরবহানির ভয়ে বিনয়কে বলল, *'আচ্ছা বিনয়বাবু, বক্তিয়ার খিলজী তো লড়াই করেছিল?'*

এইভাবে বিনয়কে বাড়িতে বন্দি করে এনে আর্গিন দেখানো, তার অনুচর কুকুরটির নানা কলাকৌশল দেখানো, সার্কাস দেখে ফিরে নিজের বিছানায় শুয়ে থাকতে পীড়াপীড়ি করার মধ্যে শিশুর সারল্য ও অনাবিল মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

বিনয়ও ইংরেজি-কাগজ থেকে সতীশের জন্য ছবি কেটে রাখত। সতীশ একটা একটা করে সেই ছবিগুলি এঁটে দেয়। এইভাবে পাতা-ভরানোর উৎসাহে ভাল বই দেখলেই ছবি কেটে নিতে গিয়ে দিদিদের বকুনিও সতীশকে সহ্য করতে হয়েছে। একদিন ললিতা সতীশকে বলল,'তিনি তোকে এত ছবি দেন, তুই তাঁকে কিছু দিস্‌নে কেন? শহোরে প্রতিদানের অভ্যস্ততায় সতীশের মত বালক কিশোর অনভিজ্ঞ বলেই সে কথা উঠতেই সতীশ শুধু অস্থিরই হয়নি, বিচলিত হয়েছে। তথাপি তার ভাঙা টিনের বাক্‌সটির মধ্যে নিজের বিষয় সম্পত্তি যা কিছু ছিল, তার কোনওটিরই আসক্তি-ত্যাগ করা তার পক্ষে সহজ ছিল না। শেষপর্যন্ত ললিতা সতীশের হাতে দুটো গোলাপ ফুল তুলে দিয়ে তার বন্ধু ঋণ পরিশোধেব ব্যবস্থা করে দিল। কিন্তু বিনয়ের সন্দেহে কৃত্রিমতা ও মিথ্যায় অপটু বালক সতীশ বলল, *'বাঃ, ললিতাদিদি*

আমাকে দিলেন যে আপনাকে দিতে। সুতরাং বিনয় ললিতার সম্পর্কের মধ্যেও বালক সতীশই হয়ে উঠল একমাত্র প্রশ্রয়দূত। সতীশের হাত দিয়ে বিনয়ের কাছে পৌঁছে যাওয়া গোলাপ দুটি ললিতা-বিনয় হৃদয়-সম্পর্কের প্রতীক হয়ে উঠেছে।

শুধু বিনয় নয়, পরেশবাবুর বাড়িতে গোরার আগমন প্রসঙ্গটিতেও বালক সতীশের সক্রিয় ভূমিকা কাজ করেছে। বিনয়ের ঘরে গোরার ছবি দেখে আগ্রহ প্রকাশ এবং গোরাকে তাদের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানিয়েছে সতীশ। তা ছাড়া গোরা সুচরিতাদের বাড়িতে আসার আগেই বিনয়-গোরা সম্পর্কে যে তথ্য পরিবেশন করেছে তাতেই সুচরিতার মনে গোরা ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। বলাবাহুল্য, বিনয়ের পক্ষে গোরার প্রসঙ্গ উত্থাপনের পথ তৈরি করে দিয়েছে সতীশই। যদিও পূর্বেই বলেছি, সতীশ গোরাকে খুব একটা যে পছন্দ করত তা নয়। সুচরিতা, বিনয়-ললিতার সঙ্গে পরেশকাকুর বাড়িতে আসা হরিমোহিনীর ঘনিষ্ট পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্বটুকুও ঔপন্যাসিক বালক সতীশকে দিয়ে পালন করিয়েছেন।

গোরা উপন্যাসে আরেকটি বালিকা চরিত্র রয়েছে। তার নাম লীলা। ব্রাহ্মসমাজের পরেশবাবুর ছোট মেয়ে লীলার বয়স বছর দশেক। দৌড়ঝাঁপ, হৈহট্টগোলে সে ছিল পুরাদস্তুর। সুচরিতার ছোট ভাই সতীশের সঙ্গে লীলার সবসময়ই ঠেলাঠেলি মারামারি চলত। বিশেষত খুদে নামধারী কুকুরটির মালিকানা সত্ত নিয়ে লীলা সতীশের মধ্যে চলত টানাপোড়েন। কুকুরে অভিমত নিলে হয়তো সতীশের প্রতিই পক্ষপাত দেখা যেত কারণ লীলার আদরের অত্যাচার সহ্য করা কুকুরটির পক্ষে সম্ভব ছিল না। লীলার মা বরদাসুন্দরী বাইরের কোনও লোক বেড়াতে এলে নিজের মেয়েদের নানারকম গুণপনার ফর্দ তুলে ধরতেন। বালিকা লীলা প্রথমে খানিকটা হেসে তার পর যন্ত্রের মতো এক নিঃশ্বাসে ইংরেজি কবিতা আবৃত্তি করে সভা গরম করে তুলত। 'কিন্তু বেচারা সতীশ বাড়ির অতিথি অভ্যাগতদের সামনে বিদ্যা ফলাইবার কোনও অবকাশ' পেত না। তাই সতীশের কখনও কখনও পাশের ঘর থেকে চীৎকার করে কিংবা লীলার দূরূহ শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা করে নিজের বিদ্যার গৌরব জাহির করার মধ্যে শিশু মনস্কতা ধরা পড়ে। সাধারণত প্রায় সমবয়স্ক দুটো শিশু কিংবা বালক বালিকা পাশাপাশি থাকলে তুচ্ছ বিষয়েও দুজনের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা এবং নিজের নিজের সামর্থ্যের পরিচয় তুলে ধরার প্রবণতা লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনাথ সতীশ লীলাকে পাশাপাশি রেখে ছোটোদের এই বৈশিষ্ট্যও চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন।

তৃতীয় যে শিশুকন্যাকে আমরা গোরা উপন্যাসে পাই তার নাম শশিমুখী। গোরার দাদা মহিমের দশ বছরের কন্যা এই শশিমুখী। গোরার বন্ধু বিনয়ের সঙ্গে শশিমুখীর যেমন হৃদ্যতা ছিল, তেমনি ছিল উভয়পক্ষেরই পরস্পর খুনসুটি। শশি বিনয়ের জুতো লুকিয়ে রেখে তার কাছ থেকে গল্প আদায় করত। বিনয় শশিমুখীর চাপল্যের দু'একটি ঘটনায় চড়া রঙ লাগিয়ে গল্প বানিয়ে রেখেছিল — সেগুলি বলতে শুরু করলে শশি খুব জব্দ হত। বিনয়কে বিকৃত করে শশিমুখী পাল্টা গল্প বানাতে চেষ্টা করত কিন্তু তাতে সে বিনয়ের সঙ্গে পেরে উঠত না। এমনকি বিনয় বাড়িতে এলেই শশিমুখী সমস্ত কাজ ফেলে গোলমাল করবার জন্য ছুটে আসত। যদিও পরবর্তীকালে বিনয়ের সঙ্গে শশির সম্বন্ধ হলে সে লজ্জায় সংকোচে আত্মগোপন করত।

এই উপন্যাসে সতীশকে যেমন সুচরিতার একান্ত আশ্রয়, বিনয়ের অবলম্বন ললিতার

সহচর এবং লীলার প্রতিযোগী রূপে দেখতে পাই, তেমনি লীলা ও শশিমুখীর চাপল্য, সজীবতা, প্রাণচাঞ্চল্য শিশু কিশোরের বিচিত্র স্বভাব ও বালকোচিত কৌতূহল সমস্যাদীর্ণ নারী পুরুষের জীবনে স্নিগ্ধতায় ভরিয়ে তোলার অবকাশ সৃষ্টি করেছে। লীলা এবং শশিমুখী কাহিনির মূল পাত্রপাত্রীর ঝড় সংক্ষুব্ধ জীবনপ্রবাহে সতীশের মতো সমাধানসূত্র কিংবা সংযোজকের ভূমিকা পালন করেনি ঠিকই, কিন্তু শিশুকিশোরের সৌন্দর্য ও মাধুর্যে যে কাহিনির পাত্রপাত্রীকে তেমনি পাঠককেও অকৃত্রিম আনন্দদান করেছে। বড়দের ভিড়ে তারা অহেতুকের অভিধা পেয়ে হারিয়ে যায়নি। বরং বয়সে বড় হয়েও বড়রা কতটুকু বড় এটাও যেন এই বালকবালিকার দলই বুঝিয়ে দিয়েছে।

চতুর্থ আরেকটি শিশুর উল্লেখ প্রয়োজন, যদিও তার ভূমিকা অপেক্ষাকৃত গৌণ। সে হল চরঘোষ গ্রামের ফরু সর্দারের ছেলে তমিজ। গ্রামে এক নাপিতের স্ত্রীকে সে মাসী ডাকত। সাহেবের সঙ্গে বিরোধে ফরু জেলে বন্দি হলে তমিজ সেই মাসীর আশ্রয় লাভ করে। তাতে তার কোনও দ্বিধা ছিল না। সুতরাং পরম সান্ত্বনা, নির্ভরতা, বিশ্বস্ত বন্ধুত্ব, সাঙ্গীকৃত হয়েও বিযুক্ত থাকা এবং মাধুর্য সৌন্দর্যের প্রতীক হিসাবে এই শিশুরাই বড়দের জটিলতার মাঝখানেও তাই অনায়াসে স্থান করে নিয়েছে।

৪. দুঃখার্দ্র বালিকা, স্নেহার্দ্র বালক ঃ

রচনা বা প্রকাশের কালানুক্রমিক অর্থে 'গোরা'র পরই আসে 'ঘরে-বাইরে'র প্রসঙ্গ। কিন্তু আমরা আলোচনা করব 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসটি নিয়ে। কারণ, 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে কোনও উল্লেখযোগ্য শিশু-কিশোর চরিত্র নেই।[৪] বিধবা মায়ের একমাত্র পুত্র এবং সন্দীপের একনিষ্ঠ ভক্ত যে অমূল্যচরণকে পাই সে বালক নয় মোটেই। কিশোরও নয়, সে যুবক। বয়স তার আঠারো উনিশ। 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে অমূল্য এবং 'চার অধ্যায়' উপন্যাসের অখিল সমবয়স্ক হলেও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। অখিলও ষোলা কিংবা আঠারোর যুবক। অতএব অমূল্য এবং পরবর্তীকালের অখিলের ভূমিকা কী বা কতটুকু, সেই আলোচনায় না গিয়ে আমরা চতুরঙ্গ উপন্যাসে শিশুকিশোরের ভূমিকা কী বা মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ কী হতে পারে সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করতে পারি।

'চতুরঙ্গ' (১৯১৬) উপন্যাসে একটি বালিকা চরিত্র পাই, তার নাম ননিবালা। বিধবা মায়ের সঙ্গে ননিবালা তার মায়ের বাড়িতে ছিল আশ্রিত। সে তার নিজের ক্ষুদ্র জীবনে কী অসহনীয় গঞ্জনা ও বঞ্চনা সহ্য করে চলেছে তা ভাবলে বিস্ময় লাগে। সেই জ্যেঠামশাই ও শচীশের চরিত্রের প্রতিটি ভাঁজ খুলে ধরতে চরম সহায়তা করেছে। ননিবালার বয়সের উল্লেখ না থাকলেও সে যে নেহাতই বালিকামাত্র তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যে সময়কালের এই গল্প সেকালে সাধারণতঃ দশ বারোর মধ্যে সাধারণ ঘরের বালিকাদের বিয়ে হয়ে যেত। তাছাড়া বিধবা মায়ের আশ্রয়হীনা পরান্নপ্রতিপালিতাদের এই বয়সেই বিয়ে হয়ে যেত। সুতরাং ননিবালার মতো মেয়ের আনুমানিক বয়স দশ বারো বলে ধরে নিতেই পারি।

মায়ের মৃত্যুর পর চরিত্রহীন মামাতো ভাইদের ষড়যন্ত্রে ননিবালা গৃহত্যাগিনী হয়। কিন্তু পরিশেষে তার সন্তান সম্ভাবনাকালে সে লাঞ্ছিতা আশ্রয়হীনা হয়ে শচীশের সাহায্যে তার জ্যাঠামশায় জগমোহনবাবুর ঘরে আশ্রয় পায়। সেখানে এসে লজ্জায় দুঃখে সংকুচিত হয়ে মাটিতে বসে আঁচল চাপা দিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ননিবালার স্নিগ্ধ রূপের বর্ণনা

দিয়ে লেখক বলেছেন, *'নিতান্ত কচি মুখ, অল্প বয়স, সে মুখে কলঙ্কের কোনো চিহ্ন পড়ে নাই। ফুলের উপর ধুলা লাগিলেও যেমন তার আন্তরিক শুচিতা দূর হয় না তেমনি শিরীষফুলের মত মেয়েটির ভিতরকার পবিত্রতার লাবণ্য ঘোচে নাই।'*

জীবনে নানা ঘটনার মধ্য দিয়ে তার মার জীবিত থাকা অবস্থাতেই সে নীরবে শুধু লাঞ্ছনাই সহ্য করেছে। পুরুদরের মতো অমানবিক ভয়ংকর পুরুষের কাছেও মুখ গুজে নির্যাতন সহ্য করেছে। বিনিময়ে পেয়েছে দুঃসহ বৈধব্য। তথাপি সে যেন যথার্থ অর্থেই ননিবালা। কোমলতা ও স্নিগ্ধতার প্রতীক সে। তার দু'টি 'কালো চোখের মধ্যে আহত হরিণীর ভয়, তার সমস্ত দেহলতাটির মধ্যে লজ্জার সংকোচ।'

জ্যেঠামশাই-এর স্নেহ ও আদরেই ননিবালার যেন পুনর্জন্ম হল। কারণ মানুষ যে মানুষের কতখানি তা আজকের পূর্বে ননিবালা অনুভব করে নাই, এমনকী মা থাকিতেও না। *"কেননা মা তাকে মেয়ে বলিয়া দেখিত না, বিধবা মেয়ে বলিয়া দেখিত ; সেই সম্বন্ধের পথ যে আশঙ্কার ছোটো ছোটো কাঁটায় ভরা ছিল। কিন্তু জগমোহন সম্পূর্ণ অপরিচিত হইয়াও ননিবালাকে তার সমস্ত ভালোমন্দর আবরণ ভেদ করিয়া এমন পরিপূর্ণরূপে গ্রহণ করিলেন কী করিয়া।"*

কিন্তু জ্যেঠামশায়ের ঘরেও একাধিকবার পুরুষদের আসা যাওয়াতে ননিবালা ভয়ে কাঁপতে থাকত। ভয়ের চমকে বাঁশ পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে একদিন মৃত সন্তান প্রসব করল। পরিশেষে শচীশের ইচ্ছায় সিভিল মতে বিয়ের আয়োজনকালে ননিবালা জ্যেঠামশায়কে গোপনে চিঠি লিখে রেখে আত্মহত্যা করল। পুরোদরের লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য করেও 'তাকে আজ পর্যন্ত ভুলিতে' পারেনি ননিবালা। তাই শচীশের মতো মানুষকে সে ফাঁকি দিতে পারবে না বলেই বেছে নিয়েছিল অন্তিম মৃত্যুকে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে ননিবালার মত চিরকালের আশ্রয়হীনার চিত্তের দৃঢ়তা এবং অকৃত্রিমতাই প্রকাশ পেয়েছে। সে তার জীবনে ঠকে গিয়েও অন্য কাউকে ঠকাতে প্রস্তুত নয়। এখানেই একটি 'শিরীষ ফুলের' মত বালিকা যেমন তার জ্যাঠামশায়কে এবং শচীশকে তেমনি আমাদেরকেও জীবনসাধনার এক চরম শিক্ষাদান করেছে। যদিও আত্মহত্যার মত পলায়নী মনোভাবকে আমরা কোনওভাবেই সমর্থন করতে পারি না। 'শিরীষ ফুল'টি বেঁচে থেকেও যদি ধূসর পাংশুবর্ণ হয়ে যেত, তাতেই বা ক্ষতি কি ছিল।

রবীন্দ্র–উপন্যাসের অন্তিম পর্বে আমরা আরেকটি রচনা পাই,-যেখানে স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতার মধ্যে 'বালগোপালের লীলা' স্বতন্ত্র মাধুর্য দান করেছে। 'যোগাযোগ' (১৯২৯) উপন্যাসের মতিলাল ঘোষাল ওরফে হাবুলর উল্লেখ করা যায়।

মধুসূদন ঘোষালের মেজো ভাই নবীন ঘোষালের ছেলে মতিলাল। বয়স সাত। সবাই তাকে হাবুল বলে ডাকে। *'বড়ো বড়ো কালো চোখ, তেমনি জল-ভরা মেঘের মত সরল শ্যামলা রং, গাল দুটো ফুলো ফুলো, প্রায় ন্যাড়া করে চুল ছাঁটা।'*

'চোখের-বালির' বসন্ত, 'নৌকাডুবি'র উমেশ, এবং গোরা'র সতীশের মত 'যোগাযোগে'র হাবলু বড়দের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, সংকট-বিপদ, ঈর্ষা-বিদ্বেষ অর্থাৎ এক কথায় দৈনন্দিন জটিলতার মধ্যে বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছে। জীবনের নঞর্থক ঘটনায় যখনই কেউ পারাপারের তীর খুঁজে না পেয়ে হতাশা ব্যর্থতার পঙ্ক পল্বলে ডুবে যাচ্ছেন তখনই এইসব

শিশু কিশোরকে অবলম্বন করে তারা শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার কখনও চেষ্টা করেছেন, নতুবা ক্ষণকালের জন্য সমস্ত ভুলে গিয়ে মুক্তির আস্বাদ পেয়েছেন।

এই উপন্যাসের নায়িকা কুমুর শ্বশুরবাড়ির নির্বান্ধব পুরীতে হাবলুই একমাত্র তার পরম ও চরম আশ্রয় হয়ে উঠে। বিয়ের পর কাতর মন নিয়ে কুমু যখন স্বামীগৃহে এলো, তখন সে প্রথম সান্ত্বনা পেল মেজো-জা নিস্তারিনীদেবীর কাছে। তখন ফুলকাটা-জামা-গায়ে জরির পাড় ধুতি পরা হাবলু এসে তার বড়ো বড়ো স্নিগ্ধ কালো চোখে তাকিয়ে বলল, 'জ্যেঠাইমা'। কুমু নাম জিজ্ঞাসা করায় সে তার বংশ পরিচয় দিয়ে বলল,'শ্রী মতিলাল ঘোষাল।' যে কুমু শিক্ষাদীক্ষায় ধনে ও ঐশ্বর্যে তার স্বামী মধুসূদনের থেকে অনেক বেশি সম্ভ্রান্ত, সেই কুমুকে বিবাহিত জীবনে স্বামীঘরে এসেই স্বামীর অকারণ আঘাত সহ্য করতে হচ্ছে নীরবে। শুধু স্বামীই নন, জা শ্যামাসুন্দরীও যখন কুমুকে নানা বাক্যবাণে জর্জরিত করে তুলছিলেন তখন শুধুমাত্র একটি বালকের নরম মিষ্ট কণ্ঠের ডাক শুনে *"কুমুর বুকের ভেতরটা টনটন করছিল। এই ছেলেকে বুকে চেপে ধরে যেন বাঁচল। হঠাৎ কেমন মনে হয় কতদিন ঠাকুরঘরে যে গোপালকে ফুল দিয়ে এসেছে, এই ছেলেটির মধ্যে সে-ই ওর কোলে এসে বসল। ঠিক যে সময়ে ডাকছিল সেই দুঃখের সময়েই এসে ওকে বললে, 'এই যে আমি আছি তোমার সান্ত্বনা।"*

তাছাড়া কুমুর মুখে 'গোপাল' ডাক শুনে বালক হাবলুও কিছুটা অবাক হল, কিন্তু কুমুর সুরও তার এত মিষ্ট লাগল যে আপত্তি করল না। মা নিস্তারিণী তাকে 'বাঁদর' সম্বোধন করায় তার যেন অসম্মান হল, এই ভাব করে নিঃশব্দে মায়ের মুখের দিকে যেভাবে চেয়ে রইল ঠিক সে রকম পরম নিশ্চিন্ততায় জ্যাঠাইমার আঁচল ধরে রাখল ডান হাতে।[৫]

স্বামীর রুগ্ন হৃদয়হীন বাক্যবাণে বিদ্ধ হয়েই কুমু শ্বশুরবাড়িতে প্রথম রাত্রিযাপন করে, কিন্তু পরের দিন কুমুর টিপাইয়ের উপর দেখা গেল এক শিশি লজেন্স। কুমুর বুঝতে অসুবিধা হল না এ কার গোপন ত্যাগের অর্ঘ্য। রবীন্দ্রনাথ এখানে কুমুর এই লজেন্সপ্রাপ্তি প্রসঙ্গে চমৎকার বলেছেন, *'এখানে পাষাণের ফাঁক দিয়েও ফুল ফোটে। বালকের এই লজেন্সের ভাষায় একসঙ্গে ওকে-কাঁদালে হাসালে।'* কুমু আনন্দে হাবলুকে ধরে এনে তাকে কাচের ভেতর রঙিন ফুল দেওয়া একটি কাগজচাপা উপহার দিল। বিস্ময় মিশ্রিত আনন্দে হাঁফাতে হাঁফাতে সে চলে গেল। কিন্তু এতেই কুমু ও মধুসূদনের মধ্যে ঘটল চরম সংঘর্ষ। মধুসূদন হাবলুর হাতে কাগজচাপা দেখে তাকে চোর সন্দেহে তিরস্কারই করলেন না, বেধড়ক প্রহারও করলেন। কিন্তু জ্যাঠার কাছে মার খেয়ে বালক হাবলু কোনওভাবেই জ্যাঠাইমার নাম করেনি। এই ঘটনা নিয়ে কুমু ও তার স্বামীর মধ্যে তর্ক-বিতর্ক একসময় কুমুর নীলার আংটি পর্যন্ত গড়াল, যা কুমুর দাদা বিপ্রদাস তাকে দিয়েছিলেন কিন্তু মধুসূদন সেটিও ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কুমুর নীলার আংটি কেড়ে নেয়াতে এতদিন কুমু মধুসূদনকে কিছুই বলেনি কিন্তু হাবলুকে চোর ভাবাতে কুমু প্রতিবাদী ভূমিকা পালন না-করে পারেনি। অর্থাৎ একটি শিশুকে অবলম্বন করেই বিড়ম্বিত-ভাগ্য নারী আপন অস্তিত্বের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

"একদিন হাবলু পাতলা ছিটের জামা গায়ে দিয়ে সভয়ে এলে কুমুব গলা জড়িয়ে কানে কানে বলল, 'জ্যাঠাইমা, তোমার জন্য কী এনেছি বলো দেখি?' তারপবে পকেট থেকে বাদামি কাগজে মোড়ক দেওয়া এলাচদানা কয়টি দিল। জিজ্ঞাসা করল 'আচ্ছা জ্যাঠাইমা, তুমি জটাইবুড়িকে দেখেছ? ... একতলায় উঠোনের পাশে কয়লার মধ্যে সিঁদুরের কৌটো

লুকিয়ে রেখেছে। সেই সিঁদুর কোথা থেকে এনেছে জান?' কুমু জানালো ভোরবেলাকার মেঘের ভিতর থেকে। কিন্তু হাবলু জানে সাগরপারের দৈত্যপুরীর কথা।"

কুমু ও হাবলুর এই কথোপকথনের মধ্য দিয়ে কুমু যেন ক্ষণকালের জন্যে তার সমস্ত অতৃপ্তিজাত শূন্যতা ভুলে গিয়ে অর্থাৎ 'বৃদ্ধ অশুচিতার কাছ থেকে নবীন নির্মলতার মধ্যে, দূষিত নিঃশ্বাসবাষ্প থেকে ফুলের বাগানের হাওয়ায়' বসে একবুক শ্বাস নিয়ে নিয়েছে। এলাচদানা পাবার বিনিময়ে কুমু তার দেবতার জন্যে রাখা ফুল একটি সিল্কের রুমালে বেঁধে দিল শিশু হাবলুকে। মানুষ আর ঈশ্বর এখানে আর পৃথক হয়ে রইল না। *'দেবতারে যাহা দিতে পারি দিই তাই প্রিয়জনে, প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই তাই দিই দেবতারে'*র তত্ত্ব যেন এখানে রবীন্দ্রনাথ 'বালগোপালের লীলা'র মধ্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। রবীন্দ্রসাহিত্য পাঠকের কাছে এই উদাহরণ সুপরিচিত।

কিন্তু বিপত্তি ঘটল মধুসূদনের আকস্মিক আগমনে। হাবলু কুমু দুই-ই সচকিত। মধুসূদন হাবলুর হাত থেকে রুমালে-বাঁধা ফুল কেড়ে নিলেন। বালগোপালের পূজায় ঘটল ব্যাঘাত—সমস্ত নির্মলতা ছাপিয়ে মধুসূদনের ভয়ঙ্করতা বড় হয়ে দেখা দিল। ভয়ে জবুথবু বালক হাবলু এহেন রূঢ়তার সঙ্গে অপরিচিত ছিল বলেই ঘর থেকে পালিয়ে দিল এক দৌড়। ক্ষুদ্র কয়টি ফুল ও এলাচদানা নিয়ে মধুসূদন যে কাণ্ড ঘটালো তাতে তার চরিত্রের যেমন নীচতা প্রকাশ পেয়েছে তেমনি কুমুর মনও তার প্রতি অশ্রদ্ধায় ভরে গিয়েছে। দিনেদিনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যে ব্যবধান তৈরি হচ্ছিল তা-ই আরও প্রসারিত হতে লাগল।[৩]

শিশু-কিশোরদের বিস্ময়ের অন্ত নেই। এ পৃথিবীর ফুল-হাওয়া-জল যেমন প্রতিনিয়ত তাদের আকর্ষণ করে, তেমনি শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ধ্বনি, সুর ও মাধুর্য তাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে খেলে যায় বিদ্যুৎদীপ্তি। তাই একদিন রাতে কুমু তার এসরাজে যখন আলাপ শুরু করল তখন বালক হাবলু আর তার বিছানায় স্থির থাকতে পারল না। তাই একা একা জ্যেঠাইমার দরজার সামনে এসে পুতুলের মতো স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। প্রথম থেকেই জ্যেঠাইমাকে সে আশ্চর্য বলেই জানত —কিন্তু সেদিন অন্তবিহীন বিস্ময় তাকে গ্রাস করল। জ্যেঠামশাইকে সে বাঘের থেকেও বেশি ভয় করে বলেই জ্যাঠামশাই মধুসূদন বাইরে যেতেই সে জ্যেঠাইমার গলা জড়িয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ... *'কেমন করে বাজাতে পারলে জ্যাঠাইমা? ... আমাকে শিখিয়ে দেবে?'* হাবলুর মুগ্ধতা ভরা স্বীকৃতি পেয়ে কুমুর অন্তরাত্মা স্নিগ্ধতা ও পূর্ণতায় ভরে গেল। এইভাবে প্রতিটি ঘটনায় হাবলুই কুমুকে চরম শূন্যতার মধ্যেও পূর্ণতায় ভরিয়ে তুলেছে। সাত সাগর পারের দৈত্যপুরীর গল্প করেছে তারা ; কল্পনার রঙিন স্বর্গালোকে মুহূর্তের তরে বিহার করেছে একটি অপাপবিদ্ধ শিশু, অন্যজন সাংসারিক অপূর্ণতায় ক্ষতবিক্ষত বিড়ম্বিতভাগ্য নারী। হাবলু যেমন কুমুর আত্মার আত্মীয় কিংবা সঞ্জীবনী সুধা। দাদা বিপ্রদাসের সুতীক্ষ্ণ জীবনদর্শন ও ঋজু ব্যক্তিত্ব থেকে কুমু যেন গভীর আত্মিক চেতনা লাভ করেছিল। আর সেই চেতনাভূমিতে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে বালগোপালের মধুর লীলা। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থাকলেও মধুসূদন এই জীবনবোধ থেকে শত কোটি দূরতর পথের যাত্রী। তাই তা স্পর্শ করা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। এখানেই কুমু ও মধুসূদনের সম্পর্কের সংকটবীজ ছিল রোপিত।

উপন্যাসের শেষ পর্বে বালক হাবলুর সঙ্গে আমাদের আবার সাক্ষাৎ ঘটে। কুমুর দাদার বাড়িতে সে কুমুকে দেখতে এসেছিল। না, এবার সে তার জ্যেঠাইমার জন্যে এলাচদানা

বা এক শিশি লজেন্স আনেনি। এনেছে শুধু দু চোখ ভরা জল। কিন্তু এতে কুমু সমস্ত শব্দ, ভাষা খুঁজে পেয়েছে। কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে গিয়ে বলেছে,

"কঠিন সংসার গোপাল, কান্নার অন্ত নেই। কী আছে আমার, কী দিতে পারি যাতে মানুষের ছেলের কান্না কমে ; কান্না দিয়ে কান্না মেটাতে চাই, তার বেশি শক্তি নেই।"

কুমুর জীবনে বালক হাবলুর যে কার্যকর ভূমিকা রয়েছে, সেভাবেই যেন একটি অনাগত শিশুর আগমন ধ্বনি কুমু-মধুসূদনের ভাঙা সংসারের সংযোজক শক্তির প্রতীক হয়ে উঠল। ভৈরবী রাগিণীর কারুণ্যের মধ্যে নবাগন্তুক বসন্ত-এর আলাপ ; আলাপ থেকে বিস্তার ঘটালো। কুমুর অন্তর বাহিরের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, দুঃখ-সুখ, মান-অপমান ও নৈরাশ্য-বেদনাকে প্লাবিত করে নিয়ে চলল এক অসীম পরিপূর্ণতার দিকে।[৭]

প্রকৃতপক্ষে 'সমস্যা কন্টকিত নরনারীর জীবনে অপাপবিদ্ধ বালকের ভূমিকা যে কত গুরুত্বপূর্ণ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের শিশু কিশোর চরিত্রগুলি অনুধাবন করলেই সেটি বোঝা যাবে। সমাজ সংসারের অঙ্কুশাহত কেন্দ্রচ্যুত মানুষের সান্ত্বনায়, অবলম্বনে বালকের এই মাধুর্যময় অস্তিত্বের রহস্যটি রবীন্দ্রনাথ ছাড়া এমন করে আর কেউ অনুভব করেননি। তাই জগৎ পারাবারের তীরে ক্রীড়ামুগ্ধ শিশু ভোলানাথের দল বর্ষীয়ান মানুষগুলির পাশে সগৌরবে রবীন্দ্রসাহিত্যে আপন অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।[৮]

৫. সন্তানহীনতার ট্র্যাজেডি ঃ

যোগাযোগ উপন্যাসের সমসাময়িক কালেই রচিত হয় 'শেষের কবিতা' (১৯২৯)। এই উপন্যাসের যতিশঙ্কর বালক বা কিশোর নয়। সে যুবক। কলেজের ছাত্র। বয়স তার বিশের কোঠায়। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র লাবণ্য শিলং থাকাকালীন সময়ে লাবণ্যের মাধ্যমে নায়ক অমিতের সঙ্গে যতির পরিচয়। যদিও সে থাকত কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজের মেসে। কলকাতায় যতি অমিতের কাছে ইংরেজি পড়ার ব্যবস্থা করে। যোগমায়া দেবীর মেয়ে সুরমাকে পড়াত লাবণ্য। যতিশঙ্কর সুরমার ভাই। সুরমা এবং যতিশঙ্কর দুই-ই শিশু বা কিশোর নয় বলেই 'শেষের কবিতা' উপন্যাসটিকে আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা গেল না। তা ছাড়া এই উপন্যাসের কোথাও শিশু-কিশোরের কোনও ভূমিকা নেই।

অনুরূপভাবে একই সময়কালে রচিত পরবর্তী দুটি উপন্যাস, 'দুই বোন' (১৯৩৩) ও 'মালঞ্চ' (১৯৩৩)-তেও শিশু-কিশোর চরিত্রের উপস্থিতি বা ভূমিকা নেই। তবে সন্তানহীনতার দুর্ভাগ্য দুটি উপন্যাসেরই বিষয়গত পটভূমিকা তৈরি করেছে। নিঃসন্তান বলেই 'দুই বোন' উপন্যাসের নায়িকা শর্মিলার জীবনে ঘনিয়ে এসেছিল গভীর ট্র্যাজেডি। আর 'মালঞ্চে'র নীরজা দীর্ঘ অপেক্ষার পর মৃতসন্তান প্রসব করে 'স্বল্প রক্ত দেহ ক্লান্ত হয়ে রইল পড়ে।' দুটি উপন্যাসই পারিবারিক সমস্যাকেন্দ্রিক। এবং এই সমস্যার কেন্দ্রভূমিতে রয়েছে শিশুই, যে-শিশু বাস্তবে অনাগত রয়ে গেল।

'দুই বোন'-এর শর্মিলার 'সন্তান হয়নি, হবার আশাও বোধকরি ছেড়েছে।' ফলে শশাঙ্কমৌলীর স্ত্রী শর্মিলার সমস্ত মনোযোগ গিয়ে পড়ল তার স্বামীর উপরই। কিন্তু স্ত্রীর অত্যধিক স্নেহ ও আদর-যত্নের চাপে অতিষ্ট হয়ে উঠলেন শশাঙ্ক। অর্থাৎ শিশু সন্তানের অনুপস্থিতির জন্যেই শশাঙ্ক শর্মিলার দাম্পত্য জীবনে সৃষ্টি হল এমন এক ব্যবধান, যেখানে অনায়াসে জায়গা করে নিল শর্মিলারই ছোট বোন ঊর্মিমালা। অতএব অপ্রত্যক্ষ হলেও শিশুর ভূমিকা

এখানে নেহাৎ গৌণ নয়।

'মালঞ্চ' উপন্যাসে দেখতে পাই, আদিত্য ও নীরজার পারিবারিক জীবন নিরবচ্ছিন্ন সুখে-সমৃদ্ধিতে ছিল পরিপূর্ণ। সুদীর্ঘ দশ বছর তাদের কোনও সন্তান হয়নি বলে কোনও বেদনা বা দুঃখ ছিল না তাদের। আদিত্য-নীরজার আশ্রিত গণেশের শিশুপুত্রকে অবলম্বন করেই নীরজার বাৎসল্যরস প্লাবিত হয়েছে। যদিও এই শিশুর কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা লক্ষ করা যায় না। শুধুমাত্র নীরজার মাতৃসত্তা জাগরিত হয়েছে কিংবা বলা যেতে পারে, আপাত-পূর্ণতা লাভ করেছে। কিন্তু বিপত্তি দেখা গেল তখনই যখন শশাঙ্কের ঔরসজাত ও নীরজার গর্ভজাত সন্তানকে অস্ত্রোপচার করে নীরজাকে বাঁচানো গেলেও শিশুটিকে ধরে রাখা গেল না। এহেন দুর্ভাগ্যেই নীরজা চিরদিনের জন্যেই যেন বেঁচে থেকেও মরে গেল। সোজা হয়ে আর দাঁড়াতে পারল না।

অতএব পরপর দুটি উপন্যাসেই শিশু অপ্রত্যক্ষ অথচ প্রত্যক্ষতারও সীমা অতিক্রম করে কাহিনিতে অন্যান্য উপন্যাস থেকে সম্পূর্ণ নতুনতর মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। শিশুর উপস্থিতি বড়দের কেজো মানসিকতা ও জটিলতাকে যেমন অনেকাংশে সহজ স্বাভাবিকতায় পৌঁছে দেয়, ঠিক তেমনি তার অনুপস্থিতিও সাংসারিক সামাজিক পরিমণ্ডলে যে জটিলতা বা অশান্তি সৃষ্টি করতে পারে তারই নিদর্শন পাই এই দুটি উপন্যাসে।

রবীন্দ্রনাথের শেষ উপন্যাস 'চার অধ্যায়' (১৯৩৪) সম্পর্কে পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এতে শিশু-কিশোর চরিত্রের কোনও ভূমিকা নেই। রাজনৈতিক পটভূমিকায় রচিত এই উপন্যাসের নায়িকা এলার জীবনে এসেছিল অন্তু। কিন্তু এলা-অন্তুর পারিবারিক জীবন গড়ে উঠেনি। তাদের দুজনের আলাপ আলোচনার মধ্যেই অনিবার্যভাবে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে অখিল। লেখক নিজেই অখিল সম্পর্কে বলেছেন,

'ছেলেটার বয়স ষোলো কিংবা আঠারো হবে। জেদালো দুষ্টুমিভরা প্রিয়দর্শন চেহারা। কোঁকড়া চুল, ঝাঁকড়া-মাকড়া, কচি শ্যামলা রঙ, চঞ্চল চোখদুটো জ্বলজ্বল করছে।'

অতএব 'ষোলো কিংবা আঠারো'র কোনও ছেলে কিশোর বা বালক নয়। কৈশোর উত্তীর্ণ যৌবনে সে পা দিয়েছে। সুতরাং অখিলকে আমাদের আলোচনাকক্ষের বাইরে বসিয়ে রাখতে হল। কারণ একইভাবে অমূল্য, যতিশঙ্কর, অখিল, সুরমা রবীন্দ্র-উপন্যাসের শিশু-কিশোর চরিত্র উপন্যাসে শিশু-কিশোর, বালক-বালিকার কোনও ভূমিকা নেই।[৯]

কিন্তু 'বৌঠাকুরানীর-হাট', 'রাজর্ষি', 'চোখের বালি', 'নৌকাডুবি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' ও 'যোগাযোগ' উপন্যাসে যাদের পেয়েছি তারা এত সজীব এবং সক্রিয় যে ভাবলে অবাক হতে হয়। এই সমস্ত উপন্যাসে শিশু-কিশোরেরা আপন স্নিগ্ধতা ও মাধুর্য দিয়ে কী অনায়াসে বড়দের সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক ও আত্মিক বিপর্যয়কে সমাধান করে দিয়েছে। তারা নীরবে যেন বলে গেছে ঃ

আমাদের ভয় কাহারে
বুড়ো বুড়ো চোর ডাকাতে কি আমাদের করতে পারে (ফাল্গুনী)

কিন্তু যেখানেই তারা অনুপস্থিত সেখানেই অসীম শূন্যতা, যে শূন্যতায় নীলাভ সৌন্দর্য নেই, আছে গভীর বেদনা ও জটিল ঈর্ষা। তার এরকমই দুটি উপন্যাস 'দুই বোন' ও 'মালঞ্চ' আমরা আংশিক আলোচনা করেছি। আসলে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু বালগোপালের লীলা প্রত্যক্ষ

করাতে মগ্ন ছিলেন। শিশুর দৃষ্টি দিয়েই মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখতে চেয়েছেন জল স্থল অন্তরীক্ষের প্রাণীজগত ও মনুষ্যজগতকে। তাই শিশু-কিশোর, বালক-বালিকাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টি হয়নি তাঁর কাব্য, গল্প, উপন্যাস, সঙ্গীত, নাটক কিছুই।

রবীন্দ্র উপন্যাসের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রেখে বুদ্ধদেব বসুর অভিমতকে সমর্থন করে পরিশেষে আমরাও বলতে চাই —

"বাংলা উপন্যাসের যে সৌধ আজ উঠেছে, সেখানে বঙ্কিম বাস্তুদেবতা হলেও রবীন্দ্রনাথই প্রথম স্থপতি, আর — যেহেতু তিনি ঘরে-বাইরে লিখেছেন, শেষের কবিতা লিখেছেন— পরবর্তীরও যাত্রাস্থল ;— এর পর যাঁরা বাড়াবেন, বদলাবেন, নতুন-নতুন মহল বানাবেন, তেতলার উপর চারতলা-পাঁচতলা তুলবেন, রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠ না-নিলে তাঁদের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হবে না। রুচির গুরু তিনি, রূপায়ণের ভাষাশিল্পের ; যেখানে তিনি নিজের জমিতে দাঁড়িয়ে আছেন সেখানে তিনি অবশ্যমান্য, আর যেখানে তাঁর ভুলে হয়েছিল, সেখানেও উত্তরকালের শিক্ষার ক্ষেত্র পড়ে আছে।"[১০]

সূত্র নির্দেশ ঃ

১. *"...এই উপন্যাসের তিনটি প্রধান চরিত্র বিহারী, বিনোদিনী ও মহেন্দ্র এই বালকের সংস্পর্শে এসে সামান্য সময়ের জন্য তাদের অন্তর্জগতকে মেলে ধরেছে। বালককে বুকে করে বিনোদিনী তার অবরুদ্ধ ক্রন্দনকে মুক্তি দিয়েছে। বিহারী এই সংসারের জটিলতার আবর্ত থেকে মুক্তি পেতে বালকটিকে নিয়ে মগ্ন থাকতে চেয়েছে আর মহেন্দ্র নামক মানুষটির আড়ালে নখদন্তপূর্ণ যে পশুটি ছিল তা মুহূর্তের জন্য ভয়ঙ্করভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই বালকটির সম্মুখে।"* (রবীন্দ্র-চেতনায় শৈশব, রেখা রায়চৌধুরী, পৃ. ১৫৩)

২. কিশোর উমেশ চরিত্র সৃষ্টিতে ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ যে স্বাভাবিকতার পরিচয় দিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে সমালোচক ড০ ধীরেন্দ্র দেবনাথ লিখেছেন—

"কিশোর-চিত্ত অধিকমাত্রায় স্পর্শকাতর; সামান্য সহানুভূতি ও ভালবাসায় সে গলে যায়। প্রতিদানে সেও নানা বিচিত্র পথে কৃতজ্ঞতা ও ভালবাসা প্রকাশের সুযোগ খোঁজে। কমলার স্নেহে মাতৃহীন বালক উমেশ যখন নিশ্চিন্ত আশ্রয় পেয়েছে তখন থেকে কমলাকে খুশি করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। ... বয়স্ক ব্যক্তিদের জীবনের সমস্যা বালকের অনুভবগম্য নয়, তাদের দুঃখে সান্ত্বনার ভাষা তার অজানা। কমলার বেদনার কারণ উমেশ বোঝে না। কিন্তু মনে মনে সে কষ্ট বোধ করে। একটি অদ্ভুত অসংলগ্ন সংলাপে তার সমবেদনার্দ্র হৃদয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়— 'মা, তুমি যে সেই টাকাটি দিয়েছিলে, তার থেকে সাত আনা বাঁচিয়াছে।' কিশোর-চিত্তের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ কত নির্ভুলভাবে প্রবেশ করেছেন। অন্য সময়ে যে চুরির কথা সে স্বীকারই করে না, এই মুহূর্তে স্বেচ্ছায় সেই চুরি-করা পয়সা ফেরত দিয়ে কমলাকে খুশি করার চেষ্টা উমেশের যোগ্য চিত্রাই বটে।" (ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ, ১৩৮৪, পৃ. ১৫২-৫৩)

৩. *"আমরা দেখেছি, প্রীতিই শিশুর জীবনে একমাত্র উপজীব্য এবং এই প্রীতির বিকাশ তা দেওয়ার প্রবণতায়—এইভাবে ঘটে তার সামাজিকতা। আর, এই প্রীতির বিস্তৃতির প্রাথমিক শর্ত নিহিত তার অহংবোধের তৃপ্তিতে। শিশুর পরিপার্শ্বের মধ্যে যদি প্রীতির আবহাওয়া বিদ্যমান থাকে, বিশেষত তার পিতামাতার মধ্যে তবে সহজেই সে অন্যের প্রতিও আকৃষ্ট*

হয়। সে থাকে তার চির অবসরের খেলার জগতে— অভিনব ও বিস্ময়জনক কোনো-কিছুর মধ্যে যদি স্নেহ ও অহংতৃপ্তির উপাদান থাকে, তবে সে সহজেই আসক্ত হয়। প্রীতির অভাব না-থাকা সত্ত্বেও পরিবারের সংকীর্ণ পরিবেশে প্রায়শই সংকুচিত থাকে তার ব্যক্তিত্বে অধিষ্টিত হয়।" (রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী, ৫ম খন্ড, গোপীমোহন সিংহ রায়, পৃ. ১১২)

এই প্রসঙ্গে আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদের মন্তব্যও উল্লেখযোগ্য ঃ

'... the quality of the parental care which a child receives in his earliest years is of vital importance for his future mental health ....

Complete deprivation .... has been more far-reaching effects on character development and may entirely criple the capacity to make relationship with other people.' (Child care and the growth of love, John bowlby, page 11-12)

৪. অমূল্য ছাড়াও নরেনের কথাও গোপীমোহন সিংহ রায় উল্লেখ করেছেন কিন্তু এদের দুজনকেই শিশুকিশোরে আলোচনায় আমরা টেনে আনিনি।

"ঘরে-বাইরে উপন্যাসের নিখিলেশের আশ্রিত এক আত্মীয়— বালক নরেন। স্বদেশীর উৎসাহে তার স্নানাহার ছিল না। বিমলার বিদেশিনী শিক্ষয়িত্রী মিস্ গিলবিকে ঢিল ছুড়ে অপমান করতেও তার বাধে না।" (রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী, ৫ম খন্ড, গোপীমোহন সিংহ রায়, পৃ. ১৬৭)

৫. এই ধরনের আরও শিশুর উদাহরণ পাই রবীন্দ্র সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। যেমন নৌকাডুবির উমি, গোরার সতীশ, পলাতকা কাব্যের ভোলা। শিশু ও সমাজ পর্বে আশ্রিতের স্নেহাসক্তি প্রসঙ্গে গোপীমোহন সিংহ রায় বলেছেন ঃ

"এই শিশুচরিত্রগুলিতে ...' পারিবারিক অবরোধের মধ্যে নবাগত কারো প্রীতির স্পর্শে পরিবেশের দীনতা থেকে বেরিয়ে এসে ব্যক্তিত্বের জাগরণ, শিশুসুলভ লুব্ধতা, প্রগলভতা ও চঞ্চলতা, সরলতা ও অহংমন্যতায় বিচিত্র বর্ণদ্যুতি বিচ্ছুরিত। লক্ষণীয় ঃ এই চরিত্রগুলি প্রত্যক্ষভাবে পারিবারিক স্নেহ বঞ্চিত নয়। মোটামুটিভাবে প্রীতির পরিবেশে পালিত বলেই তাদের সামাজিকতার বিকাশ সম্ভব হয়েছে।" (রবীন্দ্র সাহিত্যের নরনারী, ৫ম খন্ড, পৃ. ১৪৩)

৬. *"সমগ্র উপন্যাসের মধ্যে ছোট হাবলুর অল্প কিছুক্ষণের জন্য উপস্থিতি মধুসূদনের কাছ থেকে কুমুর মনকে যেন আরও দূরে সরিয়ে নিল। তবে একথা সত্য যে একটি সন্তান-শিশুই মধুসূদন ও কুমুর মধ্যে আবার পারিবারিক যোগাযোগ করে দিয়েছে।"* (রবীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য ও শিশুচরিত্র, ইতিমা দত্ত, পৃ. ১৮৩)

৭. এই হাবলু চরিত্রটি সম্পর্কে খুবই সংক্ষেপে কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যায়ন করেছেন তরুণ সমালোচক ড০ অমরেশ দাশ —

" অনেক বেশি উজ্জ্বল ও প্রাণময় — শ্রী মতিলাল ঘোষাল, কুমুদিনী ডাকত গোপাল বলে। সে না থাকলে নিঃসঙ্গ ও অন্তর্মুখীন কুমুর অবস্থা হত আরও সঙ্গিন। এমনকি, কিছুটা অসম্পূর্ণও থেকে যেত তার প্রকাশ। মধুসূদনের দূর্গে এক টুকরো সবুজ মাঠের মতো মনে হয় তাকে; কুমুর হাঁপিয়ে ওঠা মন তার মধ্যে ছাড়া পেয়েছে যখন, তখন আমরা বুঝতে পেরেছি যে, এই আশ্চর্য মেয়েটি শুধু কাঁদে না, হাসতেও জানে— হাসতে চায়।"(রবীন্দ্রনাথের

উপন্যাস ঃ নব মূল্যায়ন, ১৩৯০, পৃ. ১১৯)

৮. রবীন্দ্র উপন্যাসের প্রাসঙ্গিক জিজ্ঞাসা, স্মরণ আচার্য, পৃ. ৪০

৯. 'প্রাক্তেন ষোড়শবর্ষে ...'র কথা মনে রেখে আমরা ১৫ পর্যন্ত বালক-বালিকাকেই শিশু কিশোর আলোচনায়, অন্তর্ভুক্ত করেছি। কিন্তু এ প্রসঙ্গে ভিন্নতর অভিমত পাই। যেমন,

"শিশু বলতে আমি শুধু অপোগণ্ডদের বুঝি না। বিলিতী নিয়মে নাবালক মাত্রেই আইনের চোখে ইনফ্যান্ট অর্থাৎ শিশু। আঠারো কি একুশ বছর বয়স পর্যন্ত তাদের অপরের ইচ্ছাধীন হয়ে থাকতে হয়।" (রবীন্দ্রনাথের শিশুচরিত্র, লীলা মজুমদার, পৃ. ৫১, 'রবীন্দ্র প্রসঙ্গ')

আরেকটি প্রবন্ধে লেখিকা বলেছেন ঃ

"১৬ বছর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের পাঠ্যকে আমরা শিশু-সাহিত্যের মধ্যে ধরেছি।" (রবীন্দ্রনাথের শিশু সাহিত্য—লীলা মজুমদার ঃ পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৩৯৬, পৃ. ৯৯২)

১০. রবীন্দ্রনাথ ঃ কথাসাহিত্য, বুদ্ধদেব বসু, পৃ. ১৮

■ *লেখক শিলচর গুরুচরণ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও রবীন্দ্র-গবেষক।*

শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব) ঃ
অমীমাংসিত সমান্তরাল মূল্যবোধের সূচনা

সর্বাণী রায়চৌধুরী

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিতে জোয়ার যেমন সমাজের গতি পাল্টে দিয়েছিল তেমনি পাল্টে দিয়েছিল সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিও। যে যুগান্তকারী বিপ্লবের সংকেত এসেছিল বাংলা সাহিত্যে তার একদিকে যেমন ছিল বাংলা কাব্যসাহিত্য, নাট্যসাহিত্য অপর প্রান্তে দৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল বাংলা উপন্যাস। বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তার প্রারম্ভ। আয়েষা, তিলোত্তমা ও জগৎসিংহকে কেন্দ্র করে যে ইতিহাসাশ্রয়ী রোমান্টিক উপন্যাস গড়ে উঠেছিল তারই পরিণতরূপ 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস। যেখানে বঙ্কিম সচেতনভাবে কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে পরীক্ষা করেছেন। মন সমীক্ষণের যে রীতির প্রয়োগ পাশ্চাত্য সাহিত্যে ঘটেছিল তার আভাস পাওয়া যাচ্ছিল দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে, তারই পরিণতরূপ 'বিষবৃক্ষ' ও পরবর্তীকালে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাস। উপন্যাসের ফর্ম নিয়েও পরীক্ষা করেছেন বঙ্কিম, ডায়েরিধর্মী উপন্যাসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'রজনী' উপন্যাস। তারই আরও পরিণত রূপ আমরা পেয়েছি রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ', 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসে। যেখানে নায়ক বা নায়িকার মনের গভীর থেকে গভীরতর অন্ধকার প্রদেশে আলো নিক্ষেপের প্রচেষ্টা করেছেন বঙ্কিম বা আরও গভীরভাবে রবীন্দ্রনাথ। ডায়েরিধর্মী উপন্যাসে চরম উৎকর্ষ লাভ করার সম্ভাবনা থাকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে। যেখানে উত্তম পুরুষের জবানীতে ঔপন্যাসিক অবচেতনের অবরুদ্ধ দ্বার মুক্ত করে দেন। মন সমীক্ষণের যে রীতি সার্থক ভাবে প্রয়োগ করতে পেরেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসে, সে ধারাতেই এসেছে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত উপন্যাস। যে উপন্যাসে উত্তম পুরুষের জবানীতে শ্রীকান্ত উপন্যাসের প্রারম্ভ। শরৎচন্দ্রের বিচিত্র অভিজ্ঞতাপূর্ণ জীবনের প্রচ্ছায়া দেখা যায় শ্রীকান্ত উপন্যাসে। যদিও 'চতুরঙ্গ' উপান্যাসের সঙ্গে এই উপন্যাসের বিশ্লেষণ পদ্ধতির দূরত্ব অনেক, আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসে যে মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ, অবচেতনের গভীর স্তর থেকে উঠে আসা দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ, কাল এবং চেতনার গ্রহণ বর্জনের যন্ত্রণা, আত্মিক বিশ্লেষণ, সর্বোপরি সময়ের চলমানতার সঙ্গে নিজেকে ভাঙচুর করে নিজের 'হয়ে ওঠা' তার সবটাই অনুপস্থিত এই উপন্যাসে। তবু প্রগাঢ় সম্ভাবনাময় এই চরিত্রগুলোকে শরৎচন্দ্র তুলে ধরেছেন তাঁর সাবলীল গল্প বলার পদ্ধতির মাধ্যমে। কিন্তু চরিত্রগুলোর অন্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করার চেষ্টা করেননি। চরিত্রগুলোর বিশ্লেষণ আছে কিন্তু তা সচেতনভাবে ক্রিয়াশীল মনের উপরের স্তরের। মনোস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কোনও প্রয়োজন লেখক এখানে বোধ করেননি।

শরৎচন্দ্রের ঔপন্যাসিক সত্তার মধ্যে যে পিছুটান দেখা যায় তা যেন অনেকটা প্রতীকীভাবে উঠে এসেছে ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের চরিত্রগত পার্থক্যের মধ্য দিয়ে। শ্রীকান্ত চরিত্রের অপূর্ণতাকে সম্পূর্ণতা দিতে চেয়েছেন ঔপন্যাসিক ইন্দ্রনাথ চরিত্রের মধ্যে। অর্থাৎ তা যেন অনেকটা কল্পনার ইচ্ছাপূর্তির মতো ব্যাপার, শ্রীকান্তের চরিত্রে যা কিছুর অভাব ছিল তাই যেন ঢেলে দিয়েছেন ইন্দ্রনাথ চরিত্রে। ইন্দ্রনাথের আবির্ভাব উপন্যাসের বয়ানে প্রকাশ পেয়েছে এইভাবে,

যে-'ফুটবল ম্যাচ'-কে কেন্দ্র করে মারামারির উপক্রম হয়েছিল সেখান থেকে শ্রীকান্তকে বের করে নিয়ে এসেছিল ইন্দ্রনাথ। বিস্মিত শ্রীকান্তকে অভয় দিয়ে বলেছিল, *"ভয় কি! ঠিক আমার পিছনে পিছনে বেরিয়ে এস।"*[১] এই সংলাপের মধ্যে যেন দ্বিবাচনিকভাবে উঠে এসেছে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের জনপ্রিয়তার অদৃশ্য কারণ। শ্রীকান্ত এভাবেই ইন্দ্রনাথের পিছন পিছন সামাজিক অচলায়তন থেকে মুক্তি চেয়েছে, কিন্তু মানসিক অচলায়তনের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে পারেনি। অর্থাৎ শ্রীকান্তের মতো শরৎচন্দ্রও তাঁর উপন্যাসে সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন, তার ছাপ তাঁর প্রতিটি উপন্যাসেই। কিন্তু প্রায় কোনও উপন্যাসেই তিনি সমাজ শৃঙ্খল ভাঙতে পারেননি। 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসের ছোটখাট সংলাপের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ঔপন্যাসিকের দ্বিধা ও তীব্র পিছুটান। *"চারদিকে লোক আমি অত্যন্ত ভয় পাইয়া গেলাম। সভয়ে প্রশ্ন করিলাম চুরুট খাওয়া কেউ যদি দেখে ফেলে।"*[২] ইন্দ্রনাথ উত্তর দিয়েছিল, *"ফেললেই বা! সবাই জানে। বলিয়া স্বচ্ছন্দে সে টানিতে টানিতে রাস্তার মোড় ফিরিয়া আমার মনের উপর একটি প্রগাঢ় ছাপ মারিয়া দিয়া আর একদিকে চলিয়া গেল।"*[৩] এই সহজ সরল স্বাভাবিকতাকে শ্রীকান্ত শুধু ছেলেবেলায় নয় পরবর্তী সময়ের গ্রহণ করতে পারেনি। *"যদি কেউ দেখে ফেলে"* এই কথার উপর অপরিসীম গুরুত্ব দেওয়ার জন্য শ্রীকান্ত তার মনের শৃঙ্খল অতিক্রম করতে পারেনি কোনওদিন। এমনকী যে মানুষদের সে ভালোবেসেছিল তাদেরও সর্বসমক্ষে সম্পূর্ণ মর্যাদা দিতে পারেনি। অন্তরের শ্রদ্ধাকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দিতে না পারাই তার চরিত্রগত ত্রুটি। ইন্দ্রনাথের প্রতি তার আকর্ষণকে সে বিশ্লেষণ করেছে এইভাবে, *"ঐ অদ্ভুত ছেলেটিকে সেদিন ভালবাসিয়াছিলাম কিংবা তাহার প্রকাশ্যে সিদ্ধি ও ধূমপান করার জন্য তাহাকে মনে মনে ঘৃণা করিয়াছিলাম।"*[৪] 'প্রকাশ্যে' এই শব্দটির মধ্যেই সুপ্ত হয়ে আছে শরৎচন্দ্রের সামাজিক তথা মানসিক চেতনার চাবিকাঠি। অর্থাৎ ইন্দ্রনাথ যদি লোকচক্ষুর আড়ালে এই আচরণ করত তবে হয়তো শ্রীকান্তের তাকে সম্পূর্ণ গ্রহণে বাধা থাকত না। কিন্তু প্রকাশ্যে এই আচরণ তাকে জটিল আত্মদ্বন্দ্বে দীর্ণ করেছে। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথের অসম সাহসীকতায় বিস্মিত হয়েছে, আবার শ্রদ্ধাও করেছে। অন্য একটি স্থানে তার স্বগতোক্তি, *"ওই লোকটি কি? মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে, সে কথা কি ও জানেও না। ..... সে নিতান্ত অপরিচিত আমাকে একাকী নির্বিঘ্নে বাহির করিবার জন্য শত্রুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দয়ামায়াও কি ওই পাথরের মধ্যেই নিহিত ছিল। .....এত শুধু খেলা নয়। জীবন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া এই স্বার্থত্যাগ এই বয়সে কয়টা লোক করিয়াছে।"*[৫] ইন্দ্রনাথের হৃদয়ের এই বিরাটত্বে শ্রীকান্ত মুগ্ধ হয়েছে, অনুপ্রাণিত হয়েছে। কিন্তু দুই ব্যক্তিত্বের পরবর্তী সময়ে সংযোগ ঘটেনি; সমান্তরাল থেকে গেছে। শ্রীকান্ত 'অপরে'র মধ্যে ইন্দ্রনাথের মতো ব্যক্তিত্বের অনুসন্ধান করেছে আজীবন। কিন্তু সে নিজে কোনও দিনই ইন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারেনি। সেখানে তাকে বাধা দিয়েছে তার উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সংস্কার। শ্রীকান্ত ইন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারেনি তার সংস্কারবিদ্ধ মানসিকতার জন্য। ইন্দ্রনাথেরও সংস্কার আছে, তবে তার সঙ্গে মিশে আছে সরল বিশ্বাস, যেমন বাড়িতে না জানিয়ে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীকান্তের মাছধরা অভিযানে যাওয়ার জন্য শ্রীকান্তের কোনও-শাস্তি যেন না হয় তার জন্য সে বলে, *"দেখ রে শ্রীকান্ত, তুই চলে গেলে আমি মা কালীকে অনেক ডেকেছিলুম— যেন তোকে কেউ না মারে। কালীঠাকুর বড় জাগ্রত দেবতারে। মন দিয়ে ডাকলে কখনো কেউ মারতে*

পারে না, বলিয়া সে ছিপটা রাখিয়া দুই হাত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইয়া বোধ করি তাঁকেই মনে মনে প্রণাম করিল। বঁড়শিতে একটা টোপ দিয়া সেটা জলে ফেলিয়া বলিল, আমি তো ভাবিনি তোর জ্বর হবে; তা হলে সেও হতে দিতুম না।"[৬] ইন্দ্রনাথের সংস্কার আছে, তার সঙ্গে মিশে আছে সরল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের ভিত্তিভূমিতেই গড়ে উঠেছে তার দৃঢ় ব্যক্তিত্ব। তাই সে যেমন অনায়াসে মুসলমান বলে অন্নদাদিদিকে যেমন ভর্ৎসনা করে তেমনি আবার তার প্রতি অপার ভালোবাসায় তাকে সাহায্য করে, যেমনি সে ভূতকে বিশ্বাস করে তেমনি দৃঢ়তায় 'রাম নামে'র মাহাত্ম্য বিশ্বাস করে। এখানেই পার্থক্য ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্তের। ছোট কিশোরের মৃতদেহ কোন জাতের মনে করে সঙ্কুচিত হয় শ্রীকান্ত। সে নিজের এই মানসিক অবস্থাকে বিশ্লেষণ করে এইভাবে, *"চোখের জল দেখিবামাত্র আমার চোখেও জল আসিতেছিল সত্য; কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির প্রস্তাবে আমি একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম। পর দুঃখে ব্যথা পাইয়া চোখের জল ফেলা সহজ নহে, তাহা অস্বীকার করি না; কিন্তু তাই বলিয়া সেই দুঃখের মধ্যে নিজের দুই হাত বাড়াইয়া আপনাকে জড়িত করিতে যাওয়া—সে কঠিন কাজ।"*[৭] তাই আত্মবিশ্লেষণ করে সে বলে, *"তখন ছোট-বড় কত জায়গাতেই না টান ধরে! একে ত এই পৃথিবীর সেরা সনাতন হিন্দুর ঘরে বশিষ্ট ইত্যাদির পবিত্র পূজ্য রক্তের বংশধর হইয়া জন্মিয়া, জন্মগত সংস্কারবশতঃ মৃতদেহ স্পর্শ করাকেই একটা ভীষণ কঠিন ব্যাপার বলিয়া ভাবিতে শিখিয়াছি:.....কিছুই না জানিয়া এবং মরিবার পর এ ছোকরা ঠিকমত প্রায়শ্চিত্ত করিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল কি না, সে খবর পর্যন্ত না লইয়াই বা ইহাকে স্পর্শ করা যায় কিরূপে।"*[৮] এই পিছুটানই শ্রীকান্তকে ইন্দ্রনাথের সঙ্গে সমপদক্ষেপে চলতে বাধা দেয়, তার মন কিশোরটির জন্য করুণায় আর্দ্র হয় সত্য, কিন্তু সাহায্যের হাত সে বাড়িয়ে দিতে পারে না সংস্কারের জন্য। এখানেই সে অন্তরে ইন্দ্রনাথদের শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে, কিন্তু তার আজন্ম লালিত সংস্কারের লক্ষণরেখা গণ্ডি পারে না অতিক্রম করতে। অপরিচিত কিশোরের মৃতদেহ অবলীলায় জলে ভাসিয়ে দিয়ে ইন্দ্রনাথ কিশোরটির ভালোবাসা উপলব্ধি করে, সে বলে, *"মড়ার কি জাত থাকে রে!"* কিন্তু শ্রীকান্ত ভূতের ভয়ে জ্ঞান হারায়। এই যে দুই চরিত্রের মধ্যে আপাত বিরোধ তা কি শরৎচন্দ্রের চারিত্রিক দ্বন্দ্বকেও চিহ্নিত করে না?

আবার স্ত্রীজাতির প্রতি শরৎচন্দ্রের যে ঐশ্বরিক করুণা, সেই করুণার মধ্যেও কি চকিতে ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন চিহ্ন এঁকে দেয় না? অন্নদাদিদিকে ইন্দ্রনাথ ভালোবাসে আবার যখন তার মনে হয়েছে তারা তাকে প্রতারণা করে অর্থ নিচ্ছে তখন সেই কথা উল্লেখ করতে সঙ্কোচ বোধ করে না। আবার মুসলমান শাহজীর সঙ্গে হিন্দু অন্নদাদিদির বিবাহকে যেমন সে মেনে নিতে পারে না তেমনি সে মেনে নিতে পারে না শাহজির অন্নদাদিদির প্রতি করা বর্বরোচিত আচরণ। অর্থাৎ যে সংস্কারে সে লালিত তা সে অস্বীকার করে না, কিন্তু তার চেতনাবিধৃত মানবিক যুক্তির কাছে সংস্কার পথরোধ করতে পারে না। অন্নদাদিদির সতীত্বের মহিমার জন্য তার প্রতি ইন্দ্রনাথের ভালোবাসা নয়, সে ভালোবাসে দায়িত্বশীল মানুষ অন্নদাদিদিকে। যে অন্নদাদিদি শাহজির প্রতি তার সামাজিক দায়িত্ব পালন করে, কিন্তু শাহজির অন্যায় মেনে নেয় না। এই কিশোরদের কাছেও তার স্বামীর পূর্বকৃত অপরাধ গোপন করে না, এই অন্নদাদিদিকে ইন্দ্রনাথ ভালোবাসে। তাই শাহজির মৃত্যুর পর নির্দ্বিধায় অন্নদাদিদিকে তার মায়ের সাথে থাকার প্রস্তাব দিতে পারে, এখানে কোনও সংস্কার তাকে বাধা দেয় না। এরই অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে শ্রীকান্ত, সে অন্নদাদিদিকে শ্রদ্ধা করেছে অন্নদাদিদির তথাকথিত

মূল্যবোধের জন্য। অর্থাৎ যে অন্নদাদিদি মুসলমান শাহজির সঙ্গে থেকেও হিন্দুত্বের 'চিহ্ন' নির্দ্বিধায় বহন করেন, *"পরনে হিন্দুস্থানী মুসলমানীর মত জামাকাপড়— গেরুয়া রঙে ছাপান, কিন্তু ময়লায় মলিন নয়, হাতে দুগাছি গালার চুড়ি। সিঁথায় হিন্দু-নারীর মত সিঁদুরের আয়তি-চিহ্ন।"*[৯] তিনি সেই অন্নদাদিদি যিনি শাহজির সমস্ত অন্যায় মেনে নিয়ে শুধু পাতিব্রত্যের জন্য তাকে ত্যাগ করে না, এমনকী যে শাহজির তার দিদিকে হত্যা করেছে তাকেও অন্নদাদিদি ক্ষমা করে যেহেতু শাহজি তার স্বামী। যদিও অন্নদাদিদির শাহজির মৃত্যুর পর তার মৃতদেহে চুম্বন করার মধ্যে প্রেমের প্রকাশ ঘটেছে তবুও অন্নদাদিদি কোথাও মুখে তা স্বীকার করেনি। সব শেষে শ্রীকান্তের প্রতি তার যে চিঠি সেখানেও শাহজির প্রতি তার একান্ত ব্যক্তিগত প্রেমের স্বীকৃতি নেই সেখানেও সে দোহাই পেড়েছে পাতিব্রত্যের, সতীত্বের। এবং এই সংস্কারের জন্যই অন্নদাদিদি শ্রীকান্তের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করতে পেরেছে। সে তাই বলে, *"আমার তাই বোধ হয় স্ত্রীলোককে কখনও আমি ছোট করিয়া দেখিতে পারিলাম না। বুদ্ধি দিয়া যতই কেন না তর্ক করি, সংসারে পিশাচী কি নাই? নাই যদি তবে পথেঘাটে এত পাপের মূর্ত্তি দেখি কাহাদের? সবাই যদি সেই ইন্দ্রের দিদি, তবে এতপ্রকার দুঃখের স্রোত বহাইতেছে কাহারা? তবুও কেমন করিয়া যেন মনে হয়, এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্যিক আবরণ, যখন খুশি ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁরই মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে।"*[১০] এই সতী 'অন্নদা' শরৎচন্দ্রের আদর্শ মানবী। কিন্তু ইন্দ্রনাথ অন্নদাদিদিকে ভালোবাসে তার সতীত্বের সংস্কারের জন্য নয়, অন্নদাদিদির দায়িত্ববোধের জন্য। সে বলে *".....তবু দিদি ওকে কাঠ কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে তবু কিছুতে ওর হয় না।"*[১১] এই দায়িত্ববোধ সম্পন্ন দিদিকে ইন্দ্রনাথ শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। অর্থাৎ যে দায়িত্ববোধ মানুষকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে। অর্থাৎ একই 'চিহ্ন' দুই মানুষের কাছে দুই বিপরীত বার্তা বহন করে আনে। অন্নদাদিদি দুই কিশোরের কাছে দুই মানবিক রূপের প্রকাশ। তাই অন্নদাদিদির যে ব্যক্তিত্ব তাকে মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে তা আবিষ্কার করতে পারে ইন্দ্রনাথ। আবার, সেই একই ব্যক্তিত্ব শ্রীকান্তের কাছে নারীত্বে 'আদিকল্প' হিসেবে চিহ্নিত হয়। ইন্দ্রনাথ ও শ্রীকান্ত চরিত্রের এই সূক্ষ্ম পার্থক্যের জন্য শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের নায়করা শ্রীকান্তের উত্তরসূরী কিন্তু ইন্দ্রনাথের উপন্যাস ধারায় কেউ নেই, ইন্দ্রনাথ অদ্বিতীয়। যদি আমরা ইন্দ্রনাথের উত্তরসূরীকে শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে পেতাম তাহলে হয়তো বাংলা উপন্যাস ধারায় এক নূতন দিগন্তের সূচনা হত।

সমাজ পরিবর্তনের প্রতি শরৎচন্দ্রের যে স্বাভাবিক ঝোঁক ছিল তার ইঙ্গিতও পাওয়া যায় শ্রীকান্ত উপন্যাসে। এ উপন্যাসে ইন্দ্রনাথের প্রতি শ্রীকান্তের একান্ত তীব্র আকর্ষণের মধ্যেই এর বীজ নিহিত। শ্রীকান্ত কোনওদিন ইন্দ্রনাথ হয়ে উঠতে পারেনি সত্য, কিন্তু ইন্দ্রনাথ তার অন্তরে থেকে তাকে চালিত করেছে। শ্রীকান্ত পথে বেরিয়েছে ইন্দ্রনাথকে লক্ষ করে, কিন্তু সংস্কারের তীব্র পিছুটান তাকে এগোতে দেয়নি।

এই চরিত্র-ধারায় এসেছে পিয়ারি বাঈজি চরিত্র। কিন্তু এখানেও যুবক শ্রীকান্ত নারীত্বের চরম উৎকর্ষ সতীত্বের মহিমা প্রকাশে সচেষ্ট। তথাকথিত পতিতা নারী তার করুণা লাভ করে, তার সতীত্ব রক্ষার প্রচেষ্টায়, মানুষ হিসেবে নয়। শরৎচন্দ্রের সৃষ্ট এই নারী চরিত্ররা প্রভূত সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও কোনও সামাজিক বিপ্লবের সূচনা করেনি। তারা যেন তথাকথিত সতীসাধ্বী পত্নীর সঙ্গে সম প্রতিযোগিতায় প্রথম হতে চেয়েছে। তাই তার উপন্যাস পড়তে

গিয়ে পাঠক এই সংশয়ের সম্মুখীন হন যে কে বেশি সতী—সমাজস্বীকৃত বিবাহিত স্ত্রী না সমাজ বিবর্জিতা পতিতা রমণী। এবং এখানে অন্নদাদিদি, রাজলক্ষ্মী তাদের সামাজিক আচরণের জন্য শ্রীকান্তের কাছে একই চিহ্ন বহন করে আনে। রাজলক্ষ্মীর পিয়ারি হয়ে ওঠার যন্ত্রণার কোন পরিচয় এই উপন্যাসে আমরা পাই না। এমনকী শ্রীকান্তের প্রতি তার প্রেম যেন অনেকটা চণ্ডীদাস বর্ণিত সেই *"রজকিনী প্রেম নিকষিত হেম, কামগন্ধ নাহি তায়।"* অর্থাৎ বাস্তব দেহকেন্দ্রিক প্রেমের কোনও আভাস উপন্যাসে পওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসের শচীন বা দামিনী মতো অবদমনে দীর্ণ কোনও স্বর আমরা উপন্যাসে দেখি না। এমনকী রাজলক্ষ্মীরও শ্রীকান্তের মধ্যে হঠাৎ বন্ধুকে নিয়ে আসাও যেন আকস্মিক ঘটনা। তার কোনও প্রস্তুতিও উপন্যাসে ছিল না এ যেন ঔপন্যাসিকের নারী সম্পর্কিত উচ্চধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস। অর্থাৎ পিয়ারির রাজলক্ষ্মী হয়ে উঠতে হলে যে সমাজ নির্দেশিত পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়ে উঠতে হবে, *"পিয়ারীর হৃদয়ের একাগ্র বাসনা অনুমান করা আমার পক্ষে কঠিন নয়; .....তবুও সে যে মুহূর্তে এই একটা দরিদ্র বালকের মাতৃপদ স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, অমনি সে নিজের দুই পায়ে শত পাকে বেড়িয়া লোহার শিকল বাঁধিয়া ফেলিয়াছে। আপনি সে যাই হোক; কিন্তু সেই আপনাকে মায়ের সম্মান তাহাকে এখন দিতেই হইবে।"*[১২] রাজলক্ষ্মীকে এই 'মাতৃত্বের সম্মান' দেওয়ার জন্য শ্রীকান্ত উদগ্রীব। কারণ শ্রীকান্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজের উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া ধারণা থেকে জানে নারীত্বের চরম স্বীকৃতি মাতৃত্বে। কিন্তু এই সম্মান যে আপনার ভালোবাসার পাত্রকে স্বীকৃতি দিয়েও রক্ষা করা যেতে পারে এ সম্পর্কে দ্বিধাগ্রস্ত শ্রীকান্তের স্রষ্টাও। একটি সত্য সম্পর্ক রক্ষা করার জন্য অপর সম্পর্ক ত্যাগ করার মধ্যে যে কোনও মহিমা নেই, বরং ভণ্ডামি আছে, তা তিনি কখনও স্বীকার করেননি। সেখানেও সক্রিয়ভাবে তার চেতনায় কাজ করেছে যে 'লোকে কি বলে'। তাই রাজলক্ষ্মী বিনোদিনী বা দামিনী হয়ে উঠতে পারে না, তার চরিত্রের কোনও বিবর্তন নেই।

এই উপন্যাসে চমৎকার হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন শরৎচন্দ্র সহজাত কৌতুকবোধের সঙ্গে। এইরকমই এক অসাধারণ সৃষ্টি এই উপন্যাসের মেজদা চরিত্র। উপন্যাসের বয়নে সূক্ষ্ম হাস্যের সঙ্গে তুলে ধরেছেন মেজদাকে, *"ছোড়দা, যতীনদা ও আমি তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি এবং গম্ভীর-প্রকৃতি মেজদা বার-দুই এণ্ট্রান্স ফেল করিবার পর গভীর মনোযোগের সহিত তৃতীয়বারের জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। তাঁহার প্রচণ্ড শাসনে এই মুহূর্ত কাহারো সময় নষ্ট করিবার জো ছিল না।"*[১৩] এই বয়ানে উঠে এসেছে আত্মবিস্মৃত ব্যক্তি অবয়ব কৌতুকের সঙ্গে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের দিকে দৃষ্টি না দিয়ে অপরকে কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর কাজে অহরাত্র ব্যস্ত। বহুরূপীকে বাঘ মনে করে যখন ভট্টাচার্যি মশায় কাঁদতে কাঁদতে বলে, *"বারা বাঘ নয়, সে একটা মস্ত ভালুক—লাফ মেরে বৈঠকখানা থেকে বেরিয়ে এল।"*[১৪] এই সব ছোট ছোট সংলাপে উঠে এসেছে ব্যক্তি মানুষের মধ্যের অসঙ্গতি। অর্থাৎ সূক্ষ্ম হাসি যখন অট্টহাসি হয়ে উঠছে তখনই এর পাশাপাশিভাবে ফুটে উঠেছে সামাজিক মানুষের আপাত অসঙ্গতির পেছনের চরিত্রগত অসঙ্গতি। এই রকমই আর একটি চরিত্র নতুন দাদা চরিত্র। শহরে বসবাসকারী অন্তঃসারশূন্য মানুষ যখন গ্রামের মানুষকে তার চেয়ে নিকৃষ্ট ভেবে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে আবার বিপদে পড়লে তারই সাহায্য নিতে দ্বিধাগ্রস্থ হয় না। কলমের আঁচড়ে শরৎচন্দ্র এই সব স্বার্থপর, ভণ্ড মানুষদের চরিত্র কৌতুকের সঙ্গে তুলে ধরেছেন।

শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-ধারায় শ্রীকান্ত (প্রথম পর্ব) ব্যতিক্রমী উপন্যাস। এই উপন্যাসেই

আমরা পেয়েছি অকুতোভয়, সংস্কারহীন পরোপকারী ইন্দ্রনাথকে, অন্নদাদিদির মতো ব্যক্তিত্বময়ী নারীকে কিংবা রাজলক্ষ্মীর মতো সমাজ বর্জিতা নারীকে, যে শুধু প্রেমের জন্য তার পরিবেশকে উপেক্ষা করতে পেরেছে। অপার সম্ভাবনাময় এই চরিত্রগুলিকে শরৎচন্দ্র আবিষ্কার করেছিলেন তাদের ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্বের জন্য। কিন্তু তাঁর জন্মলালিত সংস্কারের জন্য চরিত্রগুলির কোনও বিবর্তন আমরা দেখি না। এই চরিত্রগুলি আজও আমাদের ভাবায় কিন্তু পরিণতি পায় না ঔপন্যাসিকের সংস্কারবিদ্ধ মানসিক সীমাবদ্ধতার জন্য। শরৎচন্দ্রের নিজেরই স্বীকারোক্তি তাই — *"আমি ভেবে দেখেছি, আমার মনের কোণে সত্যিই এক গোঁড়া কনজারভেটিভ লুকিয়ে আছে। .....আমাদের সংস্কার বা আচারবিচারের ওপর আমি একেবারে খড়্গহস্ত, বিরুদ্ধে যখন যুক্তি দিই মনে প্রাণে বিশ্বাস করেই দিই। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখেছি যখনই আমার মনের কোণে সেই কনজারভেটিভটি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে, তখুনি আমি দুর্বল হয়ে পড়ি। যেমন ধর না বিধবা বিবাহ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে বিধবাদের পুনর্বিবাহে অনুমতি না দেওয়া স্ত্রীজাতির প্রতি পুরুষ জাতির অন্যায়ের জঘন্য দৃষ্টান্ত। সংসারে অনেক পাপতাপের এও একটা কারণ। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, বিধবা বিবাহ দেবার অনুমতির দায়িত্ব যখন আমার উপর আসে তখন অন্তর থেকে সে অনুমতি আমি কিছুতেই দিতে পারি না।"*[১৫] এই অনতিক্রম্য মানসিক প্রতিরোধই শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের অমীমাংসিত সত্য। তাই তাঁর উপন্যাসে সমাজ পরিবর্তনের চিন্তা সূচিত হয় কিন্তু কোনও পরিণতি পায় না, তা যেন অনেকটা সংস্কারবদ্ধ মানসিকতার সমান্তরাল বয়ে চলা সংস্কারহীন মূল্যবোধ। যা কোনও পট পরিবর্তনের বার্তা নিয়ে আসে না — শুধু প্রশ্ন নিয়ে নিরন্তর বয়ে যায়।

সূত্র নির্দেশ ঃ

১। শরৎসাহিত্য সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৩৯২, পৃ: ২৬৮
২। তদেব , পৃ: ২৬৯
৩। তদেব, পৃ: ২৬৯
৪। তদেব, পৃ: ২৬৯
৫। তদেব, পৃ: ২৭৫
৬। তদেব, পৃ: ২৮২
৭। তদেব, পৃ: ২৭৯
৮। তদেব, পৃ: ২৭৯
৯। তদেব, পৃ: ২৮৫
১০। তদেব, পৃ: ২৮৪
১১। তদেব, পৃ: ২৮৮
১২। তদেব, পৃ: ৩২২
১৩। তদেব, পৃ: ২৭০
১৪। তদেব, পৃ: ২৭১
১৫। উপন্যাসে সমাজতত্ত্ব, পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়, র‍্যাডিকাল ইম্প্রেশন, পৃ: ১৫৮

■ *লেখিকা শিলচর মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা তথা বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও বাংলা সাহিত্যের গবেষক।*

নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী ঃ একটি ভিন্ন পাঠ

অনুরূপা বিশ্বাস

নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী উপন্যাসের লেখক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর জন্ম ১৮৮৬ সালে। তাঁর জন্মশতবর্ষ পালিত হয়েছিল শিলচরে। এই উপলক্ষে উক্ত উপন্যাস পুনঃপ্রকাশিত হয়েছিল ১৯৮৭ সালে। আমরা তাঁর জন্মশতবর্ষ অনুষ্ঠানের অংশীদার ছিলাম বলে প্রথম প্রকাশিত সংস্করণের বই পড়ে দেখেছি এবং সাগ্রহে তাঁকে বরাক উপত্যকার সামাজিক উপন্যাস রচনার পথিকৃৎরূপে সেদিন বরণ করে নিয়েছি। এক দশক কাল পরে এতদঞ্চলের প্রাচীন কবি-গীতিকার রূপে জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব রামকুমার নন্দীর 'মালিনী উপাখ্যান' প্রকাশিত হবার পর আমাদের সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে হল। প্রাচীন বা মধ্যযুগের সাহিত্যের বেলা এরকম সর্বদাই ঘটে থাকে। আধুনিক সাহিত্যের বেলা আমাদের অঞ্চলে যে এ ব্যাপার ঘটল তার কারণ রামকুমার নন্দীর স্বহস্তে লেখা পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে পরে। মালিনীর উপাখ্যান প্রকাশিত হয়েছে ১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত 'মালিনী উপাখ্যান' বরাক উপত্যকার উপন্যাস শাখায় প্রথম স্থান অধিকার করেছে গবেষকদের বিচারে। অতএব আমরা অশ্রুমালিনী উপন্যাসকে দ্বিতীয় স্থানে রেখে আপাতত আলোচনায় অগ্রসর হতে চাইছি। দুজনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ৫৫ বছর এবং লিখিত উপন্যাস দুখানির সময়কালীন ব্যবধান ৩৩ বছর। আমাদের পক্ষে ব্যাপারটা আনন্দের এ কারণে যে এর দ্বারা বরাক উপত্যকার প্রথম উপন্যাস আমরা পেয়ে গেলাম ঊনবিংশ শতকের শেষবেলায় অর্থাৎ ১৮৯২ সালে।

আমরা জানি, বাংলাসাহিত্যধারায় আধুনিক কালোচিত প্রবর্তনায় ঊনিশ শতকীয় নবজাগরণের সাংস্কৃতিক চেতনা ও বাংলার সমাজ জীবনে অনিবার্য যুগ পরিবর্তনের হাত ধরেই উপন্যাস নামক শিল্প প্রকরণটি দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রে এর সূত্রপাত এবং বিস্তার আরও অনেকের দ্বারা। আজও উপন্যাস চেহারা বদল করে করে এক ঘাট থেকে অন্য ঘাটে পৌঁছে যাচ্ছে কারণ মানুষের চলমান জীবন প্রবাহে জীবনের দাবিতেই যে তার জন্ম হয়েছিল। কাজেই তার থামা নেই, বিরাম নেই। একটা প্রবল আত্মসচেতনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ উপন্যাসের মূল হাতিয়ার। সমাজ বিবর্তনই উপন্যাসের আবির্ভাবকে অনিবার্য করে তুলেছিল। শহরবাসী মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টি উপন্যাস সৃষ্টির পূর্বশর্ত। এ থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে আধুনিক কালের উন্মেষে সাহিত্যের এই বিশেষ শাখাটির জন্ম হয়েছিল কার্যকারণসূত্রেই। কবিতার ক্ষেত্রে যেকথা বলা চলে না। পদ্য তো আবহমান কাল আমাদের সাহিত্যের বাহন। কালে কালে তার রূপবদল হয়েছে এইমাত্র। উপন্যাসকে আমরা আমাদের পূর্বজ সাহিত্যধারা বাহিত বলে ধরে নিতে পারি না। তবে এটুকু বলতে পারি যে আমাদের দেশজ ঐতিহ্যবাহী সমাজবাস্তবতামূলক এই আধুনিকতার কিছু লক্ষণ ছিল — প্রকৃতি ও মানুষের ওতোপ্রোত সান্নিধ্য, আঞ্চলিক যথার্থ ও উচ্চ নৈতিক দায়বোধ ও কনটেন্টের দিক দিয়ে পরিবর্তনমুখী সমাজের ব্যক্তি ইউনিটের নবনব চিন্তা ও ভাবনির্মাণের তাগিদ। বিকাশমান কলকাতা শহরে নতুন যুগের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন যাঁরা—শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লেখক, ভাবুক সম্প্রদায় ছিলেন ১৮২০-৩০ এর মধ্যবর্তী সময়কালের তরুণ ছাত্র ও যুবকের দল। তাদের কারো

কারো হাত দিয়ে উপন্যাস শিল্পের জন্ম উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে। সেদিন পাঠক চিত্তে দারুণ অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল উপন্যাস। উদীয়মান মধ্যবিত্ত শিক্ষিত মানস উপন্যাসে ব্যক্তিসত্তার প্রকাশকে অভিনন্দিত করেছিল।

উপন্যাসকে লালন করে যে সমাজ, সেই সমাজ চেতনার উন্মেষ কাছাড় তথা শিলচরে উনিশ শতকের শেষ দশকে সূচিত হয়েছিল। এখানকার উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ বেশিরভাগ এসেছিল ভাগ্যান্বেষণে, চাকরির সূত্রে তাদের শহরবাস। শেকড় ছিল গ্রামে। তাদের সত্তা ছিল দ্বিধা-বিভক্ত। পুরোপুরি নাগরিক সমাজ আমরা পাই বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক নাগাদ। সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর উপন্যাস রচনাকাল মোটামুটি ওই সময়টাতে। ১৯০৬ সালে শিলচর থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন তিনি। শিলচরে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল ওই বছরে এবং তিনি ছিলেন প্রথম ব্যাচের পরীক্ষার্থী। ১৯০৮-এ ঢাকা থেকে এফ.এ ও ১৯১০-এ কলকাতা সিটি কলেজ থেকে বি.এ পাশ করে ফিরে এসে এখানে শিক্ষকতায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর জীবন কথা থেকে প্রাপ্ত তথ্য আমাদের বলে দেয় যে নবযুগের ভাবনা তিনি কলকাতা থেকেই নিয়ে এসেছিলেন এবং নবোদ্‌গত সেই বিচিত্র ভাবনারাশির প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর উপন্যাসে যে উপন্যাস সেদিন বরাক উপত্যকার পাঠকদের সাহিত্যের রসাস্বাদনে তৃপ্ত করেছিল। প্রায় ষাট বছরের ব্যবধানে 'অশ্রুমালিনী' পড়ার সুযোগ পেয়ে প্রথমেই আমার মনে হয়েছিল—তিনি যদি উপন্যাস না লিখতেন তাহলে আমরা শতাব্দীকাল আগেকার সমাজ বা পরিবারের দেখা পেতাম কী করে? সেই সময় তো চিরতরে হারিয়ে যেত আমাদের কাছ থেকে। তাই বলি, অশ্রুমালিনী তখনকার বাস্তব পটভূমিতে দাঁড়িয়ে একটি বাঙালি পরিবারের জীবনযাপন, তার বিশ্বাস-অবিশ্বাস, দ্বিধাদ্বন্দ্ব, সমস্ত পিছুটান সহ যেভাবে প্রকাশ করেছে তাতে আমরা একটা বিশ্বস্ত দলিল পেয়ে যাই। ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত লেখক উন্নততর চিন্তাচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্লভ প্রতিভা বলে এমনভাবে সেই সময় ও সমাজকে চিত্রিত করেছেন যে পরিবর্তনের ঢেউ লাগা রূপান্তরের অনিবার্য বেগকে আমরা ধরতে পারি। অনুভব করতে পারি কীভাবে এই টান লেগে ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যে দ্বন্দ্ব লেগেছে, দোলা জেগেছে প্রতিষ্ঠিত ভাল-মন্দের মধ্যে, শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে। ব্যক্তির স্বাধীনতার বিষয়,নারীর মর্যাদা ও অধিকারের প্রশ্ন — নতুন যুগের মৌলিক চিন্তার এ সব উপাদান স্বতঃই এসে পড়েছে। অশ্রুমালিনীর মধ্যে আমরা সে যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় মানুষদের দেখা পেলাম। তাদের মুখে শুনলাম অভিনব কিছু সংলাপ। উপন্যাসের কাহিনি গ্রামজীবন ভিত্তিক। রাধানগরের প্রাচীন জমিদার কালীচরণ রায়ের কন্যা যোগরানির দাম্পত্যজীবনের টানাপোড়েন উপন্যাসের আখ্যানবস্তু। এই যুগলের বিবাহিত জীবনে একটা প্রশ্নচিহ্নের মতো রয়েছে যোগরানির পিতৃগৃহের আশ্রিত যুবক-নীরদ যাকে জমিদার গিন্নি মনে মনে জামাতারূপে কাছে পাবার ইচ্ছা পোষণ করতেন। যোগরানিরও মনের ইচ্ছা মায়ের অনুসারী ছিল। হঠাৎ করে পরেশের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়ে যাওয়াতে যোগরানি এবং নীরদ দুজনেই আশাহত হয়। মোটামুটিভাবে উপন্যাসের কাহিনি এই ত্রিভুজের মধ্যে আবর্তিত হয়েছে। পরেশ, নীরদ দুজনই এন্ট্রান্স পাশ এবং চাকরিজীবী। যোগরানির ভাই কিরণ উচ্চশিক্ষিত, সরকারি উচ্চপদে আসীন, শহুরে শিক্ষাদীক্ষায় অভ্যস্ত। সমাজের বহিরঙ্গের পরিবর্তন উপন্যাসে এসেছে এই তিনজন চাকরিজীবীকে কেন্দ্র করে। তারা কেবল নতুন উপায়ে জীবিকাসংস্থান করছে না, নিজেদের

মধ্যে নতুন সমাজ চিন্তা, মূল্যবোধকেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্থান দিচ্ছে। উপন্যাসে তাই দেখি পণপ্রথার বিষয়টি তুমুল আলোচিত হচ্ছে। তর্কবিতর্কের মধ্যে নবযুগের মতামত ধরা পড়েছে। উপন্যাসকার লিখেছেন — *'তখনও পণপ্রথা লইয়া খুব আন্দোলন চলিতেছিল। একটি বয়প্রাপ্তা মেয়ে পণদানে অসমর্থ পিতার দুঃখে দুঃখিত হইয়া স্বীয় পরিধানবসন কেরোসিনসিক্ত করতঃ তাহাতে আগুন ধরাইয়া আত্মহত্যা করিয়া মুহূর্ত কালের মধ্যেই সমস্ত দুঃখের অবসান করিল। ঐ ঘটনা উপলক্ষ্যে পুরুষের দল নানাস্থানে সভা করিয়া বক্তৃতাদি দ্বারা ঐ বালিকার এবম্বিদ কার্যের জন্য ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে থাকেন— ভাবপ্রবণ নবীন কবিগণ মর্মগ্রাহী কবিতা রচনা করিয়া বালিকার এই আত্মাহুতির স্মৃতিকে অক্ষয় করিয়া রাখিতে প্রয়াস পান। আর সংবাদপত্রসেবীগণ সেই সকল বারতা ভড়িত বার্তার মত ঘরে ঘরে ছড়াইয়া দিয়া ঐ নূতন ভাবতরঙ্গটাকে বেশ ফেনাইয়া তুলেন'*— এখন এই ঘটনা ও তার প্রতিক্রিয়ার বিচার নতুন চিন্তায় উদ্বুদ্ধ নীরদ কীভাবে করছে দেখা যাক। আলোচনার মধ্যে নীরদ বলছে— *'তার ফলটা কি হতেছে— তা দেখছ? ঐ কাগজখানাতেই চেয়ে দেখ আরও কয়টি আত্মহত্যা এরকম হয়ে গেছে। কোনও দুষ্কার্যের জন্যও যদি এভাবে বাহবা দেওয়া যায়, তবে সে দুষ্কার্য করতেও অনেকের সাহস হয়। তাই বলে সে খারাপ কাজটাকে ভাল বলা যায় না।'* আর এ কাজে পুরুষের দল যে এত প্রশংসা করছে তার কারণ নীরদের কথায়— *'কোন রোগী যদি রোগযন্ত্রণায় ভুগতে থাকে আর ডাক্তার তার যন্ত্রণার কোন উপশম না করতে পারে তবে সেই রোগী মরে গেলে ডাক্তার যেমন ঐ মৃত্যুটাকে রোগীর ভবযন্ত্রণার (এবং সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারেরও নিজের যন্ত্রণার) অবসানের হেতু মনে করে থাকে ... তোমাদের পুরুষদের মুখেও আত্মহত্যার প্রশংসা তদ্রূপ প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। পণপ্রথার অত্যাচারে উৎপীড়িত সমাজে তোমরা পুরুষগণ আজ কন্যাদায়ে জ্বালায়িত অথচ অত্যাচারের প্রতিকার বিধানে অলস, নিশ্চেষ্ট'*— এই যে অকুণ্ঠ সত্য ভাষণ, এই যে মনোভাব প্রকাশিত হল নীরদের কথায় তা যেমন সুস্থ সমাজ ভাবনার দায়বহন করছে তেমনি ঘটনার সত্যকেও অত্যন্ত বাস্তব দৃষ্টিতে বিচার করে দেখার দিকে ভাবনাকে টেনে নিয়ে যায়। নিজেকে আঘাত করেও সত্য বলার এমন সাহস অবশ্য ছিল নবযুগের বার্তাবাহকের। মেয়েদের মর্যাদা বিষয়েও ঔপন্যাসিকের সজাগ দৃষ্টি এবং মেয়েদের সমানাধিকার প্রত্যাশী মনটিকে খুঁজে পাওয়া যায় নীরদের জবানিতে— *'এই মেয়েদের আত্মহত্যায় কিছু হবে না, পুরুষদের সভাসমিতি বক্তৃতায়ও কিছু হবে না। যার কাজ তাকে করতে হবে। দুর্বলের কর্তৃত্ব শোভা পায় না। নারীর হাতে তার আত্মরক্ষার ভার দাও। .. সে প্রতিকার নারীর হাতে। মেয়েরা যদি প্রতিজ্ঞা করে বসে যে পণপ্রার্থীকে বিয়ে করবে না। তাহলে অনেকটা প্রতিকার হতে পারে। তখন পুরুষ পণপ্রার্থী না হয়ে কন্যাপ্রার্থী হবে। সংসারে যে বস্তু যত দুষ্প্রাপ্য তাহার আদর তত বেশি ... তাই বলছি, মেয়েদের একটু শক্ত হয়ে নিজেদের ভার নিজের হাতে নিতে হবে'।* প্রায় আট দশকের পরপারে এই কথাগুলো এমন সুরে বলে থাকেন সমাজ তাত্ত্বিকরাও।

উপন্যাসের প্রাণধন গুপ্ত, কালীচরণ রায়-এরা টাইপ চরিত্র। আমাদের অঞ্চলে দোর্দণ্ডপ্রতাপ জমিদারদের অস্তিত্ব ছিল না; ছোটখাটো জমিদার তারা পারিবারিক ক্ষেত্রে এরকমই ভাল মানুষ গোছের। ভুবনেশ্বরীও টাইপ চরিত্র। উগ্র মেজাজ, গৃহিণীর অধিকার সচেতন, অর্থলোভী, বধূনির্যাতনকারী শাশুড়িদের মোটামুটি এরকম ভূমিকাই থাকত। সংক্ষেপে

বলতে পারি, উপন্যাসটির সামাজিক বাস্তবতা প্রশ্নাতীত। নারীর স্বাধিকার চেতনা উন্নত মর্যাদাবোধ খুব জোরালোভাবে না হলেও ধরা পড়েছে কলমে। সতীত্বের ধ্যানধারণা মধ্যযুগীয় মূল্যবোধের অনুসারী হলেও যোগরানির মানসিক ক্রিয়ায় আত্মমর্যাদাসম্পন্ন আধুনিক নারীর ছায়া পড়েছে। সাধারণ বাঙালি পরিবারের সেবাপরায়না, ধৈর্যশীলা, নম্র নতমুখী বধূরূপেই ঔপন্যাসিক যোগরানিকে এঁকেছেন। গার্হস্থ্যজীবনে আত্মত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত করে তুলতে চেয়েছেন কিন্তু জীবনের তাগিদেই যোগিনী যোগরানির মানবীরূপে আত্মপ্রকাশকে লেখক ঘটনাবলির ক্রমপ্রসারে সুন্দরভাবে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। পরিবারের শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখবার চেষ্টায় ক্রমাগত নিজেকে বঞ্চিত করে চলেছিল যে নারী, আত্মসুখের দিকে ধাবিত মনটাকে রাশ টেনে রেখেছিল বধূ হিসাবে সুনাম রক্ষা করতে—পরিজনদের স্বার্থসুখের জন্য শত অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেছিল এতদিন সেই নারীর সুপ্ত নারীত্ব জেগে উঠল নীরদের বোন নিরুপমার সুখী দাম্পত্য প্রেমের জীবন দেখে—তার মধ্যে জেগে উঠল দারুণ অতৃপ্তি—প্রেমের পিপাসায় চঞ্চল হল সে। কঠিন প্রকৃতির শাশুড়ির অনুপস্থিতি, অত্যন্ত দয়াপরবশ উদারমনস্ক স্নেহকাতর বধূবৎসল শ্বশুরের সমবেদনা, পাশাপাশি স্বামীর নিদারুণ নিষ্ঠুরতা, চরম ঔদাসীন্য—এসব পরস্পর বিরোধী অনুভব-অনুভূতির স্পর্শ নিয়ে যোগরাণীর দিন একরকম কেটে যাচ্ছিল। নিরুপমা ক'দিনের জন্য বাপের বাড়ি এসে তাকে জাগিয়ে দিয়ে গেল। তখন স্বামীর জন্য তার কী প্রত্যাশা, প্রতীক্ষা! এই সুগভীর প্রত্যাশী মনকে নির্মমভাবে গুঁড়িয়ে দিল পরেশের নিষ্ঠুর ব্যবহার। সজাগ চিত্তবৃত্তির তাড়ানায়, নারীহৃদয়ের স্বতোৎসারিত কামনায় যোগরানি সেদিন দুপুরবেলা শোবার ঘরে এসেছে, একেবারেই অঘটন। কারণ শাশুড়ির নিষেধ ছিল দিনের বেলা দেখা হবার। উপন্যাসের ১১২ পৃষ্ঠায় যে বর্ণনা পেয়েছি তা এরকম —

যোগরাণী— একটি কথা জানতে চাই

পরেশ — কি কথা?

যোগরাণী— দিবাভাগে স্বামীমুখদর্শন কি অন্যায়?

পরেশ — সে ন্যায় অন্যায়ের বিচারের অধিকার আমার নাই; গুরুজনের আদেশ মানতেই হবে।

যোগরাণী— গুরুজনের প্রতি কর্তব্য পালনে যদি আশ্রিতের প্রতি কর্তব্যের হানি ঘটে।

পরেশ — ঘটে ঘটুক।

যোগরাণী— তবে এ ক্ষতির জন্য দায়ী কে?

পরেশ — অত দায়টায় বুঝি না। আমি কিছুতেই মাতাপিতার কাছে অবাধ্য, অসংযত পুত্র বলিয়া পরিচিত হইতে পারিব না।

যোগরাণী— কিন্তু স্ত্রীর কাছে হৃদয়হীন অপ্রেমিক স্বামী বলিয়া পরিচিত হইতে পারিবে?

মস্ত বড় প্রশ্ন! আর এ প্রশ্ন মধ্যযুগের কোন নারীর মুখ থেকে শোনা সম্ভব ছিল না। নবযুগের নারীর কথা মনে পড়ে যায় রবীন্দ্রনাথের সবলার কথা। বাস্তবিকই প্রেমের বীর্যে সর্বদা ভয়কাতর যোগরানি সেদিন অশঙ্কিনী হয়েছিল বলেই এমন প্রশ্ন। আর তার উত্তরে পরেশ যখন নির্মম

শেল দিয়ে তাকে নীরদের প্রতি প্রেমাসক্ত এমন ইঙ্গিত করল তখন সেই চিরভীরু, প্রথার আনুগত্যে নির্জীব যোগরানি, মিথ্যে ত্যাগের আদর্শে চিরবঞ্চিত প্রেমভিখারিণী নারী আত্মসম্মানকে সবচেয়ে বড় করে দেখল। লেখক এখানে নারীশক্তির জোর দেখিয়েছেন, যোগরানির মধ্যে আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের সঞ্চার করে উপন্যাসকে শিল্পিত করেছেন। পরের ঘটনা — যোগরানি প্রেমহীন স্বামীর সংসার ছেড়ে চলে গিয়েছে বাপের বাড়িতে তার আবাল্যের আশ্রয়ে। এই ঘটনা থেকে আমরা উপলব্ধি করতে পারি যে লেখক এর দ্বারা দাম্পত্যে এক নূতন মাত্রা আনতে চেয়েছেন যা পুরোপুরি আধুনিক মনন দ্বারা সৃষ্ট। এ ছাড়া যোগরানির বধূজীবনের বর্ণনায় সেই সময়ের যে পারিবারিক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক তাতে সেই যুগের চিত্র বিশ্বস্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

অনেক পুরনো মূল্যবোধকে টিকিয়ে রাখতে চেয়েছেন এটা যেমন সত্যি, একইভাবে সত্যি যে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপারকে বর্জনও করতে চেয়েছিলেন তিনি। হয়তো পেরে ওঠেননি, যুগের সীমা লঙ্ঘন করতে পারেননি বলে বা তাঁর নিজস্ব পারিবারিক মূল্যবোধ বাধা হয়ে পড়েছিল।

নবযুগকে তিনি অন্তরে বরণ করে নিয়েছিলেন ঠিকই কিন্তু নিভৃত মনে একটা ভয় বা শঙ্কাও তাঁর ছিল। তিনি তো পুরোমাত্রায় নাগরিক বা নগরমনস্ক লেখক নন। গ্রাম জীবনের আশ্রয়েই সেদিন শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতা সবে ডানা মেলেছে। উড়বার সাধ থাকলেও সাধ্য তখনও হয়নি। শিকড় ছিল মধ্যযুগীয় ধ্যানধারণার গভীরে। তাই এত দ্বন্দ্ব। সেটাই স্বাভাবিক। যে নবযুগ এসে গেছে তাকে মেনে নিয়েও পুরনোর মধ্যে ভাল যা কিছু তা রক্ষা করার একটা তাগিদ ছিল তাঁর মনের গভীরে। সাধারণ বাঙালির পারিবারিক জীবন যা কিনা মেয়েদের ত্যাগেব উপরই গড়ে উঠেছিল বা উঠছিল সেই সময়ে তাকে টিকিয়ে রাখার জন্য নারীশক্তির জয়গান শেষপর্যন্ত তিনি যেভাবে করেছেন তা অবশ্যই আধুনিকমনস্ক নয়। তাই বলে উপন্যাসের নানা জায়গায় যেভাবে পাত্রপাত্রীর মুখে লেখক তাঁর মতামত বেশ স্পষ্ট করে বলেছেন তাতে আধুনিক মননের দেখা অবশ্যই মিলেছে।

বরাক উপত্যকার পিছনে পড়ে থাকা ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের বিকাশে সেদিনকার নবযুগ যতখানি যা ছোঁয়া লাগাতে পেরেছে তাকে উপন্যাসে তুলে ধরার কৃতিত্ব তাঁর। সেই স্বীকৃতি অবশ্যই সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর প্রাপ্য। সেসব দিন আজ অতীতের গর্ভে ঠাঁই পেয়েছে তবু কিছু আছে যা চিরন্তন সত্য। মানব প্রকৃতি তো আর বদলে যায়নি। তাতে প্রলেপ পড়েছে মাত্র। তাই পরেশ বা আরও কিছু চরিত্রকে এখনও খুঁজলে পাওয়া যাবে। এর মধ্যে যোগরানি কিছুটা ব্যতিক্রম। যদিও শেষ পর্যায়ে তার আত্মনিবেদন শিল্পরস ব্যাহত করেছে এবং আরোপিত বলে মনে হয়েছে।

■ *লেখিকা শিলচর মহিলা কলেজের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপিকা, বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক।*

রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন' ঃ পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গীর কথা

দূর্বা দেব

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের অধিকার সংকুচিত হতে থাকে। তাদের কাজকর্মে, চলনে-বলনে, কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনায় বিধিনিষেধ জারি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত বাংলার সমাজে নারীর অবস্থা ছিল স্থিতিশীল। সমাজে নারীর কর্ম নির্দিষ্ট ছিল স্বামীসেবা, সন্তানপালন এবং গৃহকর্মের মধ্যে। মন্দিরে যাওয়া বা তীর্থদর্শন ছাড়া তাদের বাইরে যাবার প্রয়োজনই হত না। কারণ পিতৃতান্ত্রিক সমাজে নারী পুরুষের সম্পত্তি, ভোগের বস্তু। তাদের কোনও অতীত নেই, ভবিষ্যৎ নেই, স্বপ্ন নেই, কল্পনা নেই। তাই তো প্রয়োজনে নারীকে ব্যবহার করা হয়েছে, আবার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে পরিত্যাগ করতেও দ্বিধা হয়নি। সেই সঙ্গে ছিল মনুর বিধান আর শাস্ত্রীয় রীতি নিয়মের বেড়াজালে আবদ্ধ করে মেয়েদের অবদমনের চেষ্টা। ছিল সতীদাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, গঙ্গাসাগরে মেয়ে বিসর্জন ইত্যাদি সামাজিক কুপ্রথা। মূলতঃ নারীসমাজকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে আবদ্ধ রেখে নারীদমনই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। আর তাই সমাজের দৃষ্টিতে নারীশিক্ষাও ছিল নিষিদ্ধ। এর পেছনে যুক্তি হল ঃ

(১) শাস্ত্রে স্ত্রীশিক্ষার উল্লেখ নেই।

(২) শিক্ষা যেহেতু অর্থোপার্জনের নিমিত্ত, তাই নারীর শিক্ষার প্রয়োজন নেই।

অন্যদিকে স্ত্রীশিক্ষার কুফল হল —

(১) শিক্ষিত নারী বিধবা হবে।

(২) শিক্ষার ফলে নারী ব্যভিচারী হয়ে উঠবে এবং গুরুজনদের অবজ্ঞা করবে।

নবযুগের মনীষীরা সেই রুদ্ধ কারায় আলো আনতে সমবেতভাবে সচেষ্ট হলেন। তাদের সেই চেষ্টা পুরোপুরি ব্যর্থ হল না। অন্ধকার কক্ষে সামান্য আলোর ঝলকানি নজরে এল। মেয়েরা জ্যান্ত মরার হাত থেকে রেহাই পেলেন। রামমোহন নারীকে দিলেন প্রাণ, আর বিদ্যাসাগর দিলেন জীবন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্ত্রীশিক্ষার জন্য আন্দোলন শুরু হয়। রক্ষণশীল ব্যক্তিবর্গের বিরোধিতার মধ্যেই অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের চেষ্টা চলতে থাকে। অন্তঃপুরের স্ত্রীশিক্ষাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

ক) দেশীয় ব্যক্তিগণ কর্তৃক অন্তঃপুরে প্রচলিত শিক্ষা

খ) খ্রিস্টান মিশনারিদের প্রচেষ্টা

গ) ব্রাহ্মসমাজ ও শিক্ষিত ব্যক্তিদের চেষ্টা

ঘ) সরকারের ভাবনা

আলোর জগতে সন্ধান পাবার পর মেয়েরা বন্দিজীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চাইলেন, জগৎ ও জীবনকে দেখতে আগ্রহী হলেন, জানতে ইচ্ছুক হলেন জীবনের চারপাশকে। সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শুধু মনোভাবেই পরিবর্তন আসেনি, সেইসঙ্গে নারীর জীবনের সমস্যাতেও এল পরিবর্তন। তাই মেয়েদের পরিচয়, তাদের সমস্যা, তাদের অভিযোগ, তাদের যন্ত্রণা মেয়েদের লেখায় যেভাবে আসে, পুরুষদের লেখায় সেভাবে আসতে পারে না;

কারণ পুরুষের দৃষ্টিতে সে 'অপর', তার অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-যন্ত্রণা থাকতে নেই। কিন্তু সে সময়ে ক'জন মেয়েই বা লিখতে চেয়েছিলেন, অধিকাংশের ভাবনাই প্রকাশের সুযোগ পায়নি, হয়তোবা নারীসুলভ লজ্জায়, হয়তোবা সমাজ-সংসারের বাঁধায়। অবশ্য ঠাকুরবাড়ি বা অভিজাত পরিবারের মেয়েরা এক্ষেত্রে ছিলেন ব্যতিক্রম। যাঁরা নিজের চেষ্টায় বা স্বামীর উৎসাহে লেখাপড়া শিখেছিলেন তাঁরাও বই লেখার উদ্দেশ্য নিয়ে নয়, শিখেছিলেন অন্তর্নিহিত এক তাড়নাতে।

প্রতিটি জীবনই তো সুখ-দুঃখ, আলো-অন্ধকার, আশা-নিরাশা, আনন্দ-বেদনা, ভয়-ভাবনার উপাখ্যান। কিন্তু উনিশ শতকে বাঙালি মহিলাদের মধ্যে কয়েকজনই নিজেদের কথা লিখে রেখে গেছেন। একান্ত নিজস্ব হয়তোবা একান্তই আত্মমুক্তির তাড়নায় আপন আনন্দে লেখা ব্যক্তিবিশেষের অর্জিত এ অভিজ্ঞতা আজ সমাজ ইতিহাসের মূল্যবান দলিল। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো, ওঁরা সবাই আত্মকাহিনি লিখেছেন পরিণত বয়সে, জীবনের দিকে পিছন ফিরে তাকিয়ে। অনেক স্মৃতিই তখন তাদের কাছে ধূসর। তার মধ্যেও কিন্তু শেষ পর্যন্ত থাকেনি তাদের দীর্ঘশ্বাস। এদিক দিয়ে রাসসুন্দরীর আত্ম-প্রতিবিম্ব সমাজ ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে বিবেচিত।

আত্মজীবনী আসলে আত্মবিনির্মাণ (Self-deconstruction), নিজের পরিচিত তথ্যের সাহায্যে নিজেরই অজ্ঞাতপূর্বপরিসরের পুনর্নির্মাণ, 'পাশ্চাত্যের আমি'র অনুসন্ধান। তাই বলে আত্মজীবনী শুধুমাত্র অতীত স্মৃতির রোমন্থনই নয়, হওয়া আর হয়ে ওঠার দ্বিবাচনিক প্রক্রিয়ার প্রতিবেদন। সেখানে সমসাময়িক সমাজের সঙ্গে মানুষ তার ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক সম্বন্ধের ছবি খুঁজে নিতে আগ্রহী হয় — যে ছবি সে রেখে যেতে চায় পরবর্তী প্রজন্মের কাছে, নিজেকে তুলে ধরতে চায় উত্তরসূরিদের কাছে অথবা শুধুই আত্মতৃপ্তির জন্যে।

মেয়েদের বিভিন্ন চিন্তাভাবনা, বিভিন্ন লেখা থেকে মেয়েদের সম্পর্কে সংসার তথা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মেয়েরা উপলব্ধি করেন, তাদের জীবন শুধুমাত্র সংসার, স্বামী, সন্তান আর রাঁধার পর খাওয়া, খাওয়ার পর রাঁধার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, জীবন আরও অনেক বড়, আরও অনেক কিছু। সমাজ এবং আরোপিত সংস্কারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেননি কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে শুরু করেছিলেন তাঁরা, বাধা-বিপত্তি প্রতিকূলতাকে অতিক্রম করে লেখাপড়া শিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। কিন্তু অনেকেই জীবনের কঠোর সত্য উচ্চারণ করতে পারেননি, হয়তোবা সে অধিকার বা সাহস তাদের ছিল না। এ ব্যাপারে ডঃ তপোধীর ভট্টাচার্যের অভিমত ঃ

> *"নারী রহস্যময়ী, এই ওড়নার আড়ালে রয়ে যায় তাঁর নিভৃত আবেগ, একান্ত গোপন অনুভূতি। সামাজিক ও রাজনৈতিক বাঁধানিষেধ অস্বীকার করে নারী তার শারীরিক অস্তিত্বের বিচিত্র ও জটিল অভিজ্ঞতাগুলো প্রকাশ করতে পারে না। সব সত্য উচ্চারণের অধিকার তার নেই।"*

সত্যিই তাই। অধিকাংশ নারীই নিজেদের পুরোপুরি উন্মুক্ত করতে পারেননি। একান্ত ব্যক্তিগত ভাবনা-চিন্তা লিপিবদ্ধ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন, সহজাত কুণ্ঠাই সেখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

প্রতিটি জীবনই অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। ব্যক্তির অর্জিত অভিজ্ঞতা সমাজ ইতিহাসের

মূল্যবান উপাদান। কেননা সমকালীন সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে ঘটনা পরম্পরার মধ্য দিয়ে ব্যক্তির একান্ত উপলব্ধি সেই ব্যক্তিবিশেষের চোখ দিয়েই ধরা পড়ে। আর সেই বিশেষ ব্যক্তিটি যদি হন নারী তাহলে তিনি যেমন সংখ্যালঘুত্বের দাবিতে গুরুত্ব লাভ করেন সেই সঙ্গে আমরাও আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠি, অন্দরমহলের আন্তরিক তথ্য বা চিত্র জানার জন্য। কারণ আমাদের সমাজে নারীর স্থান বিশেষ একটা গন্ডির মধ্যে। সমাজের অনুশাসন নারীকে করে তোলে কূপমন্ডূক। ফলে বর্হিজগৎ তার কাছে হয়ে ওঠে অচেনা, অজানা। এমতাবস্থায় স্বাধীন মতপ্রকাশে অথবা কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থেকেও নারী থাকে পুরোপুরি বঞ্চিত। তাদের জীবন অতিবাহিত হয় অন্দরমহলের ঘেরাটোপে সাংসারিক কাজকর্ম ও সন্তান পালনের মধ্যে, আর আঁতুরঘর থেকে রান্নাঘরের মধ্যে আবদ্ধ থাকে তাদের বিচরণ ক্ষেত্র। এদিক দিয়ে রাসসুন্দরীর লেখা আত্মজীবনী মূল্যবান রচনা হিসেবে বিবেচিত এবং স্বীকৃত।

রাসসুন্দরীর জন্ম ১২১৬ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮০৯ খ্রিঃ। সংস্কার আন্দোলনের সূচনা পর্বেরও আগের মহিলা তিনি; কলকাতায় তখন মেয়েদের স্কুল খোলার আয়োজন চললেও সেই শিক্ষা আদায়ের দাবি মেয়েদের কণ্ঠে শোনা যায়নি। অন্যদিকে মিশনারিদের উদ্যোগে পোতাজিয়ায় বাংলা মাধ্যমে ছেলেদের একটি পাঠশালা খোলা হয়েছে। রাসসুন্দরীর পৈতৃক বাড়িতেই ছিল সেই পাঠশালা। তাকে অবশ্য সেকালের অন্যান্য মেয়েদের মতোই জীবন কাটাতে হত—সে কথা তিনি বলেছেন —

"তখন সে একদিন ছিল, এখনকার মত ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখিত না। বাঙ্গালা স্কুল আমাদের বাটীতেই ছিল। আমাদের গ্রামের সকল ছেলে আমাদের বাটীতেই লেখাপড়া করিত।"

পরে ঘটনাচক্রে আট বছর বয়সে গুরুজনদের আদেশে বাড়ির সেই পাঠশালায় মেমসাহেব শিক্ষিকার কাছে বসে থাকার সুযোগ আসে। অবশ্য এই আদেশে লেখাপড়া শেখানোর জন্যে নয়, নিজেদের কাজকর্মের সুবিধার জন্য। তাকে সমস্ত দিনই বাড়ির বাইরে ঘাগরা ও উড়ানী পরিয়ে রাখা হত, মধ্যে স্নান আহার করিয়ে পুনরায় সেখানে রেখে আসা হত, পরে সন্ধ্যার পূর্বে বাড়িতে আনা হত। পরিধেয় অঙ্গবস্ত্রে রাসসুন্দরীর পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গের উদারতা ও ভয়হীনতার পরিচয় পাওয়া গেলেও পড়াশুনার ক্ষেত্রে তারা কোনও অগ্রণী ভূমিকা নিতে পারেননি। হতে পারে সামাজিক রীতি নিয়মকে অতিক্রম করা সম্ভব হয়নি। হতে পারে এ ক্ষেত্রে তাদের আন্তরিক তাগিদও ছিল না। পাঠশালায় তার সামনেই ছেলের দল অক্ষর মাটিতে লিখে, সুর করে পড়ার অভ্যাস করত—

"তখন ছেলেরা ক খ চৌত্রিশ অক্ষর মাটিতে লিখিত, পরে এক নড়ি হাতে লইয়া ঐ সকল লেখা উচ্চৈঃস্বরে পড়িত।"

তাদের পড়া শুনে রাসসুন্দরী সকলের অজান্তেই কিছুটা আয়ত্ত করলেন। সেই সঙ্গে 'পারসী' (ফার্সি)ও কিছুটা আয়ত্তে এল। কিন্তু কাউকে তা জানানোর প্রয়োজন বোধ করলেন না তিনি, পোষণ করে রাখলেন মনের গোপন কোণে। এ পরিবেশ, পরিস্থিতিই রাসসুন্দরীর পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করে এবং জনান্তিকে মোটামুটি অক্ষর পবিচয় হয়ে যায়। কিন্তু অসীম অধ্যবসায়ে পড়তে শিখলেও দীর্ঘদিন লিখতে পারেননি তিনি। তারপর নিতান্ত পুত্রের ইচ্ছেতেই

তিনি নাকি লেখার অনুশীলন আরম্ভ করলেন। পুত্র এখানে উপলক্ষ মাত্র। তার নিজের অদম্য আগ্রহই তাকে সমস্ত প্রতিকূলতার মধ্যেও অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছুতে অনুপ্রাণিত করেছে। পুত্রের লেখা তালপত্রের সঙ্গে মনের অক্ষরের যোগ করে, আবার লোকের কথার সঙ্গে মিলিয়ে দিনের পর দিন মনে মনে পড়ার চেষ্টা করতেন তিনি। ফলস্বরূপ চৈতন্য ভাগবত গুণগুণ করে পড়তে শেখা। আসলে প্রান্তিকায়িত 'অপরসত্তা' হিসেবে নিজের ইচ্ছে প্রকাশ করার মতো সাহস তার ছিল না— *'মনের কথা প্রকাশ করা দূরে থাকুক, কেহ জানিবে বলিয়া ভয়ে প্রাণ কাঁপিত'।* — তাই পুত্রের ইচ্ছের আড়ালে নিজের আগ্রহের আতিশয্যকে লুকিয়ে রাখতে, নিজের দায়বদ্ধতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছেন তিনি। আত্মজীবনী ব্যক্তির বোধ, চেতনা, উপলব্ধি, অনুভূতির উপর নির্ভরশীল। যেহেতু আত্মজীবনীতে সত্যকে অপ্রিয় করার প্রতিশ্রুতি থাকে তাই আত্মজীবনী লেখা যথেষ্ট দুরূহ। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক গিবন লিখেছেন —

> *"Truth naked unblushing truth, the first virtue of more serious history, must be the sole recommendation of this personal narrative."*

রাসসুন্দরীর বাসনা ছিল,'লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব'—কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকে কোনও মেয়ের লেখাপড়া শেখার সাধ থাকলেও সাধ্য ছিল না, অধিকারও ছিল না। অনেক কিছুর মতো লেখাপড়ার ক্ষেত্রেও রক্ষণশীল সমাজের বিরোধিতাই ছিল সবচাইতে বড় প্রতিবন্ধক। অন্য সবকিছু মেনে নিলেও শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে রাসসুন্দরী কিন্তু এই সর্বজনীন বিরোধিতাকে মানতে পারেননি। বলেছেন—

> *"তখনকার লোকে বলিত, বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবেক। এতকাল ইহা ছিল না, একালে হইয়াছে। এখন মাগের নামডাক, মিনসে জড়ভরত, আমাদের কালে এত আপদ ছিল না। এখন মেয়ে রাজার কাল হইয়াছে। দিনে দিনে বা আর কত দেখিব। এখন যেমত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।"*

শিক্ষার ফলে মেয়েরা রাজা হয়ে বসবে — লক্ষণীয় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে ভীতি সমাজে বর্তমান ছিল। সাধারণ লোকের আশঙ্কা ছিল শিক্ষার ফলস্বরূপ মেয়েরা বিধবা হবে, সেই সঙ্গে পারিবারিক বিশৃঙ্খলাও দেখা দিতে পারে। কবি ঈশ্বর গুপ্ত লেখাপড়া জানা মেয়েদের যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তাতো সমাজে বসবাসকারী এক বিরাট অংশেরই ভাবনা-চিন্তা-মানসিকতার প্রতিফলন। এমনকী শিক্ষিত মহিলাদের সংস্পর্শ থেকে পরিবারকে রক্ষা করার জন্য *'কুলকামিনীগণ আপনাদিগের তনয়া ও সুসাগগণকে সাবধানপূর্বক রক্ষা করিতেন। যেমন প্রসূতিগণ স্বীয় সন্তানগণকে ডাইন যোগিনী প্রভৃতির নিকটে যাইতে পুনঃপুনঃ নিষেধ করেন, তেনানি ইহারাও উহাদিগকে দর্শন করিলে আস্তে আস্তে আত্মরক্ষা করিতে যত্নবতী হইতেন।'* এই ভয়েই জ্ঞানদানন্দিনীর মা লেখাপড়া করেছেন গভীর রাত্রে লুকিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে। মেয়েদের লেখাপড়া থেকে এভাবে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কৈলাসবাসিনী দেবী সরাসরি দোষারোপ করেছেন পুরুষ সমাজকে আর গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কারের 'স্ত্রীশিক্ষা বিধায়ক' গ্রন্থে দুই স্ত্রীলোকের কথোপকথন অংশে উত্তরদাত্রী স্ত্রীলোকটি দায়ী করেছেন 'গতর

শোগা মাগি'দের অর্থাৎ অলস প্রকৃতির মেয়েদের।

এমনকী বয়স্ক মহিলাদের কথাবার্তাও শিক্ষাদীক্ষার সপক্ষে ছিল না, তারও প্রমাণ মিলেছে রাসসুন্দরীর লেখায়—

"বাস্তবিক মেয়েছেলের হাতে কাগজ দেখিলে সেটি ভারি বিরুদ্ধ কর্ম্ম জ্ঞান করিয়া, বৃদ্ধা ঠাকুরাণীরা অসন্তোষ প্রকাশ করিতেন।"

দেখা যায়, নির্দিষ্ট একটা বয়সের পর মেয়েরা যেন পুরুষের প্রতিনিধি হয়েই অত্যাচারের দণ্ড হাতে তুলে নিয়েছিলেন। হয়তোবা ভেবেছিলেন এতেই হবে কৃষ্টিরক্ষা। মহিলারাও স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কথা বলতেন। শুধু স্ত্রীশিক্ষা কেন, নারীর যাবতীয় শৃঙ্খল অটুট রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন তাঁরা। কারণ অন্দরমহলের শাসনকর্ত্রী তো ছিলেন তাঁরাই।

রাসসুন্দরী রক্ষণশীল পরিবারের গৃহবধূ। পিতৃতান্ত্রিক প্রতাপ ও আকাঙ্ক্ষার নিগড়কে নিগড় বলে বোধ হয়নি তাঁর বরং নিয়ম বলে মেনে নিয়েছেন তিনি। একমাত্র পুঁথি পড়ার আকাঙ্ক্ষা দমন করা সম্ভব হয়নি বলেই নীরবে, নিভৃতে গভীর গোপনে সে চেষ্টায় রত হয়েছেন। অবশ্য এর পেছনে ছিল ভীতি ও আকাঙ্ক্ষার নিরন্তর দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত রাসসুন্দরীর অপরিসীম একাগ্রতা। তিনি বলেছেন,'পুঁথি পড়াশুনাই নয়, নতুন যুগের নতুন দিনের চিন্তা-চেতনা, ভাব-ভাবনায় রাসসুন্দরী প্রান্তিকায়িত নারীবর্গের প্রতিনিধি হয়ে নারীসত্তার নতুন দিনের স্বপ্নপূরণের দাবিদার।

রাসসুন্দরীদেবীরও লেখাপড়া শেখার পেছনে ছিল ঐকান্তিক চেষ্টা। রান্নাঘরের হেঁসেল কাঁচামাটির দেওয়ালে আবদ্ধ ছিল। তার উপর কাষ্ঠশলাকা দিয়ে তিনি অক্ষর লেখার চেষ্টা করতেন এবং 'রন্ধন শেষে গোময়মিশ্রিত মৃত্তিকার লেপ দিয়া তাহা ঢাকিয়া দিতেন'। আত্মবিশ্বাস ও ইচ্ছাশক্তির দ্বারা যে অসম্ভবকেও সম্ভব করে তোলা যায় তার যথার্থ প্রমাণ রয়েছে রাসসুন্দরী ও রামাসুন্দরীর জীবনে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েদের বিভিন্ন রচনা, তাদের চিন্তাভাবনা থেকে মেয়েদের সম্পর্কে সংসার তথা সমাজের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাসসুন্দরী সমাজকে দায়ী করেননি, নিজের সময়ের সঙ্গে পরিবর্তিত সময়ে মেয়েদের সুযোগসুবিধা দেখে আহ্লাদিত হয়েছেন —

"এখনকার মেয়েছেলেগুলা যে নিষ্কণ্টকে স্বাধীনতায় আছে, তাহা দেখিয়াও মন সন্তুষ্ট হয়। এখন যাহার একটি মেয়েছেলে আছে, সে কত যত্ন করিয়া লেখাপড়া শিখায়।"

আমরা জানি, ১৮৬০সনের আগে স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে বেথুন স্কুল ছাড়া বিশেষ কিছু ছিল না। ১৮৬১ থেকে দেশীয় প্রচেষ্টা শুরু হল। ১৮৬২ সনে অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা নামে একটি সভা স্থাপিত হল। ফলে মেয়েরা বিয়ের আগে এবং পরে অন্তঃপুরে বসে শিক্ষার সুযোগ লাভ করল।

১৮৬৮ খ্রিঃ সেসব মেয়েছেলেদের দেখে রাসসুন্দরী ঈর্ষান্বিত হননি বরং খুশি হয়েছেন, আনন্দিত হয়েছেন। যদিও খুব কম সংখ্যক মেয়ের ভাগ্যেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ ঘটেছে। তথাপি মানসিকতার পরিবর্তন যে হতে চলেছে তাই তার কাছে অসামান্য রূপে ধরা পড়েছে।

রাসসুন্দরী লিখেছিলেন আত্মজীবনী, যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন নিজের

ব্যক্তিসত্তার অস্তিত্বকে। আর এজন্যে নতুনভাবে নির্মাণ করতে হয়েছে নিজেকে। তাই তো আত্মজীবনী আত্মবিনির্মাণের নামান্তর। কিন্তু হঠাৎ করে কেনই বা রাসসুন্দরী আত্মজীবনী লিখতে গেলেন, সে সম্পর্কে বিশেষ কোনও কারণ উল্লেখ করেননি। ভাবতে অবাক লাগে, জীবনের প্রান্তবেলায় দাঁড়িয়ে আত্মস্মৃতি লেখার পেছনে সত্যিই কি নিজস্ব মনের তাগিদ ছাড়া অন্য কোনও কারণ ছিল না? হতে পারে সমাজের রীতিনীতি ও আচার আচরণ নারীর স্বাধীন চিন্তা-ভাবনা, চলন-বলন, কথাবার্তায় যে কঠোর বিধিনিষেধ বাধ্যতামূলকভাবে আরোপ করেছিল, আজীবন যা থেকে বাস্তবিক মুক্তি সম্ভব হয়নি, পরিণত বয়সে এসে রাসসুন্দরী তারই বিরুদ্ধাচরণ করতে কলম তুলে নিয়েছিলেন হাতে।

ভাবতে অবাক লাগে কলুর বলদের মতো নিঃশব্দে যিনি সংসার সমুদ্রে নিজেকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন, ঘেরাটোপের আড়ালে 'কর্মহীন, গর্বহীন, দীপ্তিহীন সুখে' যিনি জীবন কাটাচ্ছিলেন, তার প্রকাশ্যে বা উচ্চস্বরে গান করার স্বাধীনতা পর্যন্ত ছিল না। নারীজীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা সাংঘাতিক শব্দ। কারণ তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা থাকতে নেই। সে ভাবলেশহীন পুতুলমাত্র। পিতৃতন্ত্রের পেষণে অতি সম্ভাবনাময় জীবনও নিষ্পিষ্ট হয়, তারই প্রমাণ এই নির্বাক, প্রতিবাদহীন গৃহবধূ। দিনের পর দিন সমাজের অনুশাসন তাকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। নারীত্ব, মাতৃত্বের চিহ্নায়ক পরিচয়ের ঘূর্ণাবর্তে সে আবদ্ধ হয়ে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রও 'প্রাচীনা ও নবীনা'য় বলেছেন—

> *"পুরুষ প্রভু, স্ত্রী দাসী, স্ত্রী জল তুলে, রন্ধন করে, বাটনা বাটে, কুটনা কোটে। বরং বেতনভোগী দাসীর কিঞ্চিৎ স্বাধীনতা আছে, কিন্তু বণিতা দুহিতা স্বসার তাহাও ছিল না।"*

রাসসুন্দরী তাই বলেছেন, প্রকাশ্যে নয়, *'আমি গোপনে গোপনে গানও করিতাম'*— যেন আত্মমুক্তির ক্ষীণ প্রয়াস। তাঁর গানের চর্চা সীমাবদ্ধ ছিল ক্ষুদ্র গৃহকোণের গভীর গোপন মনের মণিকোঠায়। মনে হয়, গান সম্পর্কে তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য। বিশেষ করে রাগসঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। যার প্রমাণ রয়েছে ষোড়শ রচনা এবং রামদিয়ায় ১২৮০ সালের জ্বরের বর্ণনা সংক্রান্ত কবিতাটিতে। উল্লেখ্য যে, প্রথমটিতে 'জঙ্গলা' রাগ ও 'একতালা' তাল এবং দ্বিতীয়টিতে 'ধানশী' রাগ ও 'খেমটা' তালের নাম রয়েছে। রাগ ও তাল সম্পর্কিত জ্ঞান যাঁর আছে, নিঃসন্দেহে তাঁকে সঙ্গীতকলার যথার্থ বোদ্ধা বলা যায়। এছাড়াও হস্তশিল্পেও তিনি ছিলেন যথেষ্ট সুনিপুণ। কিন্তু উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার অভাব হেতু তার প্রতিভার যথার্থ স্ফুরণ ঘটেনি। নারীর সত্তা, বাচন, চেতনার উপর পুরুষতন্ত্রের একচেটিয়া মনোভাবেই নারীর বহুজ্ঞতার যথার্থ বিকাশ সম্ভব হয়নি। বস্তুত 'সামাজিক যাঁতাকলে পিষ্ট হওয়া নারী নামধারী' অধিকাংশ ব্যক্তির সত্তা বাতিল করে দেওয়া হত। ধ্বংস করে দেওয়া হত তাদের সম্ভাবনা, তাদের প্রতিভা, তাদের আকাঙ্ক্ষা।

রাসসুন্দরীর বিয়ে হয় বারো বৎসর বয়সে, ফরিদপুর জেলার জমিদার সীতানাথ সরকারের সঙ্গে। *'সেই হইতে আমি আমার পিত্রালয়ের অতুল স্নেহ হইতে বঞ্চিত হইয়া সম্পূর্ণভাবে পরাধীনা হইয়াছি।'* যে বিবাহে প্রেম নেই শুধু অভ্যাস আছে, তাকে শৃঙ্খল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। বিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা রাসসুন্দরী কখনও শোনেননি। তাই হয়তো 'বিবাহ' অনুষ্ঠানটির সঙ্গে তার পরিচয় ছিল না। *'সকল লোকেই বলিত যে, সকলেরি*

বিবাহ হইয়া থাকে, কিন্তু বিবাহের বিবরণ কি তাহা আমি বিশেষ কিছু জানিতাম না; বিবাহ হয় এই মাত্র জানি'— বলেছেন রাসসুন্দরী। রাসসুন্দরীর পরিবার হয়তো মর্যাদাসম্পন্ন ছিলেন— 'ভদ্রকুলোদ্ভবা আমি' — তাই বিবাহ বা শ্বশুরবাড়ি সম্বন্ধে রাসসুন্দরীর কোনও ধারণাই গড়ে ওঠেনি। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী মেয়েদের বিয়ে হত অল্প বয়সে, যখন তাদের কাছে বিবাহ স্বপ্ন বলে মনে হত। একটি মেয়ের পৃথক সত্তার অস্তিত্ব কেউই স্বীকার করত না—সমাজ, সংসার, স্বামী। 'অন্তঃপুর' মাসিক পত্রিকার 'নববধূ' প্রবন্ধের একজায়গায় আছে—

> *"আমাদের হিন্দু পরিবারে বাল্যবিবাহ প্রচলিত সুতরাং নববধূ অল্পবয়স্কা হইয়া থাকে। প্রথমাবধি তাহাকে সদ্ব্যবহারের দ্বারা সন্তানতুল্য পালন করিলে, বধূ ঠিক তদনুযায়ী কন্যাতুল্য হইয়া উঠে, কিন্তু অতিশয় দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, অধিকাংশ ঘরে বধূকে নিদারুণ যাতনা দেওয়া হয়।"*

কিন্তু রাসসুন্দরী সেই 'অধিকাংশ ঘরের বধূ' ছিলেন না। তিনি শাশুড়ীর অপরিমিত স্নেহ, আদরযত্ন লাভ করেছেন। ভেবেছেন— *'কৌশলের বালাই লইয়া মরি। কোন গাছের বাকল কোন গাছে লাগিল।'*

শ্বশুরবাড়িতে যাবার প্রাক্কালে রাসসুন্দরী নিজের মনের অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> *"যখন দুর্গোৎসবে কি শ্যামাপূজায় পাঁঠা বলি দিতে লইয়া যায়, সে সময়ে সেই পাঁঠা যেমন প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া হতজ্ঞান হইয়া মা মা মা বলিয়া ডাকিতে থাকে, আমার মনের ভাবও তখন ঠিক সেই প্রকার হইয়াছিল।"*

হিন্দুবিবাহে কন্যাকে দান করা হয় অপরিচিত এক ব্যক্তির হাতে। আসবাব, বাসন সহ আনুষাঙ্গিক অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে পিতা কন্যাকে দান করেন নিঃশর্তভাবে। সামগ্রীর মতো কন্যাও প্রাণহীন বস্তু, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছা, কামনা-বাসনা কিছুই নেই। সেদিক দিয়ে তাকে স্থানান্তরিত করাও খুবই সহজ। আজম্মকাল যে পরিবেশ-পরিজনে সে লালিত, বিবাহ পরবর্তী জীবনে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে যায় দূরত্বের, আপনার জন হয়ে ওঠেন শ্বশুরবাড়ির স্বজনেরাই। এছাড়া বিবাহকেন্দ্রিক আরোপিত বিভিন্ন রীতি সমাজপতিদের অমানবিক মনোভাবের প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। যন্ত্রণা থেকে শান্তি তথা মুক্তি দেয় সময়। কিন্তু রাসসুন্দরীর এ যন্ত্রণার উপশম বৃদ্ধবয়সেও হয়নি ঠিকই কিন্তু এর অন্তর্নিহিত নিষ্ঠুরতার চিত্রটি স্পষ্ট উপলব্ধি করতে পেরেছেন তিনি। পৈতৃক বাড়িতে যে মেয়ের অবাধ বিচরণ ছিল, তাকেই বিয়ের পর শ্বশুরবাড়িতে যথেষ্ট বিধিনিষেধের মধ্যে চলাফেরা করতে হয়েছে। *'সব ব্যাপারে বৌদিগের কর্মের রীতি ছিল। আমি ঐ রীতিমতেই চলিতাম'*— বলেছেন রাসসুন্দরী। সেই রীতির বর্ণনা দিতে গিয়ে রামসুন্দরী আমাদের জানিয়েছেন —

> *"বিশেষত তখন মেয়েছেলের এই প্রকার নিয়ম ছিল, যে বৌ হইবে, সে হাতখানেক ঘোমটা দিয়া ঘরের মধ্যে কাজ করিবে, আর কাহারও সঙ্গে কথা কহিবে না, তাহা হইলেই বড় ভাল বৌ হইল। সেখানে এখনকার মতো চিকণ কাপড় ছিল না, মোটা কাপড় ছিল। আমি সেই কাপড় পরিয়া বুক পর্য্যন্ত ঘোমটা দিয়া সকল কাজ করিতাম। ..... সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মত দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোন দিকে দৃষ্টি চলিত না।"*

এই বন্দিদশার জন্যই হয়তোবা স্বামীর ঘোড়ার সামনে বেরুতেও তিনি লজ্জাবোধ করেছেন— 'কি করি কর্তার ঘোড়া পাছে আমাকে দেখে' অথবা *'কর্তার ঘোড়ার সম্মুখে আমি কেমন করিয়া যাই, ঘোড়া যদি আমাকে দেখে, তবে বড় লজ্জার কথা'।* ঊনবিংশ শতাব্দীতে মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা না হলেও পুরুষের সামনে বেরুনো রীতি বিরুদ্ধ ছিল। অপরিচিত পুরুষকে দেখে আত্মগোপন করাই ছিল লজ্জাশীলতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। পর্দা বা আবরুর বাড়াবাড়ি তখনকার সমাজের মেয়েদের খাঁচায় বদ্ধ পাখির অবস্থায় নিয়ে ফেলেছিল; ইচ্ছে থাকলেও সামান্য একটু ডানা ঝাপটাবার অবকাশ তাঁরা পাননি। পর্দা প্রথার এই বাড়াবাড়ি তখনকার দিনের প্রগতিশীল পরিবার জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেও কিছুটা ছিল। ঠাকুরবাড়ির মেয়েরা বৎসরে একদিন ছাদে ওঠার সুযোগ পেতেন; সেদিনটা হল বিজয়াদশমী। সত্যেন্দ্রনাথ যেদিন সস্ত্রীক ইংলণ্ড থেকে আসেন 'সেদিন বাড়ীতে যে শোকাভিনয় ঘটিয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত'। আর কৃষ্ণভামিনী দাসী তো স্বামীর সঙ্গে ইংলণ্ড থেকে ফিরে আসার পর *'কন্যার সঙ্গে আর সম্বন্ধ রইল না। কন্যাকে তাহার নিকট কেহ পাঠাইল না। দূর হইতে একবার দেখিতে চাহিলেও কন্যার শ্বশুর বা জামাতা কেহ দেখিতে দিল না'*— পিতৃতন্ত্রের প্রতাপ এতই সর্বগ্রাসী যে এর দহনে শত-শত জীবন ছারখার হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞানদানন্দিনী, কৃষ্ণভামিনী আরোপিত জীবন থেকে ইপ্সিত জীবনে পৌঁছুতে পারলেও এর জন্যে তাদের কম লাঞ্ছিত হতে হয়নি, এমনকী কালাপানি পার হওয়া কৃষ্ণভামিনীকে হারাতে হয়েছেও অনেককিছু, যার জন্যে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তিনি সারাজীবন ধরে।

মায়ের অসুস্থতার খবর জেনেও রাসসুন্দরীর পক্ষে শেষ দেখা বা মায়ের সেবা করা সম্ভব হয়নি, এজন্যে তিনি নিজের জীবনকে ধিক্কার দিয়েছেন। এ ধিক্কার মূলত তার নারী জন্মকে ধিক্কার —

> *"আমি যদি পুত্রসন্তান হইতাম, আর মার আসন্নকালের সম্বাদ পাইতাম, তবে আমি সেখানে থাকিতাম, পাখীর মত উড়িয়া যাইতাম। কি করিব, আমি পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী।"*

এ যেন দহনচক্রে বন্দিনী এক নারীর নিঃশব্দ আর্তি। তথাপি এ ঘটনার জন্য কাউকে দোষারোপ করেননি তিনি, সর্বত্রই দায়ী করেছেন নিজের নারী জীবনকে। নিজেকে তিনি বারবারই বলেছেন *'পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গী', 'তাহাদের পোষাপাখী', 'পিঞ্জরেতে পাখী বন্দী জালে বন্দী মীন'*— আবার কখনও তাঁর মুখে শুনতে পাই *'তিনি পরাধীনা নন'*— কেন এই পরস্পরবিরোধী আচরণ—মনে হয় ভীতা হরিণীর মতো নিজের কথা বলতে গিয়ে বারবারই আতঙ্কিত হয়েছেন তিনি; লজ্জা, সংকোচ তাঁকে অসহায় করে তুলেছে। সত্যোচ্চারণ করেও দ্বিধা দ্বন্দ্ব তাঁকে নিজের সিদ্ধান্তে শেষ পর্যন্ত কঠোর রাখতে পারেনি, পিঞ্জরে বন্দি পাখির জীবন তো স্বাধীন নয়, মুক্ত হাওয়ায় ডানা মেলে আপন মনে আকাশে উড়ে বেড়াবার স্বাধীনতা তো তার নেই। উপনিবেশীকৃত মন সত্যোচ্চারণে সত্তার কণ্ঠরোধ করে রাখতে চাইলেও অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর লেখনীতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সত্তার উপস্থিতি, তাঁর সাহসিক উচ্চারণ। তাঁর মতো আরও অনেক মহিলাই নারীজন্মের জন্য সুতীব্র আক্ষেপ করেছেন। ইসানোরা ডানকান বলেছেন—

> *"No woman has ever told the whole truth of her life. The autobiographies of the most famous woman are a series of accounts of the outword existence of petty details and*

anecdotes which gave no realisation of their real life. For the great moments of joy or agony they remain strangely silent."

কিন্তু তাত্ত্বিকদের মতে কোনও কোনও ক্ষেত্রে লেখিকার নীরবতাও কিন্তু পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে একধরনের প্রতিবাদ। স্পষ্ট করে কিছু না বলার পেছনে থেকে যায় অন্যতর বহুমাত্রিক উচ্চারণের সম্ভাবনা।

রাসসুন্দরীর রচনা থেকে জানা যায় ঘর সংসারের কাজে তিনি দিবারাত্র ব্যস্ত থাকতেন। শিশুবয়সের অসুস্থ কাকীমার সাহায্যার্থে সংসার কর্মের আসরে পদার্পণ। অপটু হওয়া সত্ত্বেও কাকীমার কর্মভার লাঘব করার জন্যে তাঁর উৎসাহের অন্ত ছিল না। নিজের পরিবারের অগোচরেই চলতে থাকে তাঁর কর্মসম্পাদন এবং অচিরেই তিনি রন্ধনকার্য সহ অন্যান্য কর্মেও পারদর্শী হয়ে ওঠেন। *"আমি গোপনে গোপনে কাজ করিয়া রাখিতাম, তাহা দেখিয়া সকলে সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে কত সোহাগ করিতেন"*— স্পষ্টতই বোঝা যায় তৎকালীন সমাজের দৃষ্টিতে গৃহকর্ম তথা সংসারকর্ম উৎসাহব্যঞ্জক, প্রশংসনীয় ছিল, কারণ তা ব্যক্তির নিজের নয়, সবার। পিতৃতন্ত্রের দৃষ্টিতে ব্যক্তি-ইচ্ছার কোনও মূল্য নেই, যা কিছু করণীয়, পালনীয় সবই বৃহত্তর স্বার্থের কথা মনে রেখেই। মেয়েদের রান্নাবান্না সহ সংসারের খুঁটিনাটি কর্মে পারদর্শী হওয়ার সুফল হল ভবিষ্যতে শ্বশুরগৃহের বিশাল বিপুল কর্মভার নিজের কাঁধে তুলে নেওয়া, সেই সঙ্গে স্বামীসহ পরিবারের সবার কাছে 'ভালো বৌ-এর' স্বীকৃতি পাওয়া।

মেয়েদের গার্হস্থ্যকর্মে পুরোদিনটি ব্যাপৃত রাখাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বনলতাদেবী লিখেছিলেন—

> *"রমণী সংসারের দাসী হইয়াও সমাজের নেত্রী, পরিবারে মহিমাময় কর্ত্রী, স্বামীর ধর্মপথের সহায় ও কার্য্যপথের উৎসাহ ও পরামর্শদাত্রী, সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ বিধাতৃ নির্দিষ্ট পালয়িত্রী ও 'শিক্ষয়িত্রী'। এই সকল গুরুতর দায়িত্ব উপযুক্তরূপে বহন করিতে পারার নামই গৃহধর্ম্মপালন।"*

অর্থাৎ নারী হবে 'সুমাতা, সুগৃহিনী, সুপত্নী'।

রাসসুন্দরীর বয়স যখন ১৪ তখন শাশুড়ি অসুস্থ ও ঠাকুরানি চক্ষুহীন হওয়ার জন্য ঘর সংসারের সবকাজ তাঁকেই করতে হত। সমাজের দৃষ্টিতে নির্বাক, ধীরস্থির, সহনশীলা, রন্ধনপটীয়সী, মিতব্যয়ী, জীবন সম্পর্কে নিস্পৃহ নারীই ছিলেন আদর্শ গৃহিণী। রাসসুন্দরীরও এ গুণগুলি ছিল। তাই নিজেকে নিয়ে ভাবনার অবকাশ ছিল কম। 'যেন মেয়েছেলের গৃহকর্ম বৈ আর কোন কর্মই নাই'। বাড়ির কর্তার জন্য একবার পরে অন্যান্য লোকের জন্য দশ বারো সের চাল পুনরায় রান্না করতে হত। এভাবেই বেলা ৩/৪টা সময় অতিবাহিত হয়ে যেত।

> *"আমি একাই দুবেলা পাক করিতে পারগ হইলাম, এবং সমুদয় কাজ করিয়া বসিয়া থাকিতাম। তখন মেয়েছেলেরা লেখাপড়া শিখিত না, সংসারে খাওয়া দাওয়ার কর্ম সারিয়া যে কিঞ্চিৎ অবকাশ থাকিত, তখন কর্তা ব্যক্তি যিনি থাকিতেন তাঁহার নিকট অতিশয় নম্রভাবে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত।"*

বাড়িতে কর্মীর সংখ্যা কম। কাজেই রাসসুন্দরীকেই দশভুজারূপে সামলাতে হত গৃহকর্ম ও সংসারকর্ম। এসব কিছুর পরও তিনি নিজেকে অসুখী মনে করেননি। প্রকাশ্যে কোনও অভিযোগ অনুযোগও করতে শোনা যায়নি। আমরা জানি *'আঘাত যত গুরুতর হোক প্রতিহত না হলে*

বাজে না'। তাঁর দিক থেকে প্রতিহত হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না অথবা গায়ে বাজলেও সমাজের অনুশাসনে তা প্রকাশের সাহস হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রচিত ছড়া থেকে বোঝা যায়, মেয়েরা ঘরসংসারের কাজকর্মকে কতটা প্রাধান্য দিত। 'বামাবোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়ার মধ্যে রয়েছে গৃহিণীর গুণাবলি সহ ঘর সংসারের কাজের তালিকা—

"হাঁড়ি হানশাল রান্না
তিন নিয়ে ঘরকন্না
পান পানি চূণ
তিন গৃহিণীর গুণ।
আসন বাসন বসন শায
লালন পালন মেয়ের কায
রাখা ঢাকা শিল্পী-কর্ম্মা
বলে গেছেন রামশর্ম্মা।"

১৮ থেকে ৪১ বৎসর পর্যন্ত রাসসুন্দরীর ১২ বার আঁতুড়ঘরে যাতায়াত। ১২ টি সন্তানের জন্মদাত্রী তিনি। প্রথম সন্তান পুত্র। গৃহবধূর কর্মপালনের সঙ্গে যুক্ত হয় সন্তান পালনের যাবতীয় কাজকর্ম। আত্মীয়-পরিজন, অতিথি-অভ্যাগতদের সেবার মধ্য দিয়ে যার দিনগুলি অতিবাহিত হতে থাকে তার মুখে কোনো বিরূপ মন্তব্য শোনা যায়নি। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন — *'বলিলেও লজ্জা বোধ হয় এবং বলাও বাহুল্য'।* স্পষ্টতই বোঝা যায় 'না বলা কথা' অনেক কিছুই রয়ে যায়, যা আমরা জানতেও পারি না। কথায়ই তো আছে 'মেয়েদের বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না'। তারা শুধু অবলাই নয়, অবোলাও বটে। রাসসুন্দরীর বাড়িতে 'সেসময় ঘরের কাজের লোক ছিল না' — কোনও সাহায্যকারীও ছিল না। বৃহৎ সংসারের দায়, নিত্য ভোগ সহকারে প্রতিষ্ঠিত দেবতার সেবা, বাড়ির বাইরের ২৫/২৬ জন দাসদাসীসহ অতিথি অভ্যাগতদের জন্য প্রতিবেলায় ১০-১২ সের চাল রান্না, ঘর-গৃহস্থালির অন্যান্য কাজ, সর্বোপরি তিন বিধবা ননদিনীর বিগ্রহতুল্য সেবা। রাসসুন্দরী হয়তোবা তৃপ্ত ছিলেন কিন্তু তিনি কি মানুষের মর্যাদা পেয়েছিলেন? না সংসারে ব্যবহৃত হয়েছিলেন প্রতিবাদহীন শ্রমশক্তি বা দাসী হিসেবে — 'সে সময় ঘরের কাজের লোক ছিল না, ঘরের মধ্যে আমি একামাত্র ছিলাম'। স্বামীগৃহে নারীকে দাসী করে রাখার বিধান তো মনুই দিয়েছিলেন —

"স্বামী ও স্বজনগণ স্ত্রীলোকদের দিবারাত্রির মধ্যে কখনো স্বাধীনভাবে থাকতে দেবেন না, কাজে ব্যস্ত রেখে সব সময় তাদের নিজেদের বশে রাখবেন।"

তাঁর কাজের পরিধি এতই বিস্তৃত ছিল যে, *'কাজের গতিকে কোনও দিবস একবার আহারও ঘটিত না'।* এমনি একদিন কাজের চাপে খাওয়া হয়নি রাসসুন্দরীর। দ্বিতীয় দিনও সারাদিন উপবাসের পর গভীর রাতে খেতে বসেছেন ছেলে কোলে নিয়ে। কারণ ছেলে কাঁদলে কর্তাটি *"কাঁদে কেন, কাঁদে কেন, বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোর করিবেন"।* কিন্তু ক্ষুধার্ত মহিলাটির সেদিনও আর খাওয়া হল না। বাড়া ভাত শিশুটির প্রস্রাবে 'ভাসিয়া গেল'—এই অবহেলা অত্যাচার নয়? বাড়ির একটি মানুষের প্রতি এই উপেক্ষা ও উদাসীনতা উৎপীড়ন নয়? বাঙালি পরিবারের এই গৃহিণীদের পরিচয় ছিল 'সর্বগুণান্বিতা দাসীরূপে'। কাফোর্ডের মতে স্বামীদের কাছে স্ত্রীর আমোদ আহ্লাদের কোনও মূল্য ছিল না। কারণ তাদের আশঙ্কা ছিল, এর ফলে স্বামীসেবা বা

সন্তানপালন জাতীয় কর্মে অধিকতব মনোযোগী না হয়ে অনীহা দেখা দিতে পারে।

মূলত এই ছিল বাঙালির অন্দরমহলের প্রকৃত চিত্র। গৃহস্থালির সমস্ত কর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার মধ্যেই গৃহিণীরা এক ধরনের আত্মসুখ অনুভব করতেন। পুরুষ শাসিত সমাজে, বয়স্কা চালিত সংসারে তাদের সুখীর অভিনয় না করেও বোধহয় কোনও উপায় ছিল না।

এই মহিলা সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন —

"..... বাঙালীর গৃহে গৃহিণীগণ কিরূপ ছিলেন, তাহার দৃষ্টান্তরূপে এই চিত্রখানি আমরা বিশ্বের দ্বারে সগৌরবে উন্মোচন করিয়া দেখাইতে পারি।"

সত্যিই কি তাই? সাংসারিক কাজের চাপে দুদিন অনাহারে থাকেন; খাওয়ার সুযোগ পর্যন্ত ঘটে না, কেউ সে খবর পর্যন্ত রাখে না, অথচ কারো প্রতি অভিযোগ অনুযোগ করেননি তিনি। বরং বলেছেন *'ও সকল কথা আমি কাহারও নিকট বলিতাম না ও কেহ জানিত না'।* এমন একজন মহিলার জীবনচিত্র কি সগৌরবে উন্মোচনের বিষয়? অতি সাম্প্রতিককালে একজন গৃহবধূর শ্রমকে আর্থিক মানদণ্ডে বিচার করা হচ্ছে, যা রাসসুন্দরীর কালে কেউ ভাবতেও পারেনি। শুধুমাত্র উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত পরিবারেই মেয়েদের উপার্জনহীনতা সীমাবদ্ধ ছিল, দেখা যায় নিম্নবিত্ত মহিলারা কিন্তু উপার্জনের বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতেন। কেউ বা গল্প বলার বিনিময়ে পেতেন চাল, ডাল, শাক-সব্জি; কেউ বা পটচিত্র অঙ্কনের দ্বারা উপার্জনের চেষ্টা করতেন। 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসেও এরকম ভেকধারী বৈষ্ণবীর সাক্ষাৎ পাই, নগেন্দ্রনাথের অন্তঃপুরে যার যাতায়াত ছিল।

রাসসুন্দরীও পটচিত্র অঙ্কনে পটু ছিলেন। তথাপি তিনি পুরোদস্তুর একজন গৃহবধূ, সংসারের অর্থোপার্জনের বিষয়ে আর কোনও ভূমিকা ছিল না। তবে তিনি যে এক্ষেত্রেও পারদর্শী হতে পারতেন, এরকম ধারণা হয়, যখন দেখি স্বামীর ঘোড়ার সামনে বেরুতে যিনি লজ্জাবোধ করতেন তিনিই তিন পুরুষ ধরে চলে-আসা মোকদ্দমার সমাধান করে ফেললেন অতি সহজেই। বুদ্ধিমত্তা ও সাহসিকতার নিদর্শন এই ঘটনা প্রমাণ করে যে, প্রয়োজনে শুধু সংসার, স্বামী, সন্তানকেন্দ্রিক অন্দরমহল নয়, বর্হিমহলের ক্রিয়াকর্মের সুষ্ঠু সমাধানও তার পক্ষে সম্ভব।

'আমার জীবন'-এর প্রথম মুদ্রণ ১২৭৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৬৮ খ্রিঃ। বাংলা সাহিত্যে 'আমার জীবন'ই প্রথম প্রকাশিত আত্মজীবনী যদিও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজীবনী প্রথম প্রকাশিত না হলেও প্রথম লিখিত আত্মজীবনী। নির্বাক, সদাসন্ত্রস্ত, সম্ভ্রান্ত ঘরের গৃহবধূ রাসসুন্দরী যিনি কিনা উপার্জনের চিন্তাও করতে পারেননি, তিনিই জীবনের শেষপ্রান্তে পৌঁছে স্বরচিত মৌলিক কর্মের মধ্য দিয়ে উপার্জনশীল হয়ে উঠলেন। আত্মজীবনীর শেষাংশে তাঁর শেষ ইচ্ছার কথা জানিয়ে উপার্জনেব ব্যয় সংক্রান্ত ব্যবস্থাবিধিও লিখে গেলেন —

"আমার এই বইখানি ছাপান হইলে ঐ বই বিক্রয় হইয়া ছাপানর দাম দিয়া পরে যে কিঞ্চিৎ থাকিবে ঐ টাকা আমানত থাকিবেক। আমার ছেলেদের ত কথাই নাই। পরে আমার বংশের মধ্যে যে থাকিবেক প্রতি বৎসর মদনগোপালের নিকট ঐ টাকা দিয়া মহোৎসব হইবেক, এই আমার প্রার্থনা।"

রাসসুন্দরী ছিলেন শঙ্কিত স্বভাবের মহিলা। তাঁর পুরো জীবন কেটেছে নিভৃত গৃহকোণে। তাই তাঁর রচনায় বৃহত্তর সমাজ অনুপস্থিত। একবার স্বামীর অবর্তমানে জমিদারি

সংক্রান্ত উদ্ভূত পরিস্থিতির মোকাবিলা করে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। যিনি স্বামীর ঘোড়াকে (জয়হরি) দেখলেই ঘোমটা টানতেন, তিনিই কিনা সীতানাথ সরকার এবং মিরালি আসুদের সঙ্গে তিন পুরুষ ধরে চলতে-থাকা মোকদ্দমার অবসান ঘটিয়ে দিলেন। নিজের ছেলেকে উপলক্ষ্য করে একটি পত্রের মাধ্যমেই দীর্ঘকালের দ্বন্দ্বের অবসান হল। রাসসুন্দরীর ভাবনা ছিল, স্বামী নিশ্চয়ই অসন্তুষ্ট হবেন *'এই ভাবিয়া আমি মৃতপ্রায় হইলাম, এমনকি ভয়ে আমার প্রাণ কাঁপিতে লাগিল'।* কিন্তু সীতানাথ সরকার পুরো ঘটনার বিবরণ জেনে 'অত্যন্ত সন্তুষ্ট' হলেন। তবে একটা ব্যাপার লক্ষণীয় যে, 'আমার জীবন' রচনার কোনও স্থানে স্বামী সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেননি তিনি। স্বামীর কথা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন — 'বাস্তবিক তিনি বেশ লোক ছিলেন'—কিন্তু এই বেশ লোকটিরই স্নান হওয়া মাত্র ভাতের দরকার—কাজেই অসংখ্য কাজের মধ্যেও তাঁকে কর্তার জন্য আলাদাভাবে রান্না করতে হত। আবার শিশু কাঁদলে 'কাঁদে কেন, কাঁদে কেন' বলে বিরক্তি প্রকাশ করবেন, এই ভয়ে শিশুকোলে নিয়েই তাঁকে খেতে হত এবং মারা গেলে 'মোলো নাকি তা যাক' উক্তি যার মুখ থেকে শোনা যেত সেই মানুষটি সম্পর্কে 'আমার জীবন' রচনার কোনও স্থানে অভিযোগ করেননি তিনি, এমনকী সামান্য অভিমানও হয়নি তাঁর। স্বামী সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বলেছেন —

> *"বস্তুত কর্তা বিশেষ বড় লোক ছিলেন, তিনি অনেক সৎকার্য করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হন। কর্তার জীবনচরিত এই যৎকিঞ্চিত লিখিত থাকিল।"*

নারীমন উপনিবেশীকৃত, তার ভাষা, ভাবনা সবই পিতৃতন্ত্রের দ্বারা অধিকৃত। রাসসুন্দরী সমাজের আধিপত্যকে, ভাবাদর্শকে মান্যতা দিয়েই লিখতে চেয়েছেন। তাই স্বামীকেন্দ্রিক আলোচনায় তিনি যেমন আগ্রহ দেখাননি। অন্যদিকে তাঁর রচনায় দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রও অনুপস্থিত। স্বামীর কাছ থেকে কোনও সাহায্য সহযোগিতা পাননি রাসসুন্দরী। মনে হয়, তিনি এরকম আশাও করেননি। ইচ্ছে করলে সীতানাথ সরকার স্ত্রীর পুঁথিপাঠে সহযোগী ভূমিকা নিতে পারতেন। তৎকালীন সমাজে স্বামী স্ত্রীকে লেখাপড়া শেখানোর ঘটনা অকল্পনীয় বা সমাজে নিন্দনীয় হলেও এরকম ঘটনা বিরল নয়। সারদাসুন্দরী বা নিস্তারিণীদেবীকে লেখাপড়া শেখানো বা শিখতে সাহায্য করেন তাদের স্বামীরাই। অথচ রাসসুন্দরীর স্বামী শিক্ষিত হলেও সহমর্মী ছিলেন না, তাঁর কাছে লেখাপড়ার কোনও গুরুত্বই ছিল না। সমাজপতিদের দৃষ্টিতে শিক্ষা যেহেতু অর্থোপার্জনের নিমিত্ত, কাজেই নারীর শিক্ষার প্রয়োজন নেই, তাঁর ধারণা তাই হয়তো ছিল। বিপিন পালও তাঁর মা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এরকমই একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন—

> *"পুরুষেরা মেয়েদের সম্বন্ধে হিংসা করত বলে যে তারা লেখাপড়া মেয়েদের শেখাত না তা নয়। লেখাপড়ার তেমন কোন মূল্য ছিল না।"*

রাসসুন্দরীর জীবনে বিস্ময়ের বিষয় মৃত্যুভাবনা। আর বিস্ময়কর ঘটনা হল, স্বামীর মৃত্যুর পর মস্তকমুণ্ডন। তিনি বলেছেন—'মৃত্যুর অধিক ফল মস্তকমুণ্ডন'। অনুশাসনের পিঞ্জরে আবদ্ধ রাসসুন্দরী জানতেন, অভিযোগ করে লাভ নেই, অভিমান করাও হবে নিরর্থক। তাই সমাজের আচার-বিচারকে নিঃশব্দে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। সেকালে স্বামী না থাকাকে মেয়েরা তাদের জীবনের চরম দুর্ভাগ্য বলে মনে করতেন—যার স্পষ্ট উল্লেখ আছে

রাসসুন্দরীর রচনায়—

"শত পুত্রবতী যদি পতিহীনা হয়
তথাপি তাহাকে লোক অভাগিনী কয়।"

তৎকালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বিধবাদের পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির গলগ্রহ হয়ে থাকতে হত। '১৮১৮ খ্রিঃ ১৩ই ডিসেম্বর হেস্টিংস তাঁর দিনলিপিতে বিধাবাদের বিবিধ দুর্ভাগ্যের কথা উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে তাদের অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয় যদি কোনও সন্তান না থাকে। আর যদি তাদের ছেলে বা মেয়ে থাকে তা হলে ছেলের বউ বা তার নিজের মেয়ে বাড়ির কর্ত্রী হয়ে বসে। বিধবার অবস্থা হয় অনেকটা দাসীদের মতো। তখন তাদের বেঁচে থাকাটাই খুব কঠোর হয়ে পড়ে'। স্পষ্টতই বোঝা যায়, অকাল বৈধব্য অনেকের জীবনে বিপর্যয় হিসেবে নেমে এসেছিল। যদিও স্বামীর মৃত্যুর পর রাসসুন্দরীকে শ্বশুরবাড়িতে লাঞ্ছিত বা নির্যাতিত হতে হয়েছে বলে জানা নেই।

নারীজীবনে অভাগিনী হবার যন্ত্রণা সবচাইতে বেশি। কারণ বৈধব্য অবস্থায় মানসিক অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে জনৈক বঙ্গ মহিলা বলেছেন —

"স্বামীসুখেই বঙ্গাঙ্গনা বেশ বিন্যাস করে। বঙ্গমহিলার সবই স্বামীময়। মন, প্রাণ, গৃহ, গৃহকর্ম্ম, আমোদ আহ্লাদ, ধন, মান, ভরণ, পোষণ, বেশবিন্যাস সবই স্বামীময়।"

আত্মজীবনীকারদের অনেকেই বিধবা হবার পর তাদের লেখায় ছেদ টেনেছেন— *'বিধবার তরে জগৎ নয়'*— কৈলাসবাসিনী স্বামীর মৃত্যুর পর সেসময়কার কথা আর লিখে রাখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল এ পৃথিবীতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। রাসসুন্দরীর কিন্তু এরকম মনে হয়নি। তাই হয়তো লিখেছেন —

"যাহা হউক, আমি তাহাতে দুঃখিত নহি, পরমেশ্বর আমাকে যে অবস্থায় রাখেন, সেই উত্তম।"

শুধুমাত্র স্বামী কেন, সাতটি সন্তানের মৃত্যুতেও তিনি ছিলেন স্থিতধী। এক জায়গায় বলেছেন— 'এ সামান্য বিপদ নহে, যাহার নাম পুত্রশোক' — আবার কখনও বলেছেন —"শোক হইলে লোক মৃত্যু ইচ্ছা করে বটে, কিন্তু মৃত্যু হয় না, মৃত্যুর অধিক ফল হয়।" সর্বাবস্থায় তাঁর আশ্রয় মাতৃপ্রদত্ত মন্ত্র 'দয়াময়'। তাই কত অনায়াস উচ্চারণে বলেছেন —

"১২ টি সন্তান তুমি সাজাইয়া তোমার যাত্রার আসরে আনিয়া আমাকে দিয়াছিলে, ছয়টি পুত্র এক কন্যা আমাকে দেখাইয়া লইয়া গিয়াছ, এক্ষণে চারিটি পুত্র এক কন্যা তোমার যাত্রার আসরে রাখিয়া আমাকে দেখাইতেছ।"

চরম দুঃখেও ঈশ্বরের মঙ্গলময় করস্পর্শ আস্তিক্যবাদী রাসসুন্দরীর অনুভূতিতে ছিল। তাই স্বামীব মৃত্যুর পরও তাঁকে দেখি মূর্তিময়ী স্থিতপ্রজ্ঞা —*"দুঃখেষু অনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহাঃ"।*

রাসসুন্দরীর রচনাতে কয়েকটি কবিতা আছে। প্রায় সবগুলোতেই রয়েছে পুঁথির অনুসরণে সংযোজিত ভণিতা, আর কবিতার বিষয়বস্তুতে রয়েছে গভীর ঈশ্বরপ্রীতি।

"চৈতন্যচরিতামৃত তরঙ্গের এক বিন্দু, তার কণা লিখে কৃষ্ণদাস।
রাসসুন্দরী মূঢ়মতি, তাহে শূন্য প্রেমভক্তি, যুগলচরণ অভিলাষ।"

উনিশ শতকের তৃতীয় দশকে হাটখোলা, বালখানা, দরজিপাড়া ইত্যাদি স্থানে বাংলা ছাপাখানা

গড়ে ওঠে। এসব ছাপাখানা থেকে যেসব বই প্রকাশিত হত, তার অধিকাংশ ছিল ধর্মগ্রন্থ, যেমন—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশিদাসী মহাভারত, চৈতন্যবিষয়ক বিভিন্ন কাব্য, ভক্তিবিলাস, পদকল্পলতিকা ইত্যাদি। মেয়েদের পঠন-পাঠনে নির্দিষ্ট ছিল শুধু ধর্মগ্রন্থ। এর বাইরে অন্য সবকিছুই চরিত্র গঠনে সহায়ক নয়—কাজেই নাটক, নভেল পড়ার অধিকার তাদের ছিল না। লক্ষণীয় যে, মুদ্রিত ধর্মগ্রন্থের অধিকাংশই বৈষ্ণবধর্ম বিষয়ক। রাসসুন্দরীর উল্লিখিত বইয়ের বেশিরভাগই বৈষ্ণবধর্ম বা চৈতন্যবিষয়ক —

"চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত আঠার পর্ব, জৈমিনিভারত, গোবিন্দলীলামৃত, বিদগ্ধমাধব, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, বাল্মীকি পুরাণ—এই সকল ঐ বাটীতে ছিল। কিন্তু বাল্মীকি পুরাণের আদিকাণ্ড মাত্র ছিল, সপ্তকাণ্ড ছিল না।"

সপ্তকাণ্ড বাড়ির সংগ্রহে না থাকলেও পরবর্তী সময়ে রাসসুন্দরীর চাহিদা মেটাতে বাল্মীকি পুরাণের সপ্তকাণ্ডের মুদ্রিত পুস্তক বাড়িতে আসে। 'আমার জীবনে' মঙ্গলকাব্যের রীতি অনুযায়ী সরস্বতীর বন্দনা গান করে শুরু করার এবং স্থানে স্থানে ভণিতা ব্যবহারের পেছনেও রয়েছে হয়তবা মধ্যযুগীয় এ সমস্ত কাব্যেরই প্রভাব।

শ্বশুরবাড়ির মদনগোপালকেই ছেলেবেলায় দয়ামাধব হিসেবে জানতেন রাসসুন্দরী। তাঁর উপস্থিতি বারবার অনুভূত হয়েছে রাসসুন্দরীর জীবনের বিভিন্ন পর্বে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিতে — *'এ প্রভু, অধমতারণ, হে করুণাময় বিপদভঞ্জন হরি, তোমার দয়ার তুলনা নাই।'* আর জীবন সায়াহ্নে এসেও তাকেই তাঁর একান্ত আপনার জন বলে মনে হয়েছে। তাই দয়ামাধব চরণে নিবেদিতপ্রাণা এই মহিলা তার লেখা আত্মজীবনী 'আমার জীবন' থেকে উপার্জিত অর্থ তাঁরই চরণে উৎসর্গ করার আবেদন জানিয়ে গেলেন। আত্মীয়বর্গ, বন্ধু-পরিজনদের উদ্দেশে বলে গেলেন তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনার কথা। ঈশ্বরের প্রতি রামকৃষ্ণের যে টান তা বিষয়ের প্রতি বিষয়ীর, পতির প্রতি পত্নীর এবং সন্তানের প্রতি মাতার টান। রাসসুন্দরীও শিশুকাল থেকেই দয়ামাধবের প্রতি টান ছিল গভীর। সে টান আন্তরিকতার, যেখানে কোনও বাহ্যিক আড়ম্বর নেই, বিশ্বাস ও ভালোবাসার উপকরণে তা পূর্ণ। তার ধর্ম একান্তই নিজস্ব, একান্তই ব্যক্তিগত, যা তার জীবনের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত।

"হে নাথ দয়াময়। ধন্য, ধন্য, তোমার ঠাকুরালী, ধন্য। তোমার নামামৃত আমার শ্রবণে প্রবিষ্ট হইয়া আমার মানবদেহ সফল হইল। আমি কৃতার্থ হইলাম।"

সকলের মধ্যে রামসুন্দরীর মতো আত্মনিবেদনের সুর শোনা না গেলেও তাদের জীবনে একটা বিরাট অংশ জুড়ে থাকত ঈশ্বর-বিশ্বাস, ভাগবত প্রেম। নীরদচন্দ্র চৌধুরী আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন যে মহিলারা যেখানে প্রকাশ্যে চিৎকার করে না, সেখানে তারা *'send up their secret thoughts to God, the unfailing Dispenser of Justice'*।

রাসসুন্দরী শুধুমাত্র গৃহবধূই নয়, মাতৃত্বের দায়িত্বপালনে একনিষ্ঠ কর্মী—তার এই চিহ্নায়ক পরিচয়ের অন্তরালে স্পষ্টভাবেই উদ্ভাসিত তার ব্যক্তিসত্তা। *'আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে'* দাঁড়াবার ক্ষমতা তাঁর ছিল না। নিতান্ত আপন প্রাণের টানেই লিখেছিলেন আত্মজীবনী। তাঁর এই আত্মজীবনী মুক্ত চিন্তা, মুক্ত ভাবনা, মুক্ত মানসিকতা ও মুক্ত আকাঙ্ক্ষার দলিল। ভাবতে অবাক লাগে, তথাকথিত শিক্ষাবর্জিত শুধুমাত্র পুঁথিপড়া জ্ঞান নিয়ে তাঁর যে আত্মোপলব্ধি তা যে ভারতদর্শনেরই মর্মকথা। কী করে তিনি বলেন —

"লোকে কেন বলে আমার শরীর, আমার বাটী, আমার ঘর? ফলতঃ আমার আমার সকলই মিথ্যা। মনুষ্যের মনের ভ্রম আর যায় না।"

মৃত্যু মানুষের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি বুঝেছেন—সংসারকে দেখেছেন 'মণিহারীর দোকান' রূপে — এমন অবগুণ্ঠনবতী মহিলাকে সাধারণ বা বলি কী করে? কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, তাঁর একক নিরলস প্রচেষ্টার স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। অথচ তার পরবর্তীকালে ঈশ্বরচন্দ্রের সংগ্রাম ও আত্মপ্রতিষ্ঠার কথা কারো অজানা নয়। শুধু রাসসুন্দরী কেন বিনোদিনীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখেছি থিয়েটারের কারণে সর্বস্ব-দেওয়া বিনোদিনীর মৃত্যুর পর সংবাদপত্রে কোনও শোকসংবাদ বেরোয়নি। এর চাইতে লজ্জাকর, যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা আর কী হতে পারে? প্রশ্ন জাগে এর পেছনে প্রকৃত কারণ কী? মূলত মেয়ে বলেই কি এই অবহেলা, এই উপেক্ষা, এই প্রতারণা, এই পরিত্যাগ? আজ সমগ্র দেশজুড়ে নারীবাদ নিয়ে যখন নিবিড়পাঠের আয়োজন চলছে তখন রাসসুন্দরীকে নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে, চর্চা শুরু হয়েছে বিনোদিনীকে নিয়েও। যে মহিলা আত্মজীবনীতে সমাজের ভ্রান্তধারণা, ভ্রান্তবিশ্বাসের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন, জীবনের শেষ সময়েও তাকে কিন্তু অন্ধবিশ্বাসের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে দেওয়া হল না, মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে তাকে গঙ্গাযাত্রা করানো হয়েছিল, পুত্রের আগ্রহ-আতিশয্যে। জীবন থেকে বড় হয়ে উঠল প্রথা, 'প্রথাই অমর এখানে'। ঊনবিংশ শতাব্দীর রাসসুন্দরীর রূপ-রঙ, স্বভাব-আচরণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে বিশ শতকের শেষপ্রান্তের এক কবিতায় ঃ

"তুমি আমাকে যেমন রেখেছ আমি তেমন আছি
শিকড়ের কোল ঘেঁষে রাঙা বটফুলের মতন।
তুমি কেমন আছ, কোনওদিন জিজ্ঞেস কোরো না এই কথা
আমাকে যেমন রেখেছ, আমি তেমনই আছি
ঠিক তেমন।"

তথ্যসূত্র ঃ

১. আমার জীবন ঃ রাসসুন্দরী দাসী
২. অন্দরে অন্তরে ঃ সম্বুদ্ধ চক্রবর্তী
৩. প্রাচীন ভারত সাহিত্য ও সমাজ ঃ সুকুমার ভট্টাচার্য
৪. সেকেলে কথা ঃ অভিজিৎ সেন ও অভিজিৎ ভট্টাচার্য (সম্পা)

■ *লেখিকা বাংলা সাহিত্যের গবেষক তথা বিশিষ্ট উদীয়মান প্রাবন্ধিক।*

সুরেন্দ্রকুমারের নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী ঃ নিবিড় পাঠ

বন্দনা দত্তচৌধুরী

উপন্যাস — কী এই শিল্পমাধ্যম? উপন্যাস নামক অভিধার সঙ্গে প্রত্যাশার কোন স্বরূপ জড়িয়ে আছে? ন্যাস শব্দের অর্থ যদিও স্থাপন বা গচ্ছিত বিষয় রক্ষা তবুও ন্যাস শব্দের সঙ্গে বিন্যাসের এক আভাষ পাই যেন। কিন্তু তবু আরও প্রশ্ন রয়ে যায়। ন্যাস যদি বিন্যাসের দ্যোতনাবাহী হয়ে থাকে তবে ন্যাসের সঙ্গে উপ শব্দ যুক্ত কেন? উপ অর্থাৎ পুরোপুরি বিন্যাস নয়। বিন্যাসের সমীপবর্তী কোন শিল্পমাধ্যমের নামই কি উপন্যাস? সার্থক উপন্যাসে কি তবে কোনও মীমাংসা প্রত্যাশিত নয়? চিহ্নায়কের গ্রন্থনায় কিছু প্রশ্নকে উস্কে দেওয়াই কি তবে উপন্যাসের ইপ্সিত লক্ষ্য? কিন্তু তবুও উপন্যাসকে ঘিরে পাঠকের মেধার ভেতরে দীর্ঘকাল ধরে কিছু ক্লান্তিকর প্রত্যাশার নক্সা কাটা রয়েছে। কিন্তু সব ভ্রান্তিকে ভ্রান্ত প্রমাণিত করতে সময়ের চেয়ে বড় শিক্ষক আর কে হতে পারে? তাই সময়ের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমের রচনাকৌশল যেমন নানা মাত্রায় বিবর্তিত হয়েছে ঠিক তেমনি নাটকের প্রত্যাশার দিগন্তের ক্রমও পাল্টেছে বারবার। পাঠকের নতুন যুগের নতুন ভাবাদর্শ অনুযায়ী বরাক উপত্যকার প্রথম মৌলিক উপন্যাস সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর 'নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী' যখন পুনঃপঠিত হয় তখন পাঠকের প্রতিক্রিয়ার নির্যাসটুকু একের পর এক গ্রথিত করাই এই আলোচনার অন্বিষ্ট।

'নাবীশক্তি বা অশ্রুমালিনী' — লক্ষণীয় এই শিরোনাম। নাটকের শিরোনাম সম্পর্কে বলা হয়েছে *"নাম অর্থ নাটকস্য গর্ভিতার্থ প্রকাশকঃ"*। কিন্তু এই সত্য কি শুধু নাটকের ক্ষেত্রেই প্রাসঙ্গিক? শিল্পের প্রতিটি মাধ্যমের ক্ষেত্রে শিরোনাম হচ্ছে রচনার বা শিল্পের গভীর অর্থের প্রকাশক। এই সত্যকে মাথায় রেখে যদি সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর 'নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের শিরোনামকে লক্ষ করা যায় তবে উপন্যাসের শিরোনাম পাঠককে কোন সত্যের দিকে তর্জনী সঙ্কেত করে? 'নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী'—অর্থাৎ অশ্রুর সম্বল ও নারীশক্তি সমার্থক? অশ্রুই নারীশক্তির উৎস? উপন্যাসের উপসংহারে একথার সাক্ষী পাওয়া যায়। "অশ্রুজল প্লাবনের মত বক্ষ ভাসাইয়া ছুটিল — কণ্ঠ নীরব হইল? সুরজা চঞ্চলহস্তে অঞ্চল দিয়া আঁখিজল মুছাইতে লাগিল। ভাবপ্রবণ নীরদ বাধা দিয়া আবেগভরে বলিল— *"ক্ষান্ত হও এই অশ্রু মুছাইওনা—এই অশ্রু ঝরিতে দাও! — এ অশ্রু নয়—মুক্তাবিন্দু; — এ অশ্রু নয় শান্তিজল! ঐ দেখ তোমার হীরক-খচিত মোহনমালা হইতেও এই অশ্রুমালা সুন্দর দেখাইতেছে; চেয়ে দেখ সুরজা — সেই মণিমালিনী যোগরাণী আজ কত সুন্দর দেখাইতেছে! এই অশ্রুহার এই ভারতের প্রত্যেক নারীকণ্ঠে যেন শোভা পায়— এই শান্তিজল এই অত্যাচার কলুষিত বঙ্গভূমিকে প্লাবিত করিয়া যেন গৃহে গৃহে শান্তি আনয়ন করে।"* (পৃঃ ২১৫) এ বাক্য উপন্যাসের মুখ্য চরিত্র নিরদকুমার গুপ্তের নয়। কথককে পরাস্ত করে এখানে লেখক সর্বেসর্বা হয়ে উঠেছেন। এ বাক্য লেখকের মূল্যবোধ নিষ্ণাত বাক্যবন্ধ। ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর কাছে দাম্পত্যপ্রেম শুধুই প্রেম নয়; দাম্পত্যপ্রেম তাঁর জীবনতত্ত্ব। তাই উপন্যাসের প্রতিটি নারীচরিত্রই যেন তাঁর জীবনতত্ত্বের প্রকাশক হিসেবে উপস্থাপিত

হয়েছে। সম্পাদকের কলমে সেই সত্য পাঠক জানতে পারেন যে এ প্রত্যয় ঔপন্যাসিকের জীবনমন্থনজাত প্রত্যয়। *"তাঁর সাহিত্যের মূল ভাব দাম্পত্য প্রেম। নিজের জীবনে যেমন দাম্পত্য প্রেমের মধুর স্পর্শে তাঁর মানসিকতা সার্বিক বিকাশ লাভ করেছিল, তিনি চেয়েছিলেন অন্যের জীবনেও সেই মাধুর্যের প্রকাশ ঘটুক। এজন্যই বারবার বিষবৃক্ষের কথা উল্লিখিত হয়েছে।"* কিন্তু উপন্যাসে চিত্রিত নারীচরিত্র সমবায়কে পরিক্রমা করলে পাঠক এই প্রতীতিতে পৌঁছান যে ঔপন্যাসিকের জীবনতত্ত্বের আধেয় যে প্রেম তা ভাবাদর্শের ভ্রান্তিতে আদর্শে উত্তীর্ণ হয়েছে।

উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র যোগরানিকে ঘিরেই উপন্যাসের গতি আবর্তিত। যোগরানির মনে প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি জিজ্ঞাসা ছিল। *'ভুবনেশ্বরী কন্যার দ্বারা বধূকে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন বধূ যেন দিনের বেলা শয়নগৃহে আনাগোনা না-করে; কারণ এদেশের ভদ্রঘরের বউঝিদের পক্ষে ইহা নিতান্ত লজ্জাহীনতার পরিচায়ক।'*

"কথাটা শুনিয়াই যোগরাণীর নারীহৃদয় বিদ্রোহের সাড়া দিয়া উঠিল। কে যেন তাহার অন্তরে থাকিয়া বলিল—এ যে তাহার ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ!—দেবতার পূজাগৃহে সেবিকার আনাগোনা,—তার আবার কালাকাল কি? এই অন্যায় হস্তক্ষেপের প্রতিরোধ করিতে হইবে।" (পৃঃ ৫৯-৬০) কিন্তু রেনেসাঁস যে ব্যক্তি-চৈতন্যের জন্ম দিয়েছিল, নারী যে একজন ব্যক্তি সে চেতনা নারীর মধ্যে জেগেছিল ওই সময়েই। কিন্তু ব্যক্তিচৈতন্যের কাছে, নারীর মানবিক অস্তিত্বের অপমানে যে বিদ্রোহ ইপ্সিত, যোগরানির জিজ্ঞাসা সেই বিদ্রোহে প্রকাশ পায়নি। রেনেসাঁসের দীপায়নে প্রভাবিত ঔপন্যাসিক চেতনা নারীকে শ্রদ্ধা করতে জেনেছেন কিন্তু তবুও আপাত সময়ের ভ্রূকুটিতে ঔপন্যাসিক শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। উপন্যাসের উপসংহারে যোগরানির অশৈল্পিক পরিণতি আপাত সময় ও প্রকৃত সময়ের অসামঞ্জস্য প্রমাণিত করে। অবিশ্বাসী স্বামীর ব্যক্তিত্বহীনতার বিরুদ্ধে যখন যোগরানি বিপ্লবী পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তখন ঘর হতে বাহির হয়ে নারীচৈতন্যের গৌরবময় রথ্যায় দিকে পাঠককে মনোযোগী করে তোলে যোগরানির এই প্রতিবাদ। কিন্তু একজন স্ববিরোধী বুদ্ধিজীবি ঔপন্যাসিকের পক্ষে সামন্ততান্ত্রিক ঘেরাটোপকে অস্বীকার করে বৃত্ত ভেঙে বেরিয়ে আসা সম্ভব হল না। রেনেসাঁসের সূর্যালোকে যোগরানিকে স্নান করাতে ব্যর্থ হলেন ঔপন্যাসিক। তাই যে খাঁচার রুদ্ধতাকে অস্বীকার করে যোগরানি চলে গেল, পরিবর্তে শ্যামগ্রামের আরেকটি খাঁচা হয়ে উঠল তার অবশ্যম্ভাবী বিধিলিপি। মধ্যযুগীয় কর্তব্যনিষ্ঠার বোধে সে নিজেই আরেকটি কারাগার গড়ে তুলল। সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের ঘেরাটোপে নারী নিজেকে নিজেই নিরাকৃত করে নিল আত্মিক অবরোধের নিষ্পেষণে। যোগরানির পতিপ্রেম ভারতীয় ঐতিহ্যে চিরলালিত পাতিব্রত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। এ পাতিব্রত্য মধ্যযুগের কর্তব্যনিষ্ঠা, নৈতিকতা ও ধর্মবোধের তাগিদেই প্রবহমান। এ পাতিব্রত্য হৃদয় থেকে স্বতো উৎসারিত নয়। সেবার আদর্শই এই প্রেমের মূল উৎস। প্রেমজ পাতিব্রত্যের উপস্থাপনায় রেনেসাঁসের নারীচৈতন্য ঔপন্যাসিককে নারীর প্রেমকে নতুন মহিমায় উদ্ভাসিত করে দিতে অনুপ্রেরণা দিলেও ঔপন্যাসিক ফিরে গেলেন এক আদর্শায়িত অতীতের অবসিত মূল্যবোধে। *"সে সুখ আবার কেমন সুখ?—নারীর পক্ষে যাহা সর্বশ্রেষ্ঠ সুখ! সেবার তিনটি অঙ্গ, — কায়, মন ও বাক্য। কায়া দ্বারা — অস্থিচর্ম্মের দেহদ্বারা — সেবা করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, সে সুখের পথ*

তাহার কাছে মুক্ত আছে। কিন্তু মন দিয়া, প্রাণ দিয়া, হৃদয় দিয়া যে সেবা, সে সেবার পথ তো রুদ্ধপ্রায়! ... সুতরাং বাক্‌স্ফূর্তিময়ী ভাবসেবার সুযোগ অভাবে যোগরাণীর যে কি পরিমাণ ক্ষতি হইল, তাহা হৃদয়হীন পুরুষ পরেশচন্দ্র বুঝিতে না পারিলেও, হৃদয়শালিনী যোগরাণীর বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু বুঝিয়াই বা কি করিবে! যে অন্যায় আদেশ তাহার এই অপরিসীম ক্ষতির কারণ, সেই আদেশ লঙ্ঘন করিয়া যদি সে ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করিতে যায়, তাহা হইলেও পারিবারিক কলহের সৃষ্টি হইবে। ইহাও তাহার পক্ষে অসহনীয়; কারণ সে যে নারী; — পারিবারিক শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করা যে তাহারই কর্ত্তব্য। সুতরাং তাহার নিজের স্বার্থ লইয়া গৃহে অশান্তি সৃষ্টি করতঃ তাহার বধূপনার উপর কলঙ্ক আরোপিত হইতে দিতে কিছুতেই তাহার প্রবৃত্তি হইল না; — ... আত্মশক্তির প্রতিশোধ চিন্তা ভুলিয়া গিয়া, পরিজনদের স্বার্থ সুখের কাছে নিজের স্বার্থত্যাগে কৃত-সঙ্কল্প হইল। ... পরের প্রীতির উদ্দেশ্যে আত্মসুখকে বলিদান করিয়া, যৌবনের প্রারম্ভেই যোগরাণী যোগিনী সাজিয়া বসিল!" এভাবেই সময়ের নেতিবাচকতায় ব্যর্থ হয়ে গেল একটি সম্ভাবনার অঙ্কুরোদ্‌গম। তাই সামন্ততান্ত্রিক খোলসে ঢাকা চেতনা নিয়ে যোগরানিকে বলতে শোনা যায় *"আর আমায় বাধা দিবেন না। আজ সব ভুল ভেঙ্গে গেছে,—আজ বুঝেছি আমার সুখ কিসে—আমার স্থান কোথায়! হাজার হোক, তবু তিনি আমার স্বামী—তিনি আমার দেবতা; সে স্থান ধূলিকঙ্করময় হইলেও —সে আমার দেবগৃহ, সেই আমার পুণ্যতীর্থ! সে পুণ্যস্থানের কাদামাটি জল আমার গঙ্গা মৃত্তিকা—আমার তীর্থসলিল। বাবা, আজ মুক্ত বক্ষে আমায় সে তীর্থযাত্রা করতে দেন—"*। কিন্তু তবুও মানুষের পরিচয়কে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে নারীর লাবণ্যময়, প্রেমময় উপস্থিতি যে কাম্য সে সত্য উপন্যাসে বিধৃত। কিন্তু ঔপন্যাসিক বুদ্ধিজীবীর কলমে সামন্ততান্ত্রিক সমাজের বনেদি আভিজাত্যের আলেখ্য ইপ্সিত উপন্যাসিকতার দক্ষতায় নারীকে সময়ের নির্দিষ্ট বিন্দুতে দাঁড় করাতে পারল না। তবে এর শেকড় হয়তো অনেক গভীরে। কোনও রচনাকে বিশ্লেষণ করতে হলে দেখতে হবে যে রচনা কোন সমাজ থেকে রস নিচ্ছে। বরাক উপত্যকার আধুনিকতা মানেই ঔপনিবেশিক সংস্কৃতি দ্বারা গ্রস্ত নিতান্ত বহিধৃত চাপিয়ে দেওয়া আধুনিকতা। এ এক হ্রবির, বধির, অন্ধসমাজ। এখানে দৃষ্টিকোণ বলে কিছু গড়ে ওঠেনি। সামন্ততন্ত্র, ব্রাহ্মণ্য এবং পিতৃতন্ত্রের সমন্বয়ে গড়ে ওঠা কারাগার যেন এ সমাজ। উপন্যাসে বিধৃত যে জীবন এ জীবনের এমন এক মূল্যবোধ যেখানে প্রতিরোধ বলে কিছুই নেই। পুরুষচৈতন্য বলে তখন কোনও কিছু জাগেনি। যেখানে চৈতন্য জাগেনি সেখানে ব্যক্তিত্ব জাগবে কী করে? তাই পরেশের মতো ক্লীব পুরুষের পিতৃতন্ত্রের প্রতিনিধি মা ভুবনেশ্বরীর হাতের পুতুল বৈ স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

নীরদকুমার—যে নারীর প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন এবং শ্রদ্ধাশীল তার মুখেও উপসংহারে রক্ষণশীল পিতৃতান্ত্রিক শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বক্তব্য উপস্থাপিত হয়। ফলে নষ্ট হয়ে গেল চরিত্রের যৌক্তিক পারম্পর্য। নিষ্ঠুর পরেশের মনে স্ত্রী যোগরানির প্রতি প্রেমের বীজ বপন করতে যে নীরদ প্রগতিশীল ভাষণের তুফান তোলে সে নিরদের মুখেই যখন অন্ধকার এক সমাজের নারী চরিত্রের কল্পনার ছবি ফুটে ওঠে যে সমাজে অশ্রুই নারীর একমাত্র সম্বল; তখন মনে হয় সঠিক ভাবাদর্শের অভাবে সময়ের প্রতি যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চরিত্রের সম্ভাবনাকে ব্যর্থ করা হল। উনিশ শতকের রেনেসাঁস যে নারীচৈতন্যকে কল্পনায় দেখছিল, উনিশ শতকে যে

নারীচৈতন্য বিকাশের সম্ভাবনা ছিল, কল্পনা দিয়ে সেই সম্ভাবনাকে সৃষ্টি করলেন না। যথালব্ধ সময়ে হস্তক্ষেপ করে অনাগত ভবিষ্যতের স্বপ্নগাঁথা রচনার কালোত্তীর্ণ প্রতিভা তিনি উপন্যাসে দেখালেন না। উপন্যাসে প্রতিটি চরিত্রই যেন সময়ের সমস্ত অন্ধকার অন্ধবিন্দুকে নিজের কাঁধে নিজেই বহন করে চলেছে।

সমস্ত চরিত্র পরিক্রমা করেও যে মূল জিজ্ঞাসা রয়ে যায় তা প্রারম্ভিক সংশয়। অর্থাৎ এ আলোচনার শুরুতে উপন্যাস অভিধার যে দ্যোতনার সন্ধান করা হয়েছে 'নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী' উপন্যাসে সেই ঔপন্যাসিকতা কি রক্ষিত হয়েছে? উপন্যাসের বয়ন-অন্তর্বয়নের টানাপোড়েনে কি বিশ্লেষণধর্মী বুনটে কিছু না বলে ছোঁয়ায় ছোঁয়ায় পাঠককে এক অনন্য তাৎপর্যের উপকূলে পৌঁছে দিতে সমর্থ হয়েছে?

খাঁচাবদ্ধ পাখির রূপকে যেখানে অভ্যাসের নিবিড় শৃঙ্খলকে চিহ্নিত করার প্রয়াস দেখা গেছে, তখনই পরবর্তী বয়নে নৈঃশব্দ্যের সব জোড়গুলোকে খুলে দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এভাবে যেখানেই নৈঃশব্দ্যের গ্রন্থনার সম্ভাবনা দেখা গেছে পরবর্তীতেই সব সম্ভাবনাই ধ্বস্ত হয়ে পড়েছে।

ঔপন্যাসিক সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর ভাষারীতির দিকটিতে চোখ ফেরালে এক দুর্বল অশক্ত গদ্যের বাঁধন লক্ষিত হয়। সাধু চলিতের মিশ্রণে বরাক উপত্যকার আঞ্চলিক প্রভাব সুস্পষ্ট। *"জননী দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন— 'তা শুনে কাজ নাই— তুই বুঝবি না মা!"*

কিন্তু তবুও উপন্যাসে সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর প্রগতিশীল চিন্তার স্ফুরণ পাঠকের দৃষ্টি এড়ায় না। উপন্যাসের একটি উজ্জ্বল নারী চরিত্র ভুবনেশ্বরীকে সামনে এনে বর্ণবাদী সমাজের বীভৎসতাকে শুধু ফুটিয়েই তোলেননি, যথার্থ ব্যঙ্গে বিদ্ধ করলেন জাত্যাভিমান পুষ্ট সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধকে। পণপ্রথা, নারী নিগ্রহকে আক্রমণও সেই কাল লগ্নেরই অভিজ্ঞান। ভুবনেশ্বরী চরিত্রের উপস্থাপনায় তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে পিতৃতন্ত্র কিভাবে একটি মেয়েকে মেয়ে করে তোলে। আর পিতৃতন্ত্র তো সরাসরি কাজ করে না। এ কাজটা সব সময়েই ঘটে অন্য কোনো নারীর মাধ্যমে। পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অবিস্মরণীয় 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই মূল্যবোধে অগ্নিস্নাত তাঁর উপন্যাস।

বিশ্বাসের মূল্যবোধের সান্দ্রগীতিময় এক পৃথিবীতে তিনি নিয়ে যেতে চেয়েছেন পাঠককে। যদিও উপসংহারে কাহিনির গতি অযৌক্তিকতার শেকল লাঞ্ছনায় স্থবির, শ্লথ এবং কিছুটা লাবণ্যহীন। জোর করে সব সমস্যার সমাধান যেমন পূর্বনির্ধারিত উপসংহারের প্রতীতির কথা মনে করিয়ে দেয় ঠিক তেমনি সাহেবের বক্তব্য অসঙ্গত অযৌক্তিকতায় কিছুটা লঘু। তাই যদিও উপসংহারে পৌঁছে মুক্তির নির্গমদ্বার সন্ধানে ব্যর্থ উপন্যাস রুদ্ধ উপসংহারে বন্দিত্ব স্বীকার করে নেয় কিন্তু তবুও নিঃসন্দেহে বলতে হয় যে এই রুদ্ধতার জন্য ভুল কৌণিকতাই দায়ী; তাঁর ঔপন্যাসিক সত্তা নয় এবং 'নারীশক্তি বা অশ্রুমালিনী' উপন্যাসের জন্য সুরেন্দ্রকুমার চক্রবর্তীর আসন বরাকের উপন্যাস রচনায় পুরোধা ব্যক্তিত্বের মর্যাদায় চিরদিন অভিষিক্ত থাকবে।

■ *লেখিকা বিশিষ্ট উদীয়মান প্রাবন্ধিক তথা বাংলা সাহিত্যের গবেষক।*

নবারুণ ভট্টাচার্যের হারবার্ট ঃ প্রতিবাদের নতুন কণ্ঠস্বর

অশোক দাস

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেলাম বিশ শতক। একুশ শতকের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে বিহ্বল মানুষ আমরা দেখছি, সত্যও উৎপাদিত হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, দেখা যাচ্ছে বিশ্বায়ন নামে জুজুবুড়ি ধীরে ধীরে তৃতীয় বিশ্বের প্রত্যন্ত এলাকাতেও কীভাবে মাল্টাক্লজে পরিণত হয়ে গেছে। পি সি সরকারের গিলিগিলি হোকাস-পোকাস এখন কম্পিউটার নামক 'ময়দানব' ঢের বেশি দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করছে। টুপি থেকে বেরোচ্ছে হাতি, স্পিলবার্গের ডায়নোসোর, অন্য নক্ষত্রলোক থেকে আসা মহাকাশ যান। সবমায়া, সব-সত্যের ইজারাদার এককেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থার মোড়লপ্রভু। একদিকে দেশ ও জাতির সীমান্ত চূর্ণ করে দিনরাত ইথার তরঙ্গে ভেসে আসছে ছদ্ম পৃথিবীর সম্মোহক মাদক, অন্যদিকে উদ্ভট কুসংস্কার আর ধর্মীয় গোড়ামি ভরা অপপুরাণের মরা কোটালে নতুন জোয়ার এনে দিচ্ছে কম্পিউটার প্রযুক্তি। উপগ্রহের অকৃপণ সহযোগিতায় গণমাধ্যম এখন মাদকভরা বিনোদনের অফুরন্ত জোগানদার। সাহিত্য কবেই পণ্য হয়ে গিয়েছিল। এখন তা খোলাখুলি প্রতাপের সেবাদাস, আধিপত্যবাদী রাজনীতির সুরে-তালে-লয়ে পাঠকৃতির তন্তুগুলি বাঁধা।

বর্তমান সময়ে সাহিত্যের প্রাতিষ্ঠানিক পিঞ্জর বিনির্মিত হচ্ছেই। হতেই হয়। কেননা দ্বিবাচনিকতা জীবনের নিয়ামক বিধি। সাহিত্যের পাঁজর থেকে জন্ম নিচ্ছে জীবন্ত লেখার প্রতিস্রোত। কী কবিতায় কী ছোটগল্প কী উপন্যাসে আকরনোত্তর বিন্যাস এবং উত্তরায়ণ মনস্কতা অপরিহার্য সত্য। পিঞ্জরায়িত সময়ের রয়েছে প্রাতিষ্ঠানিক চরিত্র; আবার শমীগর্ভে প্রচ্ছন্ন আগুনের মতো অপ্রাতিষ্ঠানিক সময়বোধের দ্বিবাচনিক অভিব্যক্তিও দেখতে পাচ্ছি আমরা, নইলে হাসান আজিজুল হক, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস লিখতেন না কেবল। কিংবা মহাশ্বেতা দেবী, সাধন চট্টোপাধ্যায়, স্বপ্নময় চক্রবর্তী, ভগীরথ মিশ্র, অমরমিত্র, কিন্নর রায়, নবারুণ ভট্টাচার্যরা লিখতেন না কখনও। আজও সুবিমল মিশ্র, উদয়ন ঘোষ, কাজল শাহনেওয়াজরা লেখেন কেন যদি সময়ের প্রতীয়মান ও প্রশ্রয়ধন্য পাঠ সম্পর্কে তাঁদের কোনও আপত্তি না থাকত, অবভাস আমাদের চিন্তায় চেতনায় মড়কের সংক্রামক কীটের মত অনুপ্রবেশ করেছে। সত্য কী আমরা জানি না, এমনকী মিথ্যাকেও আমরা জানি না। আমরা ইতিহাসকে আজ ঠোঁটে রাখি মেধায় রাখি না। বরং অতি প্রচুর অতি সপ্রতিভ প্রতীচ্য থেকে উড়ে আসা ইতিহাস — সন্দর্ভ ভাবাদর্শের মৃত্যু বিষয়ক ধারণার আঁধি আমাদের আচ্ছন্ন করছে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত হাত দুটি তুলে এনে নিজের বুকের উপর পরখ করতেও অনীহা, এখনও সেই পুরনো হৃদপিণ্ড আগের তালে লয়ে ধুকধুক করছে কি না।

বর্তমানে সব অস্থির এখন ঃ আবেগ-চিন্তা-অনুভূতি বিশ্বাস। ইচ্ছার ওপর সময়ের কর্তৃত্ব নিশ্চয়, কিন্তু ব্যক্তি কি নিছক নিরুপায় ভোক্তা ও গ্রহীতা। তাৎক্ষণিক তাগিদে যদি সব কিছুই হয়, লেখার উপকরণ তা হলে কী হবে? অনুয়ের পুরনো রীতি বাতিল হয়ে গিয়ে যদি অনুয়ের সঞ্চরমান অনুভূতিপুঞ্জ সর্বেসর্বা হয়ে থাকে, তা হলে ঘটমানতা বলে কিছুই থাকবে না। যদি এমন হয় গল্পকার এবং ঔপন্যাসিক কোনও ধরনের যথাপ্রাপ্ত সম্পর্কে মাথা ঘামাবেন

না আর। অবভাস কী তত্ত্ববস্তুই বা কী! দ্রুত বদলে-যাওয়া এবং বদলাতে থাকা এ সময়ের দর্শনেরও মৃত্যু ঘোষণা হবে অবধারিত। কালঃ বাচতি ইতি বার্তা।

অত্যন্ত সময় সচেতন লেখক নবারুণ ভট্টাচার্য তাঁর হারবার্ট উপন্যাসে এমনই এক সময়কে নির্মাণ করেছেন। আজকে নয়া ঔপনিবেশিকতার প্রবাহে আমরা প্রত্যেকেই যে নিজেদের অস্তিত্ব থেকে অনেকটা সরে দাঁড়িয়েছি, বিমানবায়ন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সামনের দিকে কেবলই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। অতীত-বর্তমান ভবিষ্যৎ বলে আমাদের সামনে আর কিছু নেই। ঔপন্যাসিক আলোচ্য উপন্যাসের মধ্যে বস্তুত সময়কে ধরতে চেয়ে এমনই এক বিকল্প বাস্তবের সন্ধান করেছেন। লেখকের এই অনুসন্ধান মানবজাতির যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ। আসলে লেখক তাঁর ট্যাক্সট-এর মধ্যে প্রতিটি বয়ানে নিজে নিজেকে বারংবার বিনির্মাণ করেছেন। আর এই প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে ঔপনিবেশোত্তর চেতনাকে আবার ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। 'সময়ের নতুন সমিধ' গ্রন্থে তপোধীর ভট্টাচার্য এক জায়গায় জানিয়েছেন ঃ

> *"কাহিনীর মধ্যে শুধু গল্প, নিছক আধা-নাটকীয় বিন্যাস খোঁজার দিন শেষ। উপন্যাস মানে বয়ান বা টেক্সট, প্রতিবেদন বা ডিসকোর্স এখন; কত ধরনের অভিব্যক্তি তার যে সময় বয়ে যাচ্ছে নিষ্ঠুর উদাসীনতায় কী আছে সেই চেতনার বুদ্বুদপুঞ্জে — ঔপন্যাসিকের কাছে সে প্রশ্ন খুঁজি। মীমাংসা খোঁজার একটা রেওয়াজ অবশ্য ছিল সেদিন পর্যন্ত; কিন্তু জীবনে কোথাও যখন মীমাংসা নেই, আছে কেবল জটিল প্রহেলিকা আর দুর্ভেদ্য গোলকধাঁধার বিস্তার— উপন্যাস কেনই বা ইচ্ছাপূরণের পথে হাঁটবে? ঠিক মতো প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে কি না, চেনা জগতের অচেনা অবয়ব দেখতে পাচ্ছি কি না— এটাই সবচেয়ে জরুরি।"*

সময় বহুস্বরিক। ফলে উপন্যাসেও বহুস্বরিক সময়ের প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। অহরহ নতুন নতুন চিহ্নায়ক উৎপাদন করা এবং উৎপাদিত চিহ্নায়ক প্রকরণে অন্তর্ঘাত করা এই সময়ের অভিজ্ঞান। স্বভাবত উপন্যাসের আখ্যানে এই অভিজ্ঞান প্রাধান্য পাচ্ছে ইদানিং। তবু সত্য যেহেতু দ্বিবাচনিক, সময়ের বিচিত্র পরস্পর-বিরোধী বিভঙ্গের একমাত্রিক বয়ান সাম্প্রতিক উপন্যাসে অনেকাংশেই অনুপস্থিত। বরং বিপ্রতীপ-সন্নিবেশ, অজস্র অন্তঃস্বরের সমারোহ, বাস্তব ও বিভ্রমের যুগলবন্দি আজকের উপন্যাসে লক্ষণীয়। আসলে বাঙালির ভুবনে শুধু আধুনিকোত্তর পর্যায়ের অবভাস তৈরি হয়নি, ঔপনিবেশোত্তর পর্বের কখনও প্রকাশ্য আর কখনও প্রচ্ছন্ন সাংস্কৃতিক রাজনীতিও রয়েছে। খাঁটি ঔপন্যাসিক কীভাবে এসবের মোকাবিলা করেছেন অথবা কীভাবে আত্ম-প্রতারক অজুহাত তৈরি করে নিজেদের সমর্পণ করেছেন — পাঠকেরা তা বুঝতে চাইছেন। কিছুদিন আগেও প্রাতিষ্ঠানিক পরিসরকে উপন্যাসের পাঠকৃতিতে আলাদাভাবে শনাক্ত করা যেত। কিন্তু সময়ের অবাধ অগাধ জটিলতায় এই দুই পরিসরের জল বিভাজন রেখা মুছে গেছে। এর অনেকান্তিক প্রতিক্রিয়ায় ঔপন্যাসিকের কথন-বিশ্ব উত্তরোত্তর ধুপছায়ায় আচ্ছন্ন হচ্ছে কিনা — এ কথাও মনে রাখতে হয়।

অন্তর্বস্তু ও প্রকরণের দ্বান্দ্বিকতা চিরকাল ছিল, থাকবে। সত্য ও মিথ্যার মধ্যে দোদুল্যমান লেখকসত্তা আজ সংবেদনশীলতার কোন মাত্রা দিয়ে উপন্যাসের বিষয় নির্বাচন করবে, 'উপন্যাসের বিষয়' বলে আলাদাভাবে কোনও কিছু চিহ্নিত করা যায় কি না এমন

একটা প্রশ্ন চিহ্ন উঠে দাঁড়ায়। আখ্যানের ভেতরকার সময় আর সময়ের ভেতরকার আখ্যান যে মিলতে পারে না সর্বদা—এর কারণ এই যে লেখকের অসহিষ্ণু মন আজ সর্বব্যাপ্ত প্রযুক্তির কুহকে আক্রান্ত এবং লেখকচৈতন্য ঔপনিবেশীকৃত। ঔপন্যাসীকরণের যে সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সাম্প্রতিক সাহিত্য-তাত্ত্বিকদের কাছে জানা যায়, সেই অনুযায়ী অহরহ নতুন সংহিতায় ঔপন্যাসিকদের পৌঁছানোর কথা। প্রতি বাস্তবের নির্মিতি যদি হয় এ সময়ে বাস্তব, তাহলে তো কুহক ও অবভাসের পুরনো ধারণাকেও বিনির্মাণ করে নিতে হবে আজ। ফলে অবধারিতভাবে বদলে যাবে আখ্যানের কাঠামো, অন্তঃস্বর ও মুখ্যস্বরের বিন্যাস। আখ্যানের নতুন ধারাই হবে ঔপন্যাসিকের সময়-ভাষ্য, তার প্রতিপ্রশ্নও জীবন সন্ধিৎসা।

অবক্ষয়ের যে সময়ে আমরা বাস করছি, তাকে বোঝার জন্যে সাংবাদিকসুলভ প্রতিবেদন যথেষ্ট নয়। কেননা আজকাল সন্দর্ভের ভেতরেই লুকিয়ে থাকে প্রতিসন্দর্ভ, বাচনকে প্রত্যাহ্বান জানায় প্রতিবাচন। অনেক আরম্ভ এখন, অনেক সমাপ্তিবিন্দুও। তাই উপন্যাসের আখ্যানে কখনও কখনও গোলকধাঁধার ছায়া ঘনীভূত হয়ে ওঠে। প্রতিবাস্তব অনায়াসে দখলদারি নেয় বাস্তবে। এখন যুক্তি শৃঙ্খলার বদলে বড় হয়ে ওঠে অনন্বয়ের গ্রন্থনা। পারস্পরিক পার্থক্য ও সমান্তরলতার বোধ আখ্যান বিশ্বের নিয়ন্তা। প্রচলিত অর্থে কেন্দ্রিকতা অবান্তর হয়ে যাচ্ছে। তাই ঘটনা কিংবা কুশীলবের ঐক্য-প্রতীতিও অপ্রয়োজনীয়। আজকের সময় থেকে যদি একটু পিছিয়ে যাওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে উপন্যাসের গ্রন্থনায় প্রতিবেদনের গুরুত্ব স্পষ্ট করে তুলেছেন দেবেশ রায় তাঁর প্রতিবেদন চতুষ্টয়ে, বৃত্তান্তহীন বৃত্তান্ত রচনায়। একইভাবে আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা', অমিয়ভূষণ মজুমদারের 'চাঁদবেনে', অভিজিৎ সেনের 'রাহুচণ্ডালের হাত' এবং অবশ্যই নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট' ইত্যাদি উপন্যাসেও নতুন সংহিতার আদল খুঁজে পাওয়া যায়।

সময়ের নির্যাসকে শুষে নিতে এমন এক কাহিনি গ্রন্থনা লেখক 'হারবার্ট' উপন্যাসে করেছেন যা পাঠককে শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত এক অনিশ্চয়তার মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যায়। বস্তুত উপন্যাসের মধ্যে লেখক যা কিছু উত্থাপন করেছেন তার কোনও শেষও নেই শুরুও নেই। আধা ঔপনিবেশিকতার জোয়াল কাঁধে নিয়ে আমরা যেভাবে চেপে বসে আছি, অসহায়তার প্রতিবাদের ভাষা ভুলে গিয়ে আমাদের পিঠ গিয়ে দেওয়ালে লেগেছে। এই অধিকতর বাস্তবকে ধরতে চেয়ে আমদানি করেছেন আরও এক বিকল্প বাস্তব। মূলত তার এই প্রয়াস আঘাতের মধ্য দিয়ে চেতনাকে ফিরিয়ে দেওয়া। লেখক প্রত্যক্ষ করেছিলেন সাম্যবাদের পতন। তাঁর চোখের সামনে দেখতে দেখতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে চুরমার করে দেওয়া হল। কপটতার সাঁড়াশি আক্রমণে সোভিয়েত রাশিয়া খান-খান হয়ে যাওয়ার পর পৃথিবীতে সাম্যবাদ হল বিপন্ন। ইচ্ছাকৃতভাবে সাম্যবাদকে দুর্বল করে এই আদর্শের মতাবলম্বী দেশগুলো ও জনসাধারণকে বিপন্ন করে দেওয়া হল। তাদের সামনে শুনশান তেমন কোনও রাস্তা ছিল না। অস্থি থেকে মজ্জাকে ছিনিয়ে নেওয়ার কৌশল শুরু হয়ে যায়। আর তৎকালীন সময়ে কিছু চিন্তাবিদ লিখিয়েরা তাদের চিন্তা ও চেতনায় নতুন ধরনের রচনার প্রয়াস পান। নবারুণ ওই ধরনের একজন লেখক। যিনি নতুন করে গজিয়ে ওঠা জীবনগুলির অন্ধ-মুক্তির প্রয়াস খুঁজে ফিরেছেন। একটি সমাজ, একটি সংস্কৃতি, একটি চেতন সমষ্টির যে অতীত, যে ঐতিহ্য ছিল আশার, গর্বের, স্বপ্নের তা ভেঙে পড়েছে। অথচ পুনর্গঠনের কোনও

লক্ষণই চোখে পড়ে না। এই অসহ্য ভাঙ্গনের ফলে জন্মানো যে মনন বিপর্যয়, মার্ক্স যাকে বলেছিলেন melancholy, বিষাদ, সেই বিষাদেই যেন ছেয়ে আছে ওই উপন্যাসে বর্ণিত সমকাল। এই ভাঙন, পুনর্গঠনের লক্ষণহীনতা এবং তার ফলে জন্ম নেওয়া যন্ত্রণা সম্পর্কে আরও নিশ্চত হই যখন 'হারবার্ট' এর পাঠ ছাড়াও একটু পাশ কাটিয়ে প্রবেশ করতে পারি ঔপন্যাসিকের ভাবনার এলাকায়। 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার ১৯৯৪-এর মে সংখ্যায় দেবেশ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে নবারুণ ভট্টাচার্য বলেছেন—

> *"আমার কাছে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন একটা সাংঘাতিক ঘটনা, আমার সমস্ত অস্তিত্বকে বিদীর্ণ করে দিয়েছে এই অভিজ্ঞতা। সেই অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আমি 'হারবার্ট' লেখার প্রয়োজন বোধ করেছিলাম তীব্রভাবে। ... একদিক থেকে হারবার্ট চরিত্রটির অসহায়তা আমিও বহন করি। সেই অসহায়তাকে সাহিত্যের একটা আকার দিতে চাইছিলাম।"*

উপন্যাসের শরীরেও এই অসহায়তা, এই বিদীর্ণতার দীর্ঘশ্বাস ঢুকে পড়ে, 'হায় সেই বুকি আজ কোথায়? সেই চিল-ছাদে শোভা পাচ্ছে ডিশ অ্যান্টেনা। হারবার্ট নেই, সোভিয়েত ইউনিয়ন নেই, এতটা সরাসরি না হলেও এই অসহায়তা, এই বিদীর্ণতার অভিঘাত ধরা পড়ে শব্দ শরীরেও। এখানে বলা যেতে পারে মানুষের রাগ-অভিমান-দুঃখ-যন্ত্রণা সবকিছুই প্রকাশ পায় শব্দের মধ্য দিয়ে। শব্দ দিয়েই মানুষ গড়ে নেয় তার অনুশোচনা ও আক্ষেপ। উপন্যাস যখন শুরু হয় উদ্ধৃতি ও সংলাপটুকু বাদ দিলে প্রথম অনুচ্ছেদটিতে কণিভঙ্গির মধ্যে বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণগুলি যদি লক্ষ করা যায়—স্যাঁতলা, ফেনাফেনা, গুড়ো হড়কে, গ্যাঁজ-গেঁজিয়ে ভুরভুর, তেলভিটে, ছেতরে—প্রভৃতি বাচনের মধ্য দিয়ে লেখক-পাঠকদের যে জগতে নিয়ে যান সে এক ভঙ্গুর জগৎ, পিচ্ছিল জগৎ, যে জগতে কোনও বোধ, কোনও বিশ্বাস, কোনও স্বপ্ন, বিশ্বস্ত ঋজু ভঙ্গিতে মাটিতে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। 'হারবার্ট' এই ভেঙে পড়া বিপর্যস্ত জগতের গল্প, বিষন্নতার গল্প।

তবুও 'হারবার্ট' যে সময়কে নিয়ে নির্মিত হয়েছে, কিংবা যে সময়ের গল্প সে সময়টার সঙ্কট শুধু ওই ভাঙ্গনেই নয়, আরও গভীর তলদেশে। দুর্মর ভাঙ্গনের ক্রান্তিকালেও আরও এক সংগঠনের ইঙ্গিত দেখা দেয়। King Lear-এর শেষ পংক্তি-চতুষ্টয়ের প্রথম বলেছে The weight of this sad time we must obey. কিন্তু হারবার্ট-এ ধরা সময়, বিষন্ন সময়ের ভার দুর্বহ হয়ে ওঠে, কারণ উত্তর-ভাঙ্গন বছরগুলি গড়িয়ে যাচ্ছে, আর এক আরম্ভের দিকে, পুনর্গঠনের কোনও ইঙ্গিত ছাড়াই। ১৮৫৩-এর প্রেক্ষিতে মার্ক্স যাকে বলেছিলেন, '*Without any symptoms of reconstitution yet appearing অথবা loss of old world with no gain of a new one.* আর নবারুণ জানিয়েছেন,—

> *"লিখতে-লিখতে অনেক জায়গায় অটোমেটিক রাংইটিঙের মতো হয়েছে যদিও আমি লেখার ব্যাপারে স্ট্রাকচার আগে থেকে খুব ভালোভাবে ঠিক করে নেই কোথায় কী লিখব, কী হবে এইসব। সেই স্ট্রাকচারের মধ্যেই বহু জায়গায় 'হারবার্ট'-এ একটা স্বাধীনতা ঢুকে গেছে। আশির দশকেও আমাদের সামনে একটা মডেল ছিল। সে মডেল ক্ষয়ে যাচ্ছিল, নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল, তবু মনে হচ্ছিল মানুষকে কোথাও নিয়ে যাওয়া যাবে। (পৃঃ ৬৫, আখ্যান)*

অর্থাৎ আজ একুশ শতকে এসেও ভাঙ্গনের ঠিক-পরে দেখা যাচ্ছে এটুকু আলোও বোধহয় দেখা যাচ্ছে না যে মানুষকে কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। সঙ্কটের এই চোরাবালিতে অন্তহীন অসহনীয়তায় মার্কস্ কথিত সেই Melancholy Symptom নয় বিশ শতকের অন্তিমে এসে রোগলক্ষণটি আরও তীব্রতর হয়েছে—বিবমিষা। বিষাদ নয় বিবমিষা। ফলে বিষন্নতা নয় হারবার্ট বস্তুত বিবমিষার গল্প।

উপন্যাসের বর্ণনাংশের প্রথম বাক্যটি থেকেই শুরু হয় ওই বিবমিষার ঝাকুনি—

"মৃতের সহিত কথোপকথন'-এর অফিস বা হারবার্টের ঘর থেকে অনেক রাত্তিরে বমি বমি ধুনকিতে গলির বাড়ি, কোথায় বাড়িতে ফেরার সময় কথাটা বলেছিল বড়কা। সেই রাত্তিরের মালের আসরের পর বাড়ি ফেরাটা কোটন, সোমনাথ, কোকা, ডাক্তার, বড়কা এদের যেমন মনে আছে এখনও সেটা এলোমেলো। তাদের গায়ে স্যাঁতলা। রাস্তার আলোগুলোর পাশে ফেনা ফেনা আলোর বগুড়ো।" (পৃঃ ১)

সংবেদনশীল পাঠকরা এখানে লক্ষ করবেন ঔপন্যাসিকের বয়ানগুলির মধ্যে আপাতভাবে কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধতা আমাদের চোখে পড়ে না। প্রকৃত অর্থে লেখক কী বোঝাতে চাইছেন তা ঠিক স্পষ্ট নয়। লেখকের রচনা ভঙ্গিও অনেকটা আমাদের বোধগম্যের বাইরে চলে যায়। এখানে লক্ষণীয় ঔপন্যাসিক একটি সময়কে টেক্সট-এর মধ্যে প্রথম থেকেই উত্থাপন করেছেন। এ এক অস্থির সময়। বিশেষ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভাঙ্গনের কাল। সাম্যবাদের পতন। পাশাপাশি লেখক নতুন ঔপনিবেশিক সময়কে খুব সুন্দরভাবে তাঁর লেখায় স্পষ্ট করেছেন। নব্য ঔপনিবেশিক মোড়ল প্রভুদের কল্যাণে আমাদের যে মগজ ধোলাইয়ের কাজ চলছে এবং শষ্যের মধ্যে ভূত লুকিয়ে সুচারুভাবে একটি দেশ এবং জাতিসত্তাকে বিনষ্ট করার আয়োজন সম্পূর্ণ হচ্ছে তারই ইঙ্গিত বহন করেছেন নবারুণ। উপন্যাসের প্রথম থেকেই তাই শুরু হয়ে যায় একটি ভেঙ্গে পড়ার ছবি। অকালে স্বপ্নভঙ্গের চিত্র। বিসু যে পৃথিবী দেখেছিল, বারাসতেব শহিদ সমীর মিত্র যে দিনগুলো দেখতে দেখতে মরতে পেরেছিল সে দিনগুলোতেও ভাঙ্গন ছিল — *'ভেঙেচুরে তছনছ হয়ে গুঁড়ো গুঁড়ো / হয়ে ঝরে পড়েছে / পুরনো দিনগুলো। ঝড় আসছে একটা।'* কিন্তু সেই ভাঙ্গন অনেকটাই কাম্য ভাঙ্গন, সেই ভাঙ্গনের ওপারে তরতাজা একটা স্বপ্ন জেগেছিল, ওই যে মানুষকে কোথাও পৌঁছে দেওয়া যাবে। কিন্তু শুরুর ওই যে ভঙ্গুর বিপথগামী পৃথিবীর ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, তার ওপারে কোনও পৌঁছানোর উপত্যকা ছিল না, পৌঁছে দেওয়ার দিগন্ত ছিল আরও-অস্পষ্ট। এ এমনই এক ধূসর-আলো-আঁধারি সময় যাকে নবারুণ বলেছেন—'পচা, বদ্ধ, অকিঞ্চিৎকর যে কালপর্ব চলছে তা এতই ক্লান্তিকর সর্বোপরি লক্ষহীন কালপর্বে Weight of sad time কে বহন করা যায় না। বহন করার জোব পাওয়া যায় না। তাই হারবার্ট-এ বিষণ্ণতা নয়, শুধু দেখা যায় বিবমিষার বিন্যাস। তাই সে হারবার্ট-এর সংগঠন যেন প্রায় ধ্রুপদী গ্রীক ট্রাজেডিগুলোর রেখা ছুঁয়ে ফেলে, সে উপন্যাস ট্রাজেডি না হয়ে শেষ পর্যন্ত ট্রাজেডির ব্যঙ্গচিত্র হয়ে দাঁড়ায়।

কবিতা লেখা হয় যখন, তখন কিছু কিছু শব্দ কবিদের কলমে এসে জমে। ওই শব্দগুলিকে বলা হয় কাব্যিক। বলা যায় ভাঁপা, গন্ধরাজ, রজনীগন্ধা, এগুলি কাব্যিক ফুল। আবার গাঁদা কাব্যিক নয়। নবারুণ ভট্টাচার্যের লেখায় আমাদের সংস্কার এবং অভ্যাসের যে সমস্ত শব্দ অকাব্যিক সেই শব্দগুলি জড়ো হয়ে, গাঢ় হয়ে যে বাক্যগুলি তৈরি করে তা যে

অনুভব দেয়, তা কবিতারই অনুভব। ঔপন্যাসিকের কবিতার যে তেজ ও স্ফূর্তি, তা ওর গদ্যেও প্রচুর পরিমাণে থাকে। নবারুণের উপন্যাসটি নিয়ে আজ যে এত হৈচৈ—এর একমাত্র প্রধান কারণ ভাষা। তাঁর ক্রুদ্ধ দাবি কর্কশ শব্দ দিয়ে, কবিতার ক্যাকটাস তৈরি হতেও দেখা যায়। শব্দ দিয়ে যে নৈঃশব্দ্যের খেলা তা আজ সমানতালে উপন্যাসে এসেও উপস্থাপিত হয়েছে। ঔপন্যাসিক এই উপন্যাসে শব্দ ও নৈঃশব্দ্যের ভাবনাকে বিস্তৃতি দিয়েছেন। সঙ্গে সময়কে আরেকবার নব-নির্মাণ করেছেন। টিকটিকিটা হারবার্টের বুকের ওপর দিয়ে গিয়ে তার বাঁ হাত বরাবর নেমে গিয়ে দেখল যে হাতটা রক্তের গন্ধওয়ালা ঠাণ্ডা জলে ডুবে রয়েছে। (পৃঃ ২) কিংবা *'কালো পিঁপড়েরা খাবারের টুকরো, দাঁতের ফাঁকে আটকে যাওয়া ও খুঁচিয়ে ফেলা ডালের দানা বা গুড়ো খাবার, শুকনো খাবারের দিকে যায়। লাল ও ডেঁশু পিঁপড়েরা সরাসরি মৃতের নাসারন্ধ্র, শ্লেসমা, চোখ, থুথু মারফৎ ঠোঁটের কোণা জিভের গোড়া, দুর্বল মাড়ি ইত্যাদি পছন্দ করে।'* (তদেব)

স্বাভাবিকভাবে, উপন্যাসের কথাবস্তুর সঙ্গে এই বাক্যগুলির তেমনভাবে সংযোগ নেই। তবে আজকের বিশ্বায়নের যুগে মানবিক সঙ্কট যে একটা ভয়াবহ জটিলতার মধ্যে অবস্থান নিয়েছে, সে দ্বন্দ্ব ও অন্ধকার ঘেরা প্রবহমান মহাসময়কেই ফুটিয়ে তুলতে আমাদের সহায় হয়। ঔপন্যাসিক ইচ্ছে করেই ওই ধরনের বিকল্প বাস্তবকে আমদানি করেছেন যা আমাদের যথাপ্রাপ্ত বাস্তবকে আরেকবার ধাক্কা দিয়ে যায়। লেখকের বয়ানের সঙ্গে স্বাভাবিক জীবন-প্রণালীর তেমন কোনও যথার্থ অবস্থান না থাকলেও বিমানবায়ন প্রক্রিয়ার সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

নবারুণ ভট্টাচার্য উপনিবেশোত্তর ভাবনার প্রয়াসকে বিভিন্নভাবে উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করেছেন। তবে উপন্যাসে সর্বতোভাবে উপনিবেশোত্তর চেতনাকে প্রকাশ করেছেন বিভিন্ন ধরনের ভিন্ন ভিন্ন প্রতিবাদের মাধ্যমে। লেখক খুব সুন্দরভাবে হারবার্টের দুটি প্রয়োজনীয় বইয়ের কথা উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়েই উল্লেখ করেছেন — মৃণালকান্তি ঘোষ-ভক্তিভূষণ প্রণীত 'পরলোকের কথা' যেটি সংশোধিত ও পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ, আর অন্যটি ছিল কালীবর বেদান্তবাগীশ প্রণীত 'পরলোক রহস্য'। এই দুটি বই হারবার্ট তার দাদু বিহারিলাল সরকারের সংগ্রহ থেকে পেয়েছিল। যদিও 'পরলোক রহস্য' ছাড়া কোনও-বই-ই সে সম্পূর্ণ দেখেনি। পাশাপাশি লেখক এও জানিয়েছেন 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস' নামক পুস্তকটি স্বাভাবিক কারণেই হারবার্ট কখনও স্কুলেও দেখেনি। তবে নাট্যমন্দির পত্রিকা থেকে আউট নলেজ সংগ্রহ করার জন্য 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' পড়তে সে ভুল করেনি। এবং এটা থেকে খুব যত্ন করে সংগ্রহ করে মনে রেখেছে দুই সহোদরা অভিনেত্রী সুচিন্ত ও সুকুমারীর নাম। পাশাপাশি ওদের ডাকনামও মনে রাখতে কোনও কার্পণ্য করেনি। এখানে লক্ষণীয় ঔপন্যাসিকের আমাদের বাঙালি মানসিকতা ও ঐতিহ্যকে ইঙ্গিত করে 'পরলোকের কথা' 'পরলোকের রহস্য'-মূলক বাঙালি ঘরানার অতি পরিচিত বইগুলোর প্রতি হারবার্টের মনোযোগ আকর্ষণ করার কোনও ইচ্ছা কিংবা উৎসাহ নেই। বরং এক ধরনের অনিচ্ছাই তার মনোমধ্যে ছেয়ে আছে। পাশাপাশি 'ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস' নামক বইটির সঙ্গে তার কোনও সংযোগই গড়ে ওঠেনি। বাংলা ভাষাচর্চার দিক বিবেচনা করে ব্যাকরণ মূলক বইগুলির গুরুত্ব কোনওভাবেই হেয় করা যায় না। কিন্তু আমরা দেখলাম হারবার্ট-এর মধ্যে এই অনীহা বাঙালির

অস্তিত্ব সংকটের পাশাপাশি উপনিবেশোত্তর ভাবনাকে আরেকবার চিনিয়ে দেয়। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হয়েও ভারতীয় জনগণ কীভাবে পাশ্চাত্য সংস্কৃতিকে ধারণ করেছে পরোক্ষে নিজস্ব জ্ঞান-বিজ্ঞান-পুঁথির প্রতি যে অনীহা প্রকাশ তারই এক বিপ্রতীপ রূপান্তর ঘটিয়েছেন ওই ধরনের কিছু কাহিনির সংমিশ্রণে। প্রথম অধ্যায়ের শেষ দিকে হারবার্ট-এর মধ্যে ব্যাপকভাবে অস্থিরতার চিহ্ন স্পষ্ট হয়েছে। সাতটায় ঘুম থেকে ওঠার পর হারবার্টের আচরণ পাঠকদের স্তম্ভিত করে দেয়—

> *'মালের পার্টি খুব জমেছিল। বালতির মধ্যে অনেকটা বরফ গলে জল জমছিল। হারবার্ট ওদের বলল পাখার হাওয়ায় ঠান্ডাটা ছড়িয়ে ঘর শেতল হবে। হারবার্ট বলেছিল, যা ঘাবড়ে দিয়েছিল। ঐ যে ঘোষ, যে চিঠি দিয়েছিল— শালা তাকিয়ে আছে গোয়াড় জেলের মতো। আর খালি ইংরিজি বলচে, খালি ইংরিজি বলচে। যত বলচে ততসব আমার গোল পুঁটুলি হয়ে যাচ্ছে।' (পৃঃ ৫)*

আজকের সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে এধরনের অসঙ্গতির সুরাহা সহজেই হয়ে যায়। আজকের যুব সমাজের সামনে যে অধিক বাস্তবতার সন্ধান আমাদেরকে কেবল উন্মাদই করে দিচ্ছে তারই প্রকাশ এখানে প্রতিফলিত। অনুষ্ঠানাদিতে মদ্যপান যে একটা ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে তারই ইঙ্গিত পাই ঔপন্যাসিকের এই বয়ানের মধ্য দিয়ে। আলোচ্য অধ্যায়ের শেষ অনুচ্ছেদে দেখা যায় — *'বোতলে একটু রাম থেকে গেল।'* শেষের আগের অধ্যায়ে বলা হচ্ছে মেথর এসে, *'বাকি রামটুকু চুক করে মেরে দিল।'* এই ডিটেলের ব্যবহারে, অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ বিন্যাসে সংগঠন-সচেতনতা এ উপন্যাসে বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। প্রথম অধ্যায়েই হারবার্ট-এর আত্মহত্যার কথা বলা হয়েছে, মাঝখানে সমস্ত প্লটটিকে উন্মুক্ত করা হচ্ছে, আবার শেষের আগের অধ্যায়ে এসে হারবার্টের হয়ে তার শেষকৃত্য বৃত্তান্তে পৌঁছে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মাঝের অধ্যায়গুলিতে প্লটকে উন্মুক্ত করতে গিয়ে নবারুণ যে পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন তা কিন্তু আদৌ flash back পদ্ধতি নয়। কারণ বিভিন্ন সময়েই ঔপন্যাসিক মনে করিয়ে দিচ্ছেন, যে গল্পের মধ্য দিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে এক মৃতের গল্প, প্রকৃত অর্থে জীবন্ত নয় মৃত হারবার্টের কথা। সবকিছু মিলিয়ে ঔপন্যাসিক তার পাঠকদের আলো-আঁধারি, সত্যভ্রমের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিয়ে যান।

'হারবার্ট'-এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে একটি বংশলতিকার পরিচয় রয়েছে। এই বংশলতিকা হারবার্ট সরকার কীভাবে পেয়েছিল বা জেনেছিল তা উপন্যাসের মধ্যে কোথাও বলা নেই, তবে জ্যাঠাইমাকে সঙ্গে নিয়ে পুরি বেড়াতে যাবার সময় যে খাতাটি কিনেছিল এবং টুকেছিল তার থেকে ওই বংশ লতিকার কথা জানা যায়। লম্বোদরভুঁই থেকে শুরু করে প্রসেনজিৎ-ইন্দ্রজিৎ পর্যন্ত সে এক বিশাল সারণী। বিশালত্ব শুধু নামেই নয়, কীর্তিকাণ্ডেও। অদ্ভুত সব চরিত্র, তাদের অদ্ভুত সব বিবরণ। কে যুদ্ধের বাজারের কামানো টাকা ফিল্মে লড়িয়ে বুড়বক বনে যান, কে বেশ্যাসক্ত থেকে *'জেনারেল প্যারালিসিস অব দ্যা ইনসেন'*-এ ভুগেন, কে পাচকের মেয়ের পেট হয়েছিল বলে, *'লিঙ্গে লোহার শিকল বেঁধে ঘোরে বেড়ান, কে কামুক সাহেবদের নেটিভ মাগী সাপ্লাই দিতেন, কার তিনতলা হাঁটু, বিশাল লিঙ্গ, দোদুল্যমান অণ্ডকোষ, জাম্বো যৌনকেশ, কে হাঁড়ি হাঁড়ি চায়ার গন্ধওয়ালা কলার গন্ধগুলা মদ গেলেন— এরকম বংশ লতিকা, বংশ কথিকা বাংলা সাহিত্যে সচরাচর দেখা যায়নি। তবে এ ধরনের*

কিছু নিদর্শন রয়েছে লাতিন আমেরিকার সাহিত্যে, গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া; মার্কেজের 'ওয়ান হানড্রেড অব সলিচিউড' উপন্যাসে। 'উপন্যাস শুরু হওয়ার আগে জোসে আর্কাদিও বুয়েন্দিনা থেকে অরেনিয়োনো—সে এক বিরাট বংশ লতিকা। যদিও সেটা সম্পূর্ণ অন্য এক বৃত্তান্ত।

বংশলতিকা ছাড়াও বইটিতে আছে হারবার্ট সরকারের সঙ্গিসাথী 'লম্পেন প্রলেতারিয়েত'দের কাহিনি। সুকুমার মারিক পশ্চিমবঙ্গে যুক্তিবাদী সংঘ,'পরলোকের কথা' 'পরলোক রহস্য' 'সার্কাসে ভূতের উপদ্রব' 'ভূতের জলসায় গোপালভাঁড়'—এর পৃষ্ঠা থেকে ব্যাপক উদ্ধৃতি, ভূত-আরশোলা-টিকটিকি-মাছি-পরীদের প্রতীকের চলাফেরা, স্যাঁতলাপড়া শহরের একাংশের জীবন-উজ্জীয়ন, কয়লা-মোমবাতি-পঙ্খীরাজ-চৌরঙ্গী-পেটকাটি-চাপরাস-সতরহিত-মুখপোড়া-পনে-বুলুন, নানাবিধ ঘুড়ি ওড়াউড়ি, সত্তরের কলকাতা, ফল অব বার্লিন, আলেকজান্ডার নেভস্কি, মাও-মে-তুং, সোভিয়েত ইউনিয়ন, মলোটভ ককটেলের নকশী, রেডবুক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কলদেব পালিত, মানকুমারী বসু, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজকুমারী দেবী, হিরন্ময়ী দেবী, প্রমথনাথ রায়চৌধুরী, অক্ষয়কুমার বড়াল, নগেন্দ্রবালা মুস্তোফি — কে নেই, কী নেই বইটিতে। উপন্যাসটি পড়ে পাঠকদের মনে হয় এ যেন এক ছন্নছাড়া বিচ্ছিন্ন জগতের ইতিহাসের কথা বলা হয়েছে। লাগামহীন উন্মাদ সময়প্রবাহকে রূপ দিতে এই ধরনের কাহিনিকে উত্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক। সাধারণ কল্পনার বাইরের ঘটনাকে রূপ দিতে অধিকতর বাস্তবকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। উপনিবেশোত্তর শাসনকে প্রতিরোধ করতে লেখকের ওই ধরনের প্রয়াস মূলত সামাজিক প্রতিবাদকে আরেকবার উজ্জীবিত করে দেয়। বস্তুত লেখক নিজেও চান এ পথটিকে দেখতে যার মধ্য দিয়ে উপনিবেশোত্তর চেতনা জাগ্রত হয়ে উঠবে।

লেখক হারবার্টের সমস্ত ধরনের অস্থিরতার মধ্যেও চেতনাকে জাগিয়ে তোলার প্রয়াস কোনও কোনও জায়গায় করেছেন, যদিও সেটা মৃত্যুচেতনা। ঔপন্যাসিক এক জায়গায় জানিয়েছেন—

> *"গঙ্গায় সেই হতভাগ্য অজ্ঞাত পরিচয় মানুষটির অবশেষ বিসর্জন দেওয়ার পরে হারবার্টের মধ্যে চরম দুর্দম মৃত্যু-চেতনা জেগে ওঠে। তার মনে হত সে ঐ ফাঁকা দুটি চোখের কোটরের মধ্যে যেন তলিয়ে যাচ্ছে আর তার চারপাশে নাগরদোলার মতো তারা বা জোনাকির আলো ঘুরছে। ... এবং এরই পরে সে পর্বকথিত 'অতীব প্রয়োজনীয়' দুটি বই আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে পড়া শুরু করে।" (পৃঃ ১২)*

দেখা যাচ্ছে অজ্ঞাত পরিচয় মানুষটির মৃত্যুতে হারবার্টের চেতনা ফিরে এসেছে। এবং এক মুহূর্তের মধ্যেই 'অতীব প্রয়োজনীয়' বই দুটি 'খুঁটিয়ে' পড়তে শুরু করে। লেখক এখানে ইঙ্গিত দিতে ভুল করেননি যে শাশ্বত সাহিত্যের প্রয়োজন আজও ফুরিয়ে যায়নি। সত্যকে জানতে হলে, সনাতনী আদর্শের পথগুলোকে আবিষ্কার করতে হলে নিজস্ব-সংস্কৃতির পাঠগুলো আমাদের জানা উচিত। দাদু বিহারিলাল সরকারের সংগ্রহ থেকে পাওয়া 'পরলোক রহস্য' এবং ভক্তিভূষণ প্রণীত 'পরলোকের কথা' গ্রন্থগুলির প্রতি হারবার্ট সরকারের কোনও ইচ্ছাই জাগেনি কোনওদিন। আজ মৃত্যুচেতনা জেগে ওঠার পর বইগুলো সম্বন্ধে তার জানার ইচ্ছা জেগেছে। হয়তোবা ঔপন্যাসিক আজকের সংস্কৃতি ও সাহিত্যের প্রতি নজরদারি করে পাঠককে এই ইঙ্গিত দিয়েছেন। নিজস্ব সাহিত্য ও ঐতিহ্যকে ছেড়ে গেলেও প্রয়োজনে ফিরে আসতে

হবে নিজেরই ঘরে। লেখকের এই প্রয়াস উপনিবেশোত্তর ভাবনাকে আরেকবার চিনিয়ে দেয়। হারবার্টের কম বয়সী বন্ধু খুড়োববি ও জয়ার মধ্যে ভালোবাসাজনিত প্রেম-কাহিনিকে ঘিরে নবারুণ একটি বাস্তব চিত্র উপহাব দিয়েছেন। এবং অবশেষে খুড়োরবি ভারসাম্যতা হারিয়ে যেভাবে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তার বর্ণনার মধ্যেও লেখকের বিদ্রূপ ভেসে ওঠে। একটি বাস্তব ঘটনাকে বর্ণনার চাকচিক্যে পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। লেখকের বর্ণনায় তাই রয়েছে —

> *"শত শত বছর ধরে চাঁদের আলোয় বা শীতের ভোরে কুয়াশায় তার প্রেম নিয়ে খোড়ারবি ঐ মকাজলে ভেসে থাকবে। তাকে ঘিরে মৎস্যকন্যারা ওলটপালট করবে যারা কাঁদলেও তাদের চোখের জল কেউ দেখতে পাবে না।" (পৃঃ ১২)*

এসব কিছুকে এড়িয়েও বইটির মধ্যে ভিতরে ভিতরে প্রবাহিত হয়েছে ভালোবাসার কাঙাল, স্নেহের কাঙাল হাহাকারে আচ্ছন্ন অপরিণতমনস্ক ৪৩ বছর বয়স্ক হারবার্ট সরকার নামক এক না-বালকের জীবনচরিত। — *"বিডন স্ট্রিটে মাতুলালয়ে, ছাদে ধাতব তারে ভিজে কাপড় মেলার সময় শোভারানী বিদ্যুৎস্পৃষ্টা হন। শিশু হারবার্ট 'মা যাব মা যাব' বলে যেতে গিয়ে হোচট খেয়ে পড়ে কাঁদতে থাকে এবং চিৎ হবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে একটি মুখপোড়া ও একটি পেটকাটির মারাত্মক চিলিপ্যাঁচ দেখে বিভোর হয়ে থাকে।"* আর এভাবেই সে বেঁচে যায়। সেই থেকেই তো শুরু, পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্তন, জ্যাঠাইমা-জ্যাঠতুতো দাদা ভাইপোদের আদরে অনাদারে বেড়ে ওঠা। চিলছাদ, মরা জলের ট্যাঙ্ক, ঘুড়ি এরোপ্লেন-বেলুন-কুলঝাড়ু-প্যারাসুট পাখির প্রতি টান, কিশোর অপুর মতো তোরঙ্গের ভিতর মড়ার মাথা ও কয়েকটা লম্বা হাড় আবিষ্কার।

পুরনো ডাবের খোলা কেটে জ্বালানি বানাবার অছিলায় শব্দ করে ব্যাঘাত ঘটাচ্ছিল বলে ভাইপো ফুচকো ও বুলান একদিন হারবার্টকে ঠ্যাঙালো। সামনে পিছনে ঘুষি খেয়ে হারবার্টের অপরিণত ব্রেন বোধহয় নড়ে গিয়ে থাকবে কারণ তা না হলে পনের বছর আগের ঘটনা আশ্চর্য এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসবে কী করে। আঠারো বছরে 'কাজললতার কালি' হওয়ার বাসনা জাগল। বুকির সঙ্গে প্রেম হল, সে প্রেম ছাদের পাঁচিলে 'ব' হয়ে ঝুলেও থাকল। এখানেও সবকিছু মিলিয়ে যে ছবি আমরা পাঠকরা পাই তার মধ্যে আপাতভাবে কোনও স্থিরতা লক্ষণীয় হয় না। এই অস্থিরতার মধ্য দিয়েই লেখক হয়তোবা এক ধরনের বিদ্রূপ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছেন।

এক সাক্ষাৎকারে নবারুণ জানিয়েছিলেন—

> *'ন্যারেটিভ বা আখ্যানে ব্যক্তি মানুষ তো থাকেই। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্কের কথাও থাকে। কিন্তু আমি কখনোই আখ্যানকে বা উপন্যাসকে ব্যক্তির কাহিনী বলে মনে করি না। ... এরসঙ্গে আর একটা দায় আখ্যানের আছে— সেটা দলিল তৈরী করা, ডকুমেনটেশন। 'হারবার্ট'-এ যে দলটার কথা বলা হয়েছে সেই দলটি একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। এই ডকুমেনটেশটাও আখ্যান রচনার একটি দায়। (পৃ: ৬৭, প্রতিক্ষণ, মে, ১৯৯৪, কলকাতা)*

এই দায় যদিও উপন্যাসের জন্মলগ্ন থেকে অনেকাংশেই অনুপস্থিত তবুও সর্বাংশে নয়। কেবল তথ্যের দিক থেকেই যদি আমরা একটু খুঁটিয়ে দেখি তাহলে দেখব পরাধীনতার

আমল থেকে এই স্বাধীনতার চুয়ান্ন বছর অবধি কেমনভাবে দুমড়ে-মুচড়ে বদলে গেছে আমাদের মানব-সম্পর্কগুলি, প্রাত্যহিক ভালোবাসা ও পারিবারিক সম্পর্কগুলো কেমন করে যে ভেঙে গেছে তার কি কোনও হদিশ পাব? প্রায় দেড়শ বছর আগে যখন জন্ম হয়েছিল বাংলা উপন্যাসের, তখন থেকেই বঙ্কিম বা রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার স্পর্শে বাংলা উপন্যাসের শিল্পরূপ এতটাই মুগ্ধ করে রাখত আমাদের যে, আমাদের আর খেয়ালই থাকত না কথা সাহিত্য প্রতিদিনের মানুষ নিয়েও বা কাজ করে মানুষের প্রতিদিন নিয়েও।

'হারবার্ট' আজকের অবক্ষয়ী সময়স্রোত ও লুপ্তপ্রায় মূল্যবোধের সেই আশ্চর্য উপন্যাস যার স্বল্পায়তনের মধ্যেও ঠাসা থাকে গোটা একটা শহরের ইতিহাস। এমন নিপুণভাবে নবারুণ তাঁর আখ্যান বুনতে থাকেন যে, আমরা যত ঢুকতে থাকি উপন্যাসের ভিতরে ততই হারিয়ে যেতে থাকি, ব্যক্তি হারবার্ট থেকে তার বিরাট বাড়ি, বিরাট বাড়ি থেকে তার বংশ তালিকা, বংশ তালিকা থেকে বাড়ির বিশাল বিশাল চিল-ছাদ, বিশাল চিল-ছাদ থেকে একটা বড় শহর, শহরের অসংখ্য রাস্তাঘাট-বাড়িঘর-দোকানপাট, এমনকী হারবার্টের পূর্বপুরুষের সূত্রে একে একে বেরিয়ে পড়ে এ শহরের পুরনো মুরুব্বিদের মুখ, তাদের নগ্ন চরিত্র, মদ্যপান আর নারীসংসর্গ। আবার তাদের উত্তম পুরুষদের মধ্যে থেকে একদিকে যেমন বেরিয়ে আসে ছাঁট লোহা ও তামার কারবার করা বড়লোক। তেমনি অন্যদিকে প্রগতিশীল ইংরেজির অধ্যাপক, কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থক, কিংবা আরো পরে বিসু, উনিশশো সত্তরের কুখ্যাত রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো নকশাল পন্থী আন্দোলন।

আসলে এ আখ্যানের শক্তি নিহিত এর ডিটেলস ভিত্তিতে এর বিপুল তথ্য-সংগ্রহের পদ্ধতিতে, আমরা যদি একটু খুঁটিয়ে খেয়াল করতে থাকি তবে বোধহয় আমাদের তলিয়ে যাবার মতো অবস্থা হবে। উপন্যাসের সূচনা পর্ব থেকে শুরু করলে বিভিন্ন ঘটনাগুলো যেমন— কমিউনিস্ট পার্টির অনুষ্ঠানে আইজেন স্টাইনের ছবি, গয়লাবস্তির মুখে সরাসরি কল, গুজরাটি দোকানে চানার ঝোল, দেওয়ালে পোঁতা মরচে ধরা লোহার গজাল, বাটওয়ালা ছাতা, ফ্লপ ফিল্ম, ফিল্মের ব্যর্থ নায়িকা, বেশ্যাশক্তি, কুংফু কারাটের ইস্কুল, ইংরেজি স্কুলে পড়া বউ, রেইনবো পোলিও, পার্কের রেলিং, চায়ের দোকান, বুকির সঙ্গে নির্বাক প্রেস, এবং আরও অজস্র মানুষ, তাদের কথা বলার ঢঙে সেকেলে বুলি আর একালের শহুরে খিস্তি মিশে গিয়ে এক অদ্ভুত বাচন, সর্বোপরি তাদের জটিল মানব সম্পর্ক, দুরূহ বেঁচে থাকা। — সবগুলো মিশিয়ে একটা অস্থির কালপ্রবাহ ও ছিন্ন-বিছিন্ন সময়কে ধরতে চেয়েছেন লেখক। পড়তে পড়তে আমাদের যেন ধাঁধা লেগে যায় মাথায়। নবারুণ বোধহয় চানও একটা গোলকধাঁধা তৈরি করতে, কেননা এত রকমের অনুষঙ্গ আর উৎপাদন নিয়ে কাজ করেন তিনি যে-গুলোর হ-য-র-ল-ব বিন্যাসেই উঠে আসে উপন্যাসের আসল স্বাদ বা উদ্দেশ্য। আর এই অসঙ্গতিই সৃষ্টি করেন বেশ পরিকল্পিতভাবেই, বিবরণের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রেখে। বাঙালির গোটা ইতিহাসটাকে গুলিয়ে দেওয়া, ওলোটপালট করা, একটা আছে বলেই অন্যটা নেই বা যে-কোনও কিছুরই একটা উল্টো আরেকটা দিক আছে—এই ভঙ্গিতে নিত্য অদল বদল বা দ্বন্দ্বগুলোকে ধরিয়ে দেওয়া এভাবেই গোটা আখ্যানটাকে সাজাতে থাকেন নবারুণ। টাইম আর স্পেসের নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ভেঙে ফেলতে ফেলতে।

আমরা আসলে বরাবরই ইতিহাসের আলোর দিকটা খুঁজছি, ইতিহাসের জয়ের কিংবা

গৌরবের দিকটা। এতে নিশ্চয়ই কোনও অন্যায় নেই। কিন্তু একথা ভুললে তো চলবে না যে, ইতিহাসের একটা অজ্ঞেয় দিকও আছে, আছে অন্ধকারের দিক, সেটা অনেক সময় আমাদের গৌরবান্বিত হওয়ার উল্টো অভিজ্ঞতাতেও ঠেলে দেয়। আর এই বিবাদটাকে যদি আমরা খেয়াল না-করি তবে হারবার্ট কেন, নিজেদেরও আমরা বাঁচাতে পারব না। নবারুণ তাই দেবেশ রায়কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন—

"হারবার্টের মধ্যে অনেক বিচ্ছিন্নতা আছে। সেই বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস হারবার্ট ও ঐ ছেলেগুলির ভিতর নিহিত আছে। সেই ইতিহাসকে তুলে আনাটা আখ্যান রচনার কাজ। আখ্যান রচনা কখনোই তথা কথিত উপন্যাস রচনা নয়। ... এমন নয় যে উপন্যাসের সীমা ভাঙতেই হবে। উপন্যাসের সীমা মেনে নিয়েও এই বৃহৎকে স্পর্শ করা যায়, সেই বৃহৎ প্রশ্নকে স্পর্শ না-করলে আখ্যানের প্রয়োজন শিল্পগতভাবে স্বীকৃত হবে না। আমার কাছে সেই বৃহৎ প্রশ্নটাই প্রধান।"

এই সূত্র ধরেই বলা যায়, উপন্যাসে সুরপতি মারিককে নিশ্চয়ই আমাদের মনে আছে, হারবার্টকে সে সেদিনের ইতিহাসকেই বদলে দেবে বলে খোয়াব দেখাত, বাড়ি-জমি, ভেড়ি, কয়লা, মোপেড, কমপিউটারাইজড হরোস্কোপ থেকে কামানোই যার লক্ষ্য, সেই সুরপতি মারিক হারবার্টকে বলেছিল—'দ্যাখো ভাই, তোমার ঐ ভূতফুৎ আমি মানি না। ওদের সঙ্গে তোমার কেমন দহরম মহরম তাতে আমার বিশ্বাসও নেই, অবিশ্বাসও নেই'। সুরপতি শুধু চেয়েছিল হারবার্টের সঙ্গে ফিফটি-ফিফটি মালিকানায় মারিক সরকার এন্টারপ্রাইজ তৈরি করতে, যেখানে মৃতের সঙ্গে কথোপকথন করে হারবার্ট পয়সা কামাবে, আর তাই দিয়ে এ সি ঘরে বসে দুজনে মিলে মদ্যপান করবে।

ফলে সুরপতি মড়ার ওপর ঘা দিতে চায়নি। কারণ সে জানত বেচারি হারবার্ট প্রায় মরেই আছে; বরং সে তার এই মরার মতো বেঁচে থাকাটাকে একটু বদলে দিতে চাইছিল, হয়তো সেটাও শেষমেশ হারবার্টের আরেকটা মৃত্যুফাঁদই হয়ে উঠত, কিন্তু অন্তত হারবার্ট নিজেরই দিক থেকে বুঝতে পেরেছিল যে সুরপতি তাকে মারতে চাইছে না। অথচ যেদিন দুপুরে যুক্তিবাদী সংঘের কর্মীরা এসে তাকে শাসাল যে, তার সব বুজরুকি ফাঁস হয়ে গেছে, আর লোক ঠকিয়ে পয়সা কামানো যাবে না, এবারে পুলিশ এসে কোমরে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাবে, সেদিন সে মুহূর্তেই তার ভয় ধরে গেল, মৃত্যুভয় ভাবতে শুরু করল হারবার্ট — 'বিশুকে গুলি করে মেরেছিল পুলিশ, পুলিশ কি তাকেও মারবে।' আর সেদিন রাত্রে আত্মহত্যা করল হারবার্ট। লেখকের কথামত হারবার্ট-এর মধ্যে যে বিচ্ছিন্নতা আছে এবং এই ছন্নছাড়া জীবনের সঙ্গে যে ইতিহাস জড়িত রয়েছে ঔপন্যাসিক তাকেই খুঁজে বার করতে প্রয়াসী হয়েছেন। ফলে উপন্যাসের থিম যে ভাঙতে হবে তা নয়। উপন্যাসের কাঠামোকে মেনে নিয়েও এই বৃহৎকে স্পর্শ করার একটি প্রয়াস করেছেন নবারুণ।

অনেক আগে ছোটবেলায় ভাইপো বিশুর কাছ থেকে হারবার্ট একটা ছড়া শিখেছিল। *'পুলিশের লাঠি, ঝাঁটার কাঠি/ ভয় করে না কমিউনিস্ট পার্টি।'* আশুতোষ কলেজে জিওলজি অনার্স পড়তে আসা সেই বিশুর সঙ্গে খুব অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল হারবার্টের। বিশু তাকে মাও-সে-তুং শুনিয়েছিল। মাও-সে-তুং-লিন পিয়াও-এর ছবি ছাপা রসিদ বই বিশুর কথায় জায়গামতো দিয়েও আসত হারবার্ট। তবু রাজনীতিতে বিন্দুমাত্র ইনভলভমেন্ট ছিল না

হারবার্টের। বস্তুত পুরোপুরি রাজনৈতিক চরিত্র নয় হারবার্ট যদিও লেখক তার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদ প্রতীকীরূপে গড়ে নিয়েছেন। বিশুর মৃত্যুর পর তার ডায়েরির লেখাকে মূলমন্ত্র না-করে তাকে নিয়ে 'স্বপ্নবোয়ে ব্যবসা শুরু করেছে সে। লোক-ঠকানো চিটিং ব্যবসা মৃতের সহিত কথোপকথন'। তবে, বিশুর মৃত্যুর পরে হারবার্ট আর কখনও ভোট দেয়নি। *'প্রত্যেকবার ভোটের দিন ও কোথাও না-যেয়ে চিলছাদে বসে থেকেছে, সেটা ওর কাছে বিশুর প্রতি ট্রিবিউট বলে মনে হয়েছে।'* এই বড় জোর। সুতরাং তাকে নিয়ে লেখা হলেও উপন্যাস পুরোপুরি রাজনৈতিক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। বরং হারবার্টের মন কেমন করে। চিলছাদ, ছায়া, রাত, সকাল, কাজের ডাক, সব কিছুর জন্যে মন কেমন করে। বাবার জন্যে মন কেমন করে। মার জন্যেও মন ভারাক্রান্ত থাকে। সঙ্গে আছে জ্যাঠামশাইর চিন্তা। সবকিছুতেই মায়া টান থেকে যায়, সব কিছুর জন্যই মন কেমন করে।

নিজের ঘরে খাটের ওপরে উপুড় হয়ে বালিশ ভিজিয়ে হাউহাউ করে কাঁদে হারবার্ট। বুকির জন্য কাঁদে। মিথ্যে কথা বলার জন্য কাঁদে—এরকম একটা চরিত্র আঁকতে, তাকে নিয়ে লিখতেও নবারুণ পাশ্চাত্যের আকস্ট্রাক্ট সংগীত থেকে তার স্ট্রাকচার নিচ্ছেন, সেটা কী করে হয়, নবারুণ অবশ্য বলেছেন —

> *'সিমেট্রি বা স্বর সংগতি আর স্ট্রাকচার বা গঠন এই দুইয়ের ভিতরে গভীর মিল আছে, সেই মিল থেকেই আমার শুরু কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর সেই মিলটা ভেঙ্গে গেছে। এখন সিমেট্রি ও স্ট্রাকচারের এই অমিলের ক্ষতটাকে আমাকে মানিয়ে নিতে হচ্ছে।' (তদেব)*

উপনিবেশোত্তর শাসন প্রণালীকে ধরতে গিয়ে ঔপন্যাসিক এমন এক বিকল্প বাস্তবের পথ আমাদের সামনে হাজির করেছেন যার কোনও স্থায়িত্ব নেই। সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'হারবার্ট-পাঠান্তরে' বক্তৃতায় *'হারবার্ট সম্পূর্ণ একটি রাজনৈতিক উপন্যাস।'* যদিও সাধন বলতে ভুলেননি যে 'হারবার্ট' উপন্যাস শুধু হারবার্ট সরকারকে নিয়ে নয়। বিশু ও হারবার্টের দ্বান্দ্বিক রূপকে নিয়ে যেখানে হারবার্ট নিজে একটি নেগেটিভ চরিত্র। একটা অসম্পূর্ণতাকে মনে রেখেই সাধন একথা বলেছেন নিশ্চয়। আমরাও মনে করি উপন্যাসে না হয় আখ্যানে এই অসম্পূর্ণতা ঢেকে দিতে পারেন লেখক নিজেও 'বিবেকের' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে। যেমন হয়েছে সফলতম আখ্যানগদ্য 'ঢোঁড়াই চরিত্র মানস' বা 'চিন্তাপারের বৃত্তান্ত'-এ। এখানে নবারুণ ভট্টাচার্যও বিশুকে দিয়ে যতটা অভাব পূরণ করিয়েছেন, বাকিটা ঢেকে দিয়েছেন নিজের সকৌতুক উপস্থিতিতে।

আসলে আখ্যান বা উপন্যাস বাইরের চলতি বাস্তবকে ধুয়ে পুঁছে, পাঠকও বাস্তবের মাঝখানে দাঁড়াতে পারে এমন পর্যাপ্ত 'আসলবস্তু'-নিষ্ঠ একটি অত্যন্ত সংগতি সম্পন্ন নকল বাস্তবকে বসিয়ে দেয়। হয়তো 'হারবার্ট-পাঠান্তরে' বক্তৃতায় সাধন চট্টোপাধ্যায় প্রদর্শিত তৃতীয় বাস্তবও তেড়েফুঁড়ে উঠে এসেছে 'হারবার্ট'-এ। তবু আখ্যান বা উপন্যাস শুধুই শব্দ দিয়ে রচিত হয়। উপন্যাসেও নাটকের মতো দৃশ্যপট, অ্যাকশন, আসল কিছু বস্তু ও মানুষ থাকে। আখ্যান বা উপন্যাসের পক্ষে রক্তখচিত শুধু স্টাইল একটা মস্ত বিড়ম্বনা, মস্ত অসুবিধা। কারণ তা সামগ্রী থেকেও মানুষ থেকে আমাদের চোখকে শব্দের দিকে সরিয়ে নেয়, মানুষ নিয়ে ফাঁকগুলো ভরাট হয় না। আধুনিকোত্তর সমাজ ব্যবস্থায় চোখের পলকে চটজলদি যখন সবগুলো পাল্টে

যাচ্ছে, নিজস্ব সমাজ সংস্কৃতি বলে যখন কিছু থাকছে না আর, —ছদ্ম বাস্তব যখন গিলে ধরেছে আমাদের সে মুহূর্তে একজন সচেতন লেখক সাধারণভাবেই তাঁর ক্ষোভ কিংবা আক্ষেপ প্রকাশ করবেন, এটাই প্রত্যাশিত। উপনিবেশোত্তর শাসনকালে লিখতে বসে নবারুণ একদম শুরু থেকেই উপন্যাসের মধ্যে এমন এক স্টাইল ব্যবহার করেছেন যার সমস্ত দিক জুড়ে আছে তীব্র প্রতিবাদ। শব্দ-ভাষা-কাহিনি চরিত্র-চিত্রণ খুটিনাটি সবগুলোর মধ্যেই তিনি প্রকাশ করেছেন বিদ্রূপ। ফলে শব্দচয়ন, বাক্যগঠন, কাহিনির দ্বন্দ্ব প্রভৃতি সবগুলো বিষয়ের মধ্যে অ্যাবসার্ডিটি-কেই গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। বলা যায় লেখক ইচ্ছা করেই এমন এক fantasi-কে নিয়েছেন। যুগের আবহকে ধরতে চেয়ে তাঁর এই প্রয়াস। বিপথগামী-বিক্ষুব্ধ সমাজ বাস্তবের বিপ্রতীপে উঠে এসেছে লেখকের এই ইচ্ছা। উপন্যাসে অজস্র জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে এইরূপ রূপরেখার চিহ্ন ঃ

'আমার নাম হারবার্ট। আমি বাট। বাট দেখব। এবার লাট দেখবে।'
'সখমোলায়েম ঘাসফুলেল মাঠে হরি পরিদের খেলা।'
'ঘুড়ি, এরোপ্লেন, বেলুন, ঝুলঝাড়ু, মানুষ, প্যারাসুট, পাখি—সবই এক সময় নেমে আসে। অথচ তার আগে ওঠে। ওটাও ওঠে। নেমে আসে।'(পৃঃ ১৩)

'মানুষ যদি ১ হয় তা হলে ০ হল মরা মানুষ। মানুষ + মরা মানুষ = ১+০= খোড়ারবি' ১৪ (তদেব)

"ফাঁকফোকড়ে জলের হেয়ালি
ঢাকনা পেড়ে শাড়ির খেয়ালী।"—হারবার্ট (পৃঃ ১৩)

কিংবা *'পেঁদিয়ে তাড়াব, বলব কী? এত বছরের ভাতকাপড়— হিসেবটা হোক না! খাল খিঁচে দেব না বাঞ্চতের! তারপরই দুম করে ইন্দ্রিয়রাম দেহাত্মবাদীদিগের মন পরলোক বুঝিতে অক্ষম ইহাদের মনে-শরীর, ইন্দ্রিয় ও ভোগ্য বিষয় লইয়াই সর্বদা ব্যতিবস্ত ও ব্যাসক্ত'* ...ইত্যাদি ইত্যাদি। (হারবার্ট)

তৃতীয় সহস্রাব্দের সম্মুখে দাঁড়িয়ে এতদিনকার অর্জন ব্যর্থতা সম্ভাবনার স্বপ্নগুলো এক এক করে তলিয়ে যাওয়ার ফলে এই যে প্লবগতা, লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটা উলম্ফন — এর ফলেই লেখকের চিন্তা ও অনুভূতি উপলব্ধির মধ্যে রয়েছে অজস্র কূটাভাস, শূন্যায়তন ও গোলকধাঁধা। ফলে তাঁর সন্দর্ভ তৈরি হয়ে উঠতে না উঠতেই মাঝপথে ভেঙ্গে যায়। আসলে ভেঙ্গে যাচ্ছি আমরা নিজেরাই। ফলে সব ধরনের ভাবাদর্শ, স্বপ্ন, বিশ্বাস, কিংবা নির্মাণ-আকাঙ্ক্ষাকে প্রচলিত টেক্সট-এর রীতি রেওয়াজ থেকে প্রত্যাঘাত হওয়ার স্রোত প্রতিফলিত হতে দেখা যায় আজকের লেখকের বয়ানে। নব্য ঔপনিবেশিক শোষনের বিরুদ্ধে ঔপন্যাসিকের উপনিবেশোত্তর চেতনাকে ঘুরিয়ে আনতে আমাদেরকে দৃষ্টি যোগায়। এটাই বোধহয় নবারুণের স্টাইল, নবীনতম আবিষ্কার। সর্বত্র ব্যস্ত বিভ্রমের এই কালবেলায় সময় সম্বন্ধে কারো ধারণা যখন স্পষ্টভাবে গড়ে ওঠে না ঠিক সেভাবেই হারবার্ট উপন্যাসও আলো-আঁধারি অস্পষ্টতায় ছেয়ে আছে।

১৯৯৪ সালের মে মাসে এক সাময়িক পত্রের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা-বার্তার সময় নবারুণ জানিয়েছিলেন যে, সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের মতো সাংঘাতিক ঘটনার অভিজ্ঞতার অভিঘাত থেকেই তিনি হারবার্ট-এর মতো উপন্যাস লেখার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন তীব্রভাবে। হারবার্ট পড়তে গিয়ে পাঠকরা বুঝতে পারেন উপন্যাসের মধ্যে সমাজের, সংসারের, আর রাজনীতির চাপ কত তীব্র ও দুঃসহনীয়। চরিত্রগুলোর মধ্যেও রাজনীতির অভিঘাত আসে কত বৈচিত্র্যে কত তীর্যকতায় কত অ-রাজনৈতিক ভঙ্গিমায়।

ইতিহাসের নিজস্বতায় আমাদের এই সময়ের এক উদ্ভটত্ব তৈরি হয়ে গেছে। ১৯৬৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত আড়াই দশকে ছড়ানো সেই ইতিহাসে আমাদের এক সময়ের আশ্রয় বামপন্থী আন্দোলন, তার প্রকৃত আশার ক্ষেত্রগুলি একের পর এক বিসর্জন দিয়েছে। সারা পৃথিবীর মানুষের প্রেরণা হিসেবে ছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির আশাশীল অস্তিত্ব, অবসান ঘটে গেছে তারও। সেই অবসানের মধ্যে নিশ্চিতভাবেই ছিল আত্মবিনাশী বীজের এক মস্ত ভূমিকা। গ্রিক ট্র্যাজেডিতে নায়ক যেমন তার নিজেরই অভ্যন্তরে বয়ে বেড়ায় নিজেরই সর্বনাশের বীজ, মানুষের জীবনের প্রতিটি নায়ক প্রতিটি মানুষই তেমনি বয়ে বেড়ায় তার নিজের সর্বনাশের বীজ। মানুষের মুক্তির জন্য মানুষেরই হাতে গড়া আন্দোলনও এই বিনাশী বীজ বহনের অভিশাপ থেকে মুক্তি পায়নি। এদেশেও নয়। এ রাজ্যেও নয়। 'হারবার্ট-প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে নবারুণ ভট্টাচার্য লিখতে গিয়ে জানিয়েছেন—

> *"হারবার্ট লেখার সময় দুনিয়ায় বামপন্থার শোচনীয় সময়। একজন বামপন্থী মানুষ ও লেখক হিসেবে সেই দুঃসময় আমাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেছিল। তার সবটা ধাক্কা এখনও আমি কাটিয়ে উঠতে পারিনি। চোখের সামনে সমাজতন্ত্র ইতিহাস হয়ে যাবে, অকেজো ও হাস্যকর বলে পরিত্যক্ত হবে ... — এ মেনে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। 'হারবার্ট' একভাবে আমার রাজনৈতিক প্রতিবাদ — বিস্ফোরণ ঘটবেই। ... এই কথাগুলোও নানাভাবে হারবার্ট-এর মধ্যে রয়েছে।"*

সময়ের এই বৈশিষ্ট্যই কেড়ে নিয়েছে হারবার্ট-এর মতো চরিত্রের সংগতি ও স্বাভাবিকতা। মানে, যা দিয়ে আমরা সংগতি, স্বাভাবিকতা কখনও কখনও মানসিক ভারসাম্যকে সাধারণ ভাবে চিনি। হারবার্টের জন্ম ১৯৪৯, আর আত্মকথন ১৯৯২-তে। এই উত্তপ্ত সময়ের ইতিহাসের মধ্য দিয়ে বড় হওয়া একজন মানুষ হিসেবে হারবার্ট যেন আমাদের এক দৃষ্টান্তের সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। যে কলুষ যে দূষণ সারা পৃথিবী জুড়ে বামপন্থী আন্দোলনের বিভিন্ন দেশের উন্নয়নমূলক কাজকর্মের স্বাভাবিকতা কেড়ে নিয়েছে আমরা সকলেই তার শিকার। আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের হারবার্ট সরকার, স্বপ্নময় তাঁর আলোচনায় যাকে বলেছেন 'রক্তমাংসের চরিত্র' সেই বিশু, এবং অবশ্যই আমরা প্রত্যেকেই। আর অন্যদিকে চৈতন্যে সেই নকশাল পন্থার স্পর্শ বঞ্চনার মৃতের সঙ্গে কথোপকথনের দাবিদার হয়ে উঠল বলেই হারবার্ট সাযুজ্যের অভাবে ক্লিষ্ট, স্পষ্ট, ইমেজহীন 'প্রকৃত চরিত্র নয়' এমন এক চরিত্র।

উপনিবেশিত্তোর সময়ের গভীরে নিহিত অযৌক্তিকতাই এখন ব্যক্তি আচরণের, অযৌক্তিতার, ভারসাম্যহীনতার নির্মাতা। এছাড়া আর কোনওভাবেই ভাবা যাচ্ছে না 'হারবার্ট'-এর মৃত চরিত্রকে এবং 'হারবার্ট' উপন্যাসের অন্যান্য চরিত্রকে। জর্জ লুকাও তাঁর 'ডেস্ট্রাকশন

অব রিজন' বইতে দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে প্রতিটি ব্যক্তিচৈতন্যের গভীরে নিহিত যুক্তিহীনতার অযৌক্তিকতার উপাদানগুলি সযত্নে ব্যবহার করতে করতে একদিন ফ্যাসিবাদের সর্বগ্রাস সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম ফসলগুলিকে গিলে নিতে চায়। হারবার্ট-উপান্যাস আমাদের চেনা যুক্তি শৃঙ্খলার জগতের ভাঙ্গন ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। উপান্যাসটির অন্তঃপাঠে বোঝা যায় যে দলটির কথা হয়েছে সেই দলটির নির্মাণ ও ধ্বংস একটি সামাজিক প্রক্রিয়া। কী গভীর বিচ্ছিন্নতা হারবার্ট ও অর বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে, পৃথিবীর কোনও কিছুর সঙ্গে তাদের যেন কোনও সংলগ্নতা নেই। বস্তুত, আজকের যুগে নিজেদেরই সংবেদন, উপলব্ধি আর অভিজ্ঞতা দিয়েই নিজেরাই পারি ওই বিচ্ছিন্নতাকে স্পর্শ করতে। সেই স্পর্শক্ষণেই টের পাই হারবার্ট আমাদের চেনা, কত আপন চরিত্র, কোথাও কোথাও তা ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে হুবহু মিলে-মিশে একাকার হয়ে যায়। তার জন্মের, বেড়ে ওঠার, পূর্ব-পুরুষের ফেলে যাওয়া ঐতিহ্যের, পারিবারিকতার, সমাজ ও সংঘাতের রাজনীতির, স্বদেশের, আন্তর্জাতিকতার সব, সবটুকু মিলিয়ে হারবার্ট। সে এই সমাজের এমন এক চরিত্র যে নিজের অস্তিত্ব ও মরণ দিয়ে অন্ত্যেষ্টিকালীন বিস্ফোরণ দিয়ে আপাত শান্তিকল্যাণময় অথচ ছিন্নভিন্ন এই সময়ের উদ্ভট আধুনিকতাকে চিনিয়ে দিতে পারে। সময় বিধৃত মানুষ চিরকাল উপন্যাসের বিষয়। তাই সমাজ ও পরিবেশের দুইমাত্রা ছাড়া চরিত্রের ব্যক্তিত্বের তৃতীয় মাত্রাটি কখনোই যুক্ত হয় না। সমাজ, পরিবেশ আর ব্যক্তি — এই তিনমাত্রার মিলনেই জোটে শিল্পের চতুর্থ মাত্রা। আর নবারুণ তাঁর পাঠকদের চতুর্থমাত্রার নাগাল এনে দিলেন।

উপনিবেশোত্তর সময়ে নব্য-ঔপনিবেশিক প্রভুদের কল্যাণে আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর যেভাবে ব্রহ্মাণ্ড পুড়ছে, ইতিহাস পুড়ছে, সভ্যতা পুড়ছে, দাউ দাউ করে আগুনে ছাই হয়ে যাচ্ছে এতদিনকার সমস্ত উপার্জন। পরিণাম বলে কিছু নেই। পরিণাম এক বিভ্রম, এক প্রহসন মাত্র। ফলে প্রতিবাদটা ঠিক কোথায়, উপনিবেশোত্তর চেতনা সম্পৃক্ত উপন্যাসে এই প্রতিবাদের ধরণটা ভিন্ন ভিন্ন। আলাদা আলাদাভাবে লেখক তার পথ খুঁজে নেন।

হারবার্ট উপন্যাসের নবম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে হারবার্টের শেষকৃত্য। সে আত্মহত্যা করেছে। মৃত্যুর পর তার সুইসাইড নোট পাওয়া গেছে। বুক পকেট থেকে এক টুকরো ভাঁজ করা কাগজ বের হয়। সেই কাগজে লেখা ছিল —

"চৌবাচ্চার তেলাপিয়া গঙ্গাসাগরে চলল।
দোবেড়ের চ্যাং দেকবি? দোবেড়ের চ্যাং
দেকাব? ক্যাট ক্যাট ওয়াটার ডগ ফিশ।" (পৃঃ ৫৭)

হারবার্ট সরকার—

আপাতভাবে এই সুইসাইড নোট থেকে কোনও নির্যাস ওঠে আসছে কি, পাঠকরা নির্দিষ্ট কোনও সমাধান পায় না। তবে উপন্যাসে হারবার্টের কথা বয়নে বিকল্প ধরনের যে প্রতিবাদ লেখক বর্ণিত করেছেন যার মধ্যে কিছু ধরা না গেলেও একটি ক্ষোভ-ঘৃণা প্রতিফলিত হয়েছে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তারই অন্য বহিঃপ্রকাশ পাওয়া গেল এই সুইসাইড নোটের মধ্যে। সমস্ত ধরনের বিনির্মাণকে একত্র করে লেখকের এই প্রয়াস আমাদের চেতনাকে আবার জাগিয়ে দেয়। শোভাযাত্রার শোকমিছিলে জনতার দিকেও লেখকের দৃষ্টি রয়েছে— 'চুক চুক

করে বাংলা খাওয়া শুরু হয়ে যায়। খাটে করে র-মাল একটু গলায় ঢেলে বোতলটা কোমরে পেটের কাছে গুজে রাখা। গামছাটা ওপর দিয়ে শক্ত করে বাঁধা।' (পৃঃ ৫৪) আশ্চর্য সময় সন্ধানী লেখক উপনিবেশোত্তর সময়ের ভাষ্য উত্থাপিত করেছেন।

আমাদের ইতিহাসের সৌধগুলো যখন এক এক করে ভেঙ্গে পড়ছে, যথাপ্রাপ্ত বাস্তবের বিরুদ্ধে আমরা যখন নীরব, আলো থেকে ছায়া যখন আমাদের সামনে অধিক ঠিক সেই মুহূর্তে নীরবতার মধ্য দিয়েই লেখক প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেয়েছেন। সে এক আশ্চর্য প্রতীকের মাধ্যমে। হারবার্টকে চুল্লিতে উঠিয়ে দেওয়ার পর ঠিক পরবর্তী মুহূর্তের বর্ণনায় রয়েছে —

"এমন সময়ে সকলকে সচকিত করে প্রথমে একটি ছোট বিস্ফোরণ শোনা যায়। বালতি চাপা দিয়ে চকোলেট বোমা ফাটালে যেমন হয় তেমন—ডুম! / এর রেশ কাটতে না কাটতে আরও বড় একটি। তারপর ক্রমাগত আরও জোরে আরও জোরে। চুল্লির দরজা ধড়মড় করছে। লোক ছুটাছুটি করতে শুরু করে। .... চুল্লির ওপর থেকে দেওয়ালের কিছুটা উড়ে গিয়ে, ইট, বালি, কাকড় ছিটকে বেরোয় ও সেখানে দিয়ে বিস্ফোরণের গন্ধক গন্ধ মাখা নানা বর্ণের ধূম নির্গত হয়।" (পৃঃ ৫৬)

পরবর্তীতে ইনভেস্টিগেশনে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল অভূতপূর্ব ঘটনাটি নিয়ে। অনেকে 'সাইড হিউম্যান বম্ব' তুলনা দিয়ে হারবার্টকে 'ডেড হিউম্যান বম্ব' বলে অভিহিত করেছেন। তবে এগুলোকে বাদ দিয়ে দেখি চুল্লি মূলত একটি প্রতিষ্ঠান। হারবার্ট যে মানুষটি জীবিত থাকতে কোনও প্রতিবাদ করতে পারেনি অচলায়তনের বিরুদ্ধে, সে-ই মৃত্যুর মধ্য দিয়ে শ্মশানে শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে এই ধরনের বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে হারবার্টের প্রতিবাদকে আমাদেরকে নতুন দিকে ঘুরিয়ে দেয়। সাধারণত দেখা যায় বস্তুকে আঘাত করতে না পারলে তার প্রতীককে ধূলিস্মাৎ করার প্রয়াস রয়ে যায়। লেখক যখন বলেন —

'আমি এক হারবার্টকে চিনতাম। সে ছিল অতীতের এক প্রসিদ্ধ সন্তান এবং যখন দেখেছি তখন সরাফিনঘোর নামটা তার থেকেই নেওয়া। এরকম অনেক রকমের হারবার্টদের সঙ্গে আমার জীবনের অনেকটা সময় কেটেছে।' (হারবার্ট-প্রসঙ্গ ঃ নবারুণ ভট্টাচার্য, ৩ জানুয়ারি ১৯৯৬)

সেই বাস্তব চোখে দেখা মানুষটি যখন জীবনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে মারা গেল, তার গভীর দুঃখ-যন্ত্রণা-প্রেম ভালোবাসার কোনও নির্দিষ্ট মূল্য থাকল না তখন চুল্লির মধ্য দিয়ে বিস্ফোরণের ভাষা আমাদের ঘুমিয়ে পড়া চেতনাকে আরেকবার জাগ্রত করে দেয়। উপন্যাসে লেখকের বিবেকহীন বাস্তবের বিরুদ্ধে সবসময়ই প্রতিবাদ করেছেন। উপনিবেশোত্তর শাসনের বিরুদ্ধে লেখকের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রতিবাদ এভাবেই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। *'ক্যাট, ব্যাট ওয়াটার, ডগ, ফিশ! সম্ভবত নিছকই উন্মত্ততা।'* (পৃঃ ৫৭) তবুও উপন্যাসে একটি কাহিনির মধ্যে আরেকটি কাহিনি ঢুকিয়ে দিয়ে অজস্র টুকরো কথা যেভাবে রূপায়িত করেছেন তার মধ্য থেকেই নবারুণ উপনিবেশিত্তোর চেতনাকে উন্মুক্ত করার প্রয়াস করেছেন। আর এই উসকে দেওয়ার প্রচেষ্টার মধ্যেই আমরা উপন্যাসে উপনিবেশোত্তর ভাবনাকে চিনতে পারি। এভাবে আগাম ইঙ্গিত দিতে গিয়ে লেখক জানিয়েছেন—

'হারবার্টের রক্তহীন মৃতদেহ দাহ করার সময় যে জঘন্য ঘটনা ঘটেছিল তা অবধারিত

ভাবে এই ইঙ্গিতই দিয়ে চলে যে কখন, কোথায়, কীভাবে বিস্ফোরণ ঘটবে এবং তা কে ঘটাবে সে সম্বন্ধে জানতে রাষ্ট্রযন্ত্রের এখনও বাকি আছে।' (পৃঃ ৫৭)

লক্ষণীয় নবারুণ উপন্যাসের নামকরণ থেকে শুরু করে আদি-অন্ত পর্যন্ত বিনির্মাণের মধ্য দিয়েই এগিয়েছেন। সর্বাবস্থায় তিনি যেন এক নতুন পৃথিবীর ছবি এঁকেছেন। উপনিবেশোত্তর চেতনা সম্পৃক্ত সাহিত্যে 'দূরীকৃত ও প্রত্যাখ্যাত' দৃশ্যের ছবি আঁকার যে প্রয়াস পুঞ্জীভূত হচ্ছে আজ, ঔপন্যাসিক নবারুণ সে পথের পথিক। খেয়াল করলে দেখা যায় উপন্যাসের লেখক এক অদ্ভূত পেটার্ন নিয়েছেন টেক্সটটি রচনার ক্ষেত্রে। উপন্যাসের দশটি পরিচ্ছদে প্রত্যেকটিতেই শুরু হয়েছে কিছু কবিতার পংক্তির সংযোগে ঃ

'চরণে বন্ধন নাই, পরাণে স্পন্দন নাই
নির্বাণে বসিয়া থাকি স্থির চেতনায়।' (পৃঃ১)
—বিজয়চন্দ্র মজুমদার

'বৃথা আসি বৃথা যাই
কিছুই উদ্দেশ্য নাই।' (পৃঃ ৫৮)
—অক্ষয়কুমার বড়াল

এছাড়াও রয়েছেন — বলদেব পালিত, মানকুমারী বসু, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেক। এই কবিতাগুলির ব্যবহার ঔপন্যাসিক ঠিক কী উদ্দেশ্যে করেছেন তা আদৌ স্পষ্ট নয়। তবে উপন্যাস পাঠে দেখা যায় লেখকের যে স্টাইল সূচনা থেকে শেষ অব্দি রয়েছে তার মূলে রয়েছে প্রবহমান অস্থির সময় ও সমাজ। ছন্নছাড়া যে বিচ্ছিন্ন জীবনের রং ও তার থিম আবিষ্কার করেছেন ঔপন্যাসিক যার সঙ্গে আমরা পরিচিত হয়েও পরিচিত নই, সেই ভাবনাকে জমায়িত করতে তাঁর এই ধরনের প্রয়াস খুব একটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। দোদুল্যমান উদাসীন সময়ের absurdity কে আঘাত করতে গিয়ে নবারুণ তাঁর লেখার মধ্যে ও বয়ানে 'অসংগতি'কে নিয়ে আসতে বারংবার আঘাতে আঘাত করে প্রতিরোধ গড়ে নিয়েছেন তাঁর টেক্সট-এর প্রান্তিক বিন্দু পর্যন্ত। আর এই প্রতিরোধের ইশারাই মূলত উপন্যাসের উপনিবেশোত্তর চেতনাকে চিনিয়ে দিতে আমাদের সাহায্য করে। প্রতিষ্ঠানিকতার পাশাপাশি সমাজে যে প্রতাপ রয়েছে এবং যারা আমাদের আলো-হাওয়া-মাটি ও আকাশকে শুষে নিতে চায় তাদের বিরুদ্ধে লেখকের 'হারবার্ট' উপন্যাসটি মূলত বিদ্রোহ এবং সংঘর্ষের হাতিয়ার।

সাধারণভাবে সাহিত্য বলতে আমাদের মধ্যে যে আদলটির ধারণা রয়েছে তার খোলনলচে পাল্টে দিতে চায় উপনিবেশোত্তর চেতনা। শুধুমাত্র বৌদ্ধিকতায় মানুষের অস্তিত্বকে টুকরো করে না-দেখে তার সমগ্র সত্তাকে বিশ্লেষণ করে নির্মীয়মাণ ইতিহাসের পটে। ফলে এই ধরনের সাহিত্য-সমালোচনা ও তাত্ত্বিক প্রস্তাবনাও ভিন্ন গোত্রের হতে বাধ্য। 'হারবার্ট' উপন্যাসে সমস্ত ধরনের বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে নবারুণ ঔপনিবেশিক নির্মিতিকে অন্যান্যদের মতো প্রত্যাখ্যান করেছেন। আর সেই সঙ্গে আলাদা-আলাদাভাবে প্রান্তিকায়িত সত্তাকে নানা প্রকরণে আখ্যানের বিভিন্ন বিন্যাসে পুনরাবিষ্কার করতে চেয়েছেন।

■ *লেখক নিলামবাজার কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, বিশিষ্ট তরুণ প্রাবন্ধিক ও বাংলা সাহিত্যের গবেষক।*

খোয়াবনামা ঃ অস্থির সমাজ ও বিমূর্ত সময়ের দলিল

রূপরাজ ভট্টাচার্য

আমাদের এই জটিল, যন্ত্রণাদীর্ণ, ব্যথাময় সময়ের এমনই এক বৃত্তান্তকার আখতারুজ্জামান, যিনি কবি-জননীর মতোই সময়-পৃথিবী মানুষের আখ্যান বর্ণনায় হেঁটে গেছেন কড়া রৌদ্রের জগতে। সময়-মানুষ ঘিরে সমাজের যে চরিত্র তার সন্ধানেই প্রচলিত বয়ান থেকে, জীবনযাপনের আপাত-দৈনন্দিনতা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি আমাদের দীক্ষিত করেন দেশ-কাল-মানুষেরই অপরাপর এক সমান্তরাল বয়ানে।

কথাসাহিত্যের জগতে আখতারুজ্জামান নতুন কথনশৈলী ব্যবহার করলেন। একটু অন্য স্বরে কথা বলেছেন। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ 'খোয়াবনামা'। চলতি হাওয়ার পন্থী হয়ে তথাকথিত মনমজানো চোখ ধাঁধানো উপন্যাস রচনা করেননি। তাঁর উপন্যাস সহজ-পাঠ্য নয়। কারণ, জটিল সময়ের কথার উপস্থাপন তো জটিল হবেই। এ সম্পর্কে ঔপন্যাসিক ইলিয়াস বলেন — *"উপন্যাস গঠিত হবে সেইভাবে যাতে করে নতুন ভাবনাকে ঠিকমতো ধারণ করতে পারে। নইলে এই সময়ের মানুষের বেদনা ও বিক্ষোভ, সঙ্কট ও সঙ্কল্পের তাৎপর্যপূর্ণ প্রতিবেদন দেওয়া উপন্যাসের সাধ্যের বাইরেই থেকে যাবে।" (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারক গ্রন্থ ঃ সম্পাদনা সমীরণ মজুমদার, অমৃতলোক, কলকাতা)* আখতারুজ্জামান 'খোয়াবনামা'-য় সেই কথা নিজেই রেখেছেন। সময়কে ইলিয়াস উপন্যাসের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অর্থাৎ প্রধান স্থান দিতে চেয়েছেন। বলা ভাল দিয়েছেনও।

আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের দুটি উপন্যাস—'চিলে কোঠার সেপাই' ও 'খোয়াবনামা'-য় সময়কে বর্হিমুখী ও অর্ন্তমুখী—এই দু'ভাবেই পাওয়া যায়। তাঁর উপন্যাসের কাহিনিও কিন্তু বিগত কালের। অর্থাৎ যে সময়ে বসে ইলিয়াস লিখেছেন তাঁর উপন্যাস, তার কাহিনি তারও অনেক আগের। বিশেষ করে 'খোয়াবনামা'-র কথাই বলা যায়। ঔপন্যাসিক হিসেবে আখতারুজ্জামান তাঁর সম-সময়ের রুদ্ধশ্বাস জীবনে দাঁড়িয়ে অতীতের কথা বলেছেন, যেখানে বর্তমান সময়-পরিসর এবং অতীতের সময়-পরিসর একসঙ্গে মিশে থাকার চেষ্টা করে। আসলে, সময় আমাদের বাস্তব এবং মনের,— উভয় দিক থেকেই ক্রমাগত গড়ছে আর ভাঙছে। আর তারই দোলাচলে বা বলা যাক, তারই আকর্ষণে সময় শরীরী হয়ে ওঠে কখনও কখনও। আর তা তখনই সম্ভব, যখন সময় বা সমাজ সচেতন কোনও লেখক তাঁর নিজের আর পরিপার্শ্বের অস্তিত্ব বিষয়ে প্রশ্নময় হয়ে ওঠেন। সমস্ত অতীত আর ভবিষ্যৎকে আজকের সঙ্গে মিশিয়ে নিয়ে স্পষ্টতর ভাবে গড়ে নিতে চায় লেখকের বর্তমান সময়। বিমূর্ত সময়কে আখতারুজ্জামানও এভাবেই মূর্ত করে তুলেছেন। তিনি যে সময়কে তাঁর উপন্যাসের বিষয় করেছিলেন সেই সময়টাকে 'বিমূর্ত' না-বল্লেও, এ কথা দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায় যে, তাঁর উপন্যাসের সময় উপন্যাসে স্থান পাবার আগে ইতিহাসের তথ্য নির্ভর পৃষ্ঠায় আশ্রয় নিয়েছিল। কিন্তু আখতারুজ্জামান সেই প্রায় 'ফসিল' ইতিহাসের সময়কে জীবন্ত করে তুলেছেন।

আর, পাঠক হিসেবে আমাদের এই যাপিত-জীবনের পাশাপাশি উপন্যাসের অতীত সময়কে কোনওভাবেই অতীত বলে মনে হয় না। এখানেই ইলিয়াসের সার্থকতা। লেখক

যেমন তাঁর ফেলে আসা সময়কে নিয়ে বা অতীত সময়কে নিয়ে লিখতে গেলে তাঁর বর্তমান সময়কে সামনে রেখে বিগত সময়কে বিচার করেন; তেমনি পাঠকও তাঁর সম-সময়ের আয়নায় উপন্যাসের বর্ণিত সময়কে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করে। যখন পাঠক তার বর্তমান সময়কে সম্বল করেই উপন্যাসে বর্ণিত বিগত সময়ের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার যাপিত সময়ের অভিজ্ঞতা দিয়ে উপন্যাসের অতীত সময়কে অনুধাবণ করতে পারে। শুধু অনুধাবণই নয়, বিগত সময়কে তার বর্তমান সময়ের সঙ্গে মেলাতে সমর্থ হয়; তখনই সেই উপন্যাসের প্রাসঙ্গিকতা। আখতারুজ্জামানের উপন্যাস শুধু সময়ের সাক্ষী হয়ে থাকেনি; সময়ের হৃদস্পন্দ তার উপন্যাসে প্রবলভাবে অনুভব করা গেছে।

উনসত্তরের গণ-আন্দোলনের সময়কাল তাঁর 'চিলেকোঠার সেপাই' উপন্যাসে মূর্ত হয়ে উঠেছে। তারপর — 'খোয়াবনামা' — যাকে লেখক বলেছেন 'স্বপ্নপুরাণ' — এখানে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পূর্ব-পাকিস্তানের সৃষ্টির কাহিনি বিধৃত। ঔপন্যাসিক দুই আপাত ভিন্ন সময়কে দুটি উপন্যাসে আশ্রয় দিয়েছেন। সময়-পরিসরকে তিনি হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন বলে পাঠকের মনে সে উপন্যাস দুটি তাই নাড়া দিতে পারে সহজেই। আমরা ইতিহাস পড়তে বাধ্য না-হলেও সকলেই যে ইতিহাসের বাধ্য—এ সত্য ধরা পড়েছে তাঁর উপন্যাসে।

নিরন্ন-নিরাশ্রয় মানুষ স্বপ্ন দেখার মধ্যে তো বাঁচার নতুন অর্থ খুঁজে ফেরে। 'খোয়াবনামা' উপন্যাসে লেখক সে সত্যকেই প্রকাশ করেছেন। আসলে সত্যিকার অর্থে খোয়াবনামা কি মানুষের ভাগ্যের নিয়ামক! ভাগচাষী-শ্রমিক অর্থাৎ খেটে-খাওয়া মানুষ সামাজিক-অর্থনৈতিক বিভিন্ন কারণেই হয় পর্যুদস্ত; কিন্তু স্বপ্নই তাদের শেষ সম্বল, অন্তত ক্ষণিক আশ্রয়। ঔপন্যাসিক মাটির মানুষকে অবিকল রূপ দিয়ে হাজির করেছেন 'খোয়াবনামা'য়। ইলিয়াস মানুষের ছবি আঁকতে গিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্মতর বিষয়কেও এড়িয়ে যাননি। গ্রাম্যজীবনের নাড়ীকে তিনি স্পর্শ করতে পেরেছিলেন বলেই মানুষের হৃদস্পন্দনও শোনাতে পেরেছিলেন। — তবে সমাজের অনুপঙ্খ বর্ণনার সঙ্গে রাজনীতি-অনুষঙ্গী করে তুলেছেন লেখক। — সমস্ত কিছুকে তাই মাড়িয়ে না-গিয়েও সে সময়ের রাজনীতির কূটকৌশলকে প্রকট করে তুলেছে এ উপন্যাস। রাজনীতির চক্রান্তে সাধারণ মানুষের বিপর্যস্ত হওয়া এবং নেতাদের স্বার্থসিদ্ধির ঘৃণ্য চক্রান্ত ইলিয়াস অপূর্ব দক্ষতায় প্রকাশ করেছেন। সেই সময়কে ইলিয়াস বাস্তব রূপ দিতে গিয়ে ইতিহাসের নগ্ন সত্যকেই প্রকট করে তুললেন।

আসলে যে সময়কে নিয়ে ইলিয়াস তাঁর উপন্যাস রচনা করেছেন, সে এক অস্থির সময়। তখনও কী কেউ জানত যে এই দিনগুলিই ইতিহাসের দশমাস দশদিন। হয়ত জানত; আর জানত বলেই 'চিলে কোঠার সেপাই' বা 'খোয়াবনামা' সময়ের দলিল হয়েই আছে। দেশবিভাগ এবং বিভাগ-জনিত উদ্বেগ তাঁর উপন্যাসে ধরা পড়েছে স্বাভাবিকভাবে।

সময়কে যেমন উপেক্ষা করা যায় না, তেমনি সময়ও কবি-সাহিত্যিকের রচনায় অবলীলায় জায়গা করে নেয়। ফেলে আসা বা ঘটে চলা সেই কল্লোলিত স্মৃতি বা সময় অহরহ লেখকের মনে-বোধে তাঁর জীবনের ব্যস্ততম মুহূর্তকে উন্মন করে দেয়, এর থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারেন না কেউ। থাকা যায়ও না। ইলিয়াস তাঁর সময়ের আঁধি আর আশঙ্কাকে এড়িয়ে যেতে পারেননি। এ যেন জীবনের কাছেই ঋণ স্বীকার করা, লেখকের কাছে তার মূল্য অপরিমেয়।

ইলিয়াসের স্বকণ্ঠেই সেই সময়ের রুদ্ধশ্বাস জীবনেব ছায়া ধরা পড়েছে —
"... আমার জন্মের সময় পৃথিবী কিন্তু দারুণ ঘটনাবহুল। তখন মহাযুদ্ধ চলছে, মহাযুদ্ধের পটভূমিতে আমাদের দেশের প্রধান ঘটনা তখন দুর্ভিক্ষ ঃ ১৯৪৩-এর মন্বন্তর।" (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা সমীরণ মজুমদার, অমৃতলোক, কলকাতা)
বা আবারও বলেন, অন্য সমস্যার কথা, যেমন— *"১৯৪৭ সালের দেশভাগ যে কতো মর্মান্তিক, কতো শোচনীয় হয়েছে, কতো অর্থহীন হয়েছে তা দিনে দিনে হাড়ে হাড়ে বোঝা যাচ্ছে।" (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ, সম্পাদনা সমীরণ মজুমদার, অমৃতলোক, কলকাতা)*
আসলে স্বখাত সলিলের মতোই এ এক স্বোপার্জিত পরাধীনতা। স্বাধীনতার মূল্য দিয়ে আমরা যা শেষপর্যন্ত পেলাম তা বকলমে পরাধীনতার চেয়ে এক ভয়ঙ্কর অবস্থা। এর কারণ যদি নির্ধারণ করা যায়, তবে তো ওই অবস্থার দেহের মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যাবে তার প্রতিকুল অবস্থার প্রতিরোধী সু-ব্যবস্থার বিশল্যকরণী।

ইলিয়াস তাঁর সাহিত্যে বা আরও শুদ্ধ স্বরে বলা যায়, উপন্যাসে সেই বিশল্যকরণীরই সন্ধান করেছেন। দেশভাগজনিত যে হিংসার উন্মত্ততা ছড়িয়ে ছিল পূর্ব-পাকিস্তানে, লেখক সেখানে স্বপ্ন-পুরাণের কথা বলে মানুষের আশার আশ্বাস উজ্জীবিত করলেন। তমিজের বাবা যে স্বপ্নের জগতে বাস করেছিল সে স্বপ্ন তো কোনও শুভ দিনের আগাম সংবাদ। তবে ইচ্ছা পুরণের কোনও স্থান রচনা করেনি সে স্বপ্ন। বাস্তবের চাওয়া-পাওয়া সাধারণ মানুষের মনের মধ্যেই তো আশার আলো ছড়ায়। এই স্বপ্ন—এই আশা নিয়েই তাদের বেঁচে থাকা। নিম্নবর্গীয় জগতের বর্ণনা এবং সেই সঙ্গে অগ্নিদগ্ধ সময় 'খোয়াবনামা'-য় স্থান পেয়েছে অপূর্বভাবে। মানুষের বেঁচে থাকার সংগ্রামের পাশাপাশি রাজনৈতিক হঠকারিতা যে সময়ের বহ্নিবলয় তৈরি করে তা শুধুমাত্র অনুধাবণযোগ্যই নয়, সময়ের চিরন্তন দলিলও রচনা করে। ইলিয়াস সময়ের সাক্ষী হয়ে দেশভাগের বেদনাকে পাণ্ডুলিপিবদ্ধ করেন।

ভারতের পাঁজর ভেঙে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল তার বিবরণ লিখেই ইলিয়াস ক্ষান্ত হলেন না, সেই পাঁজরে তিনি যে দাঁড়ের শব্দ শুনেছিলেন তাকেও ভাষা দিলেন। তবে এ শুধু ইতিহাস নয়। লেখক এ সম্পর্কে স্পষ্টই বলেছেন— *"আমি তো ইতিহাস লিখতে বসিনি। তেমনটি কোথাও দেখবেন না। যদি এটা বেশি বাস্তব হয়ে থাকে এটা জীবনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। আমাদের জীবন তো স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই কাটছে। ... দেশের মানুষের স্বপ্ন হাইজ্যাক করে নেয় ওপর তলার লোকেরা। ... এরপরেও মানুষ স্বপ্ন দেখে। স্বপ্ন না দেখলে বাঁচার কোনও আশা থাকে না। ... স্বপ্ন ভাঙে, নতুন করে তৈরি হয়। সেটাও ভাঙে। কিন্তু স্বপ্ন দেখা তো থেকেই যায়। না হলে এরা বাঁচবে কিসের হাত ধরে।"(পূর্বে উল্লিখিত সূত্র)* — তাঁর মৌল লক্ষ্যই মানুষের কথা বলা। তাঁর দুটি উপন্যাসেরই শেষে মানুষের বেদনামুক্তির কথা নেই। নেই ইতিহাসের কোনও ঠিকানা। তিনি হয়তো ভেবেছিলেন জীবনের আঘাতেই জীবন জাগবে, জীবনের আহ্বানে জীবনই দেবে সাড়া। আসলে মোদ্দা কথাটি হচ্ছে—ঔপন্যাসিক বাস্তবের প্রতিরূপ না-আঁকলেও বাস্তবের প্রতিভাসের ইঙ্গিত দিয়েছেন বেশ স্পষ্ট সুরেই।

আখতারুজ্জামানের উপন্যাসে সেই যুগ যন্ত্রণার ছাপ লক্ষ করা যায়। সে তো স্বাভাবিকই;

যে সময়ে লেখক বাস করেন তাঁর লেখায় যে কোনওভাবেই সেই সময়ের একটা—স্পষ্ট হোক—অস্পষ্ট হোক, ছাপ থাকবেই। 'খোয়াবনামা'-য় চেরাগ আলির গানেই শোনা যায় সেই সময়ের দীর্ঘশ্বাসের শব্দ—

"দেহ জখম কোম্পানির কামানের গোলায়।
গোল করিও না সাগরেদ ফকিরে ঘুমায়।।
রৌদ্রে ফাটে ঝাঝরা গলা—
তামাস নদীর পানি ঘোলা
আঁজলা ভরা পানি তাহার পিয়াস না মিটায়।"
বা কেরামত আলি যখন গান বাঁধে—
"আজি দীন গরিবের আঁধার দিনের
হইল অবসান
এই ভারতে কায়েম হবে আজাদ পাকিস্তান।
সেথায় সবাই সমান দীনী ফরমান
হইবে সেথায় জারি
প্রজার মঙ্গল তরে উচ্ছেদ হইবে জমিদারী
জমিদারে প্রজায়-জোতদার চাষায় একই আসন পান।
চাষী মজুর দীন দরিদ্রের মুশকিল আসান।"

— উপরের গান দুটিতে হতাশার হদিশ পেতে অসুবিধে হয় না। সে যে সেই সময়ের এক স্বাভাবিক চিত্র আর চরিত্র তা বুঝতে কষ্ট হবার কথা নয় একেবারেই।

জমিদার প্রথা-বিরোধী এই কৃষক আন্দোলনকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে পরিণত করা হয় এই বলে যে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে জমিদার প্রথা উচ্ছেদ হবে, কৃষকরাই জমির মালিক হবে। ফলে পূর্ব বাংলার কৃষকরা দ্রুত পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যোগ দেয়। তারই অবধারিত পরিণতি '৪৬-এর নির্বাচনে পাকিস্তান দাবির পক্ষে পূর্ব বাংলায় বিপুল জনসমর্থন। আর এই জনসমর্থন আদায়ের জন্যে রাজনৈতিক কূটকৌশল অবলম্বন করা হয়। নানা সভা-মিটিং-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সপক্ষে সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়। — সেরকমই এক সভার বর্ণনা দিয়েছেন ইলিয়াস বিশ্বাসযোগ্য ছবি এঁকে।

কোনও এক সভার কর্তা ব্যক্তিরা কেরামত আলিকে পাকিস্তান নিয়ে গান গাইতে বলেন। সে গান শোনার জন্যে পাঠক হিসেবে আমরাও উৎকণ্ঠিত হই। কেননা, যে সভার সূচনা হয় কৃষকদের দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি দিয়ে, সে সভায় পাকিস্তানের নাম-গান করার যৌক্তিকতা কোথায়! আর তারই উত্তর পেতে উৎসাহী পাঠক বইয়ের পাতা ওল্টাতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে গানে পাকিস্তানের কথা মোটেই ছিল না, ছিল—

"জোওতদার মহাজনে মনেমনে উহাদের পিরীত
চাষার মুখের গেরাস খাওয়া দুই জনেরই রীত।
তাই তে ভাগার ডাক দাও ..."। ইত্যাদি।

কিন্তু, কর্মকর্তারা আশ্চর্যজনকভাবে শ্রোতাদের বোঝাতে চাইলেন যে — 'কবি কেরামত আলি তার গানের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগের কথাই বলে গেল।' — কথাগুলো একেবারেই

বেআক্কেলী নয়। এই কথার আড়ালে লুকিয়ে আছে ইতিহাসের নগ্ন সত্য। সাদেক উকিলের মতো তখন হয়তো অনেক সাধারণ মানুষের মনেও প্রচ্ছন্ন প্রশ্ন জেগেছিল— *"মিটিং তো ভালোই হলো। কিন্তু মুসলিম লীগের সভায় তেভাগার গান কেমন শোনায়?"*

আসলে ছলে-বলে-কৌশলে সাধারণ কৃষকের মগজ ধোলাই করাই তাদের উদ্দেশ্য ছিল। তারই সঙ্গে ছিল এক চাপা উত্তেজনা। মানুষ একে অপরকে ভয় করত। বিশ্বাসের ভর কেন্দ্র ছিল শিথিল। কোনও আশ্বাসেই আর আশ্বস্ত থাকার কথা নয় তখন। মানুষের জন্যে মানুষের ভয় যে কত সাংঘাতিক, তারই চিত্র ইলিয়াস এঁকেছেন অপূর্ব দক্ষতায়;—

"ধর্মতলা পর্যন্ত আসতেই দেখা গেল, দোকান-পাট সব লুট হচ্ছে। একটা হিন্দু দোকানের সামনে দাঁড়াতে চাইছিল আজিজ, কিন্তু আহসানই তাকে টেনে নিয়ে যায় সামনে। তালতলার কাছাকাছি এলে এক মুসলমান দোকানে তারা উঠতে যাচ্ছে, এমন সময় কয়েকটা হিন্দু আহসানের পেটে বসিয়ে দিলো ছুরির ফলা। আহসান সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেলো। আজিজকে নিজের দোকানে টেনে নেয় এক হিন্দু দোকানদার। তাকে নিজের দোকানে আলমারির পেছনে পুরো দুটো দিন দাঁড় করিয়ে রেখে ঐ হিন্দু দোকানদার রাস্তায় ছেড়ে দেয়।"

সুতরাং বোঝা গেল যে, তখন এক চাপা আতঙ্ক নিয়ে মানুষ থাকত। তবে তারই সঙ্গে একে অপরের প্রতি কখনও-সখনও দয়া বা মানবতা প্রদর্শন করতেও দ্বিধা করত না। সেখানে যেমন আছে আর্থিক অনটনের বা জাতিগত বিদ্বেষের অন্ধকারের বর্ণনা, তেমনি আছে রাজনৈতিক মুখ ও মুখোশের চেহারা। মূল কথা হল, যাদের মনে তখনও বিভেদের বলি রেখার চিহ্ন পড়েনি, তারাই বিপন্ন সময়কে বেশি করে উপলব্ধি করেছে যেন। না পারছে সেই সময়ের বেনোজলে ভেসে যেতে, না পারছে নিজের মনের মতো চলতে। আর তখনই বিপন্ন সময় যেন তার মনের আরও গভীরে শিকড় ছড়ায়। আর এমনি করেই দ্বন্দ্বে-দ্বিধায় সময়ের মূমূর্ষতা আরও প্রকট হয়।

১৯৪৭-এর ভারত ভাগের মাধ্যমে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলেও মধ্যবিত্ত বা কৃষক শ্রেণির সেই খোয়াব পূর্ণ হয়নি। কৃষকের ন্যায্য দাবি স্বীকৃত হয়নি তার শ্রমে তৈরি ফসলে আর জমিতে। বরং জমিদার শ্রেণির জায়গায় জন্ম হয় জোতদার শ্রেণির। যে বিপন্ন সময়ের কথাভাষ্য উপন্যাস 'খোয়াবনামা', সে সময়ে নিম্নবিত্ত বা নিচুতলার লোকেদের স্বপ্ন দেখাই একমাত্র বাঁচার অবলম্বন ছিল।

"শ্রেণী অবস্থানজনিত অহংকারে আমরা তাদেরকে লক্ষই করি না কিংবা পর্যবেক্ষণের ভান করে আসলে তাচ্ছিল্য দেখাই—সেই তমিজ-কুলসুম-কেরামত আলি-ফুলজান-গফুর-কলু আবিতন-চেরাগ আলি-হরমতুল্লা-বৈকুণ্ঠদের যথাপ্রাপ্ত জগৎ যেন কোন লেখক সুলভ মধ্যস্থতা ছাড়াই পাঠকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে।" (তপোধীর ভট্টাচার্য, উপন্যাসের সময়, এবং মুশয়েরা, ১৯৯৯, কলকাতা)

তাই নিম্নবিত্তের নাভিশ্বাসের কোনও সুরাহা হয় না। মুনাফাখোর মজুতদারদের জন্যে চাল ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্য দুষ্প্রাপ্য হয়। সারা পূর্ববাংলা জুড়ে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। আর সেজন্যেই আবারও কৃষক বিদ্রোহের দাবানল জ্বলে ওঠে। এই স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় সাধারণ কৃষক শ্রমিক-শ্রেণি ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করে। দেশবিভাগ হয় নতুন দিনের আশা নিয়ে, কিন্তু দেখা

গেল এক অত্যাচার শেষ হতে না হতেই নতুন অত্যাচারী তার অস্ত্র শানাচ্ছে। আর সেজন্যেই মানুষ আবারও আরেক নতুনতর দিনের প্রত্যাশায় স্বাধীন দেশের স্বপ্নে বিভোর হয়। 'খোয়াবনামা'র যেখানে শেষ সেখানেই যেন শুরু হয়েছে 'চিলে কোঠার সেপাই'-র কাহিনি। তবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে 'চিলে কোঠার সেপাই' আগে লেখা আর 'খোয়াবনামা' পরে।

স্বপ্ন দিয়ে যার শুরু আন্দোলনের মধ্যে তার সমাপ্তি। আপাতভাবে সমাপ্তি মনে হলেও অবশ্য সে আরেক সম্ভাবনার সূচনা মাত্র। তবে একথা অবশ্যই বলা উচিত যে 'খোয়াবনামা'য় শুধু স্বপ্ন-পাঁচালীই ছিল না, সেখানে সংগ্রামী মানুষের পদধ্বনিও শোনা গেছে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সত্যকথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি তারা। যে বিপন্ন সময়ের কথা-ভাষ্য উপন্যাস দুটি, সে সময়ে শুধু নয়, আজও সাধারণ লোকেদের স্বপ্ন দেখাই একমাত্র বাঁচার অবলম্বন।

আখতারুজ্জামানের দুটি উপন্যাসে সময়ের সেই শরীরী-উপস্থিতি পাঠক অনুভব করতে পারে। পাঠকের সময় এবং লেখকের সময় আর সেই সঙ্গে দুইয়েরই আলাদা পরিসরের জটিল আবর্তেও যেন দুটি অস্থির সময় যথার্থরূপে বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠে। কারণ, লেখক সময়ের ঘেরাটোপ থেকে নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক দূরত্বে নিয়ে যেতে পেরেছেন বলেই ঘটমান সময় স্পষ্টতা পেয়েছে এবং সেই সঙ্গে বলতে হয় যে, সেই সময়ের মধ্যেই শুধু শৃঙ্খলিত হয়ে থাকেনি। এই প্রসঙ্গে আরও একটি কথা হল, সাহিত্যের সময়-পরিসরের বাস্তবতার রূপায়ন ব্যাপারে আমাদের মনে রাখতে —'realism which reflects detouchment',— লেখকের নিরাসক্ত দৃষ্টির আলোকে জীবনের রূপায়নই হচ্ছে এর মূল চাবিকাঠি। ব্যক্তি চিত্তের কামনা বাসনা বর্ণালীর আলোকপাতে বস্তুরূপ সেখানে ঢেকে যাবে না, আর এ ক্ষেত্রে ইলিয়াস সার্থক।

> *"বাংলা ভাষার লেখায় নির্বিকারত্ব সত্যিই খুব কম, খুবই কম। বড় বেশি involved হয়ে যায় সবাই। ... নিজে দাঁড়াতে পারেন না।" (আখতারুজ্জামান ইলিয়াস স্মারকগ্রন্থ, অমৃতলোক)*

আর তাই হয়ত ইলিয়াসের 'detouchment'-এর পরিচয় তাঁর উপন্যাসে লক্ষ করা যায়। আত্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিবলেই লেখক-আত্মা নিজের ব্যক্তিজীবন এবং সময়-সমাজের দীর্ঘ বেদনা আর অস্থিরতাকে রূপ দিয়েও তাকে চিরন্তন করতে সক্ষম হয়েছেন। Wordsworth-এর ভাষায় একেই আমরা বলতে পারি " ... emotion recollected in tranquility"— আর আমাদের মত পাঠক তাই সেই সময়-পরিসর বা সমাজকে নিজস্ব জীবন জটিলতার মধ্যে রেখে বিনির্মাণ করে।

তাই 'খোয়াবনামা'র চরিত্রগুলো আমাদের আজকের সময়ের সঙ্গে মিলে যায় অবলীলায়। কারণ, আমরা পাঠকরা আমাদের চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে সখিনা, ফুলজান, তমিজ, চেরাগ, কেরামত কালামদের সঙ্গে মিল খুঁজে পাই। যে মানুষটিকে দিয়েই কাহিনির সূচনা, যার স্বপ্ন দেখাকে কেন্দ্র করেই ঘটনার এগিয়ে যাওয়া, সেই তমিজের বাপের কিন্তু কোনও স্পষ্ট পরিচয় বা যাকে বলা যায় আইডেনটিটি, — তা কিন্তু নেই। মুনসির কাছ থেকে চেরাগ আলির হাত দিয়ে তমিজের বাপ যে 'খোয়াবনামা'-র মিথ অর্জন করেছে, তা ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠিত চরিত্রের মধ্যেই ছড়িয়ে পড়তে দেখি। লক্ষ করার বিষয় এটাই যে উপন্যাসের

শুরুতেও স্বপ্ন—উপসংহারেও স্বপ্ন। এই স্বপ্ন বা খোয়াব কারোর একার সমস্যা বা বিলাস নয়। এটা যৌথ স্বপ্ন, কালেকটিভ ড্রিম। তমিজের বাপের নামহীনতার সাথে যৌথ স্বপ্নের ব্যাপারটা একাকার হয়ে যা দাঁড়ায়, তা অনেকটা এরকম — *"তমিজের বাপ তার বিরতিহীন স্বপ্নঘোরে ধরে আছে একটা দীর্ঘ জটিল সময়-বিদ্রোহ, রক্তপাত, কিন্তু এই বাস্তবতাকে ব্যাখ্যা করবে তেমন সাধ্য তার নেই — বাস্তবতাটুকু কিংবদন্তীরূপে একটা জনপদ আচ্ছন্ন করে আছে — তমিজের বাপ সেই আচ্ছন্নতারই প্রতীক।" (শহীদ ইকবাল ঃ কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ঢাকা, বাংলাদেশ)*

তমিজের বাপ ভিন্ন প্রবণতায় উপস্থাপিত হলেও উপন্যাসে তার মাত্রা অন্য। আমাদের প্রতিক্রিয়াশীল পুঁজিবাদের সমাজে এমন একটি চরিত্রকে উপহার দিয়ে লেখক আসলে ইতিহাস-ঐতিহ্য আশ্রিত একটি সমাজের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। একেবারে ভূমি থেকে উঠে আসা একটি মানুষ যেন আমাদের সামন্তবাদ পুষ্ট একটি সময়কেই চিহ্নিত করেছে। শুধু তা-ই নয়, এই উপন্যাসের ভাষায়ও সময়ের রং-রূপ অবিকলভাবে উঠে এসেছে।

> *"খোয়াবনামা প্রচলিত আঙ্গিকের বাইরে ভিন্নধর্মী একটি উপন্যাস। খোয়াবনামার ভাষা পূর্ব-বাংলার মানুষের মুখের ভাষা। এ নতুন ভাষা-রীতি নতুন একটি প্রাণশক্তির আঁচড়ে ঋদ্ধ। আধুনিক বাংলা ভাষার পাশাপাশি একটি জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র এ ভাষা খোয়াবনামার মাধ্যমে ভিন্ন মাত্রা পেয়েছে।" (শহীদ ইকবাল ঃ কথাশিল্পী আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, ঢাকা, বাংলাদেশ)।*

ভাষা এখানে বিষয়ের প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছে। এর সাথে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয় সমাজ বাস্তবতা তথা বিভিন্ন ঘটনা ও ঘটনার পরম্পরাগত বিন্যাস। তবে ভাষার অনুষঙ্গ হয়ে আছে অসামান্য বাক্যগঠন, শব্দচয়ন, কমা, সেমিকলন, ড্যাশ, দাঁড়ির তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবহাব আমাদের যা অলস থাকতে দেয় না।

'খোয়াবনামা' এমন একটি উপন্যাস যা আরাম কেদারায় বসে আয়াসী পাঠযোগ্য নয়। পরিশ্রমী পাঠক, বা বলা যায় সত্যিকারের বোদ্ধা পাঠকেরই পাঠ্য। ভাবালুতা, ন্যাকামি, গালগল্পের বাইরে এমন এক শিল্প যা পাঠককেও পাঠ সম্পর্কে সজাগ করে, বলা ভাল, তৈরি করে সচেতন পাঠকও। ভাবতে ভাল লাগে, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের 'খোয়াবনামা' এবং 'চিলে কোঠার সেপাই' — দুই উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রামাণ্য দলিল হতে পারে বলে। বাঙালি তার আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসমালোচনা বা আত্মপরিচয়—এই তিন ক্ষেত্রেই দুটি উপন্যাসকে আয়নার মতো ব্যবহার করতে পারে। জীবনকে দেখার জানার এবং বোঝাব জন্যে উপন্যাস দুটির সময় শুধু প্রয়োজনীয়ই নয়, গুরুত্বপূর্ণও। বাঙালির ফেলে আসা জীবনের অভিজ্ঞান ধারণ করে আছে উপন্যাস দুটি। আমাদের অনিকেত জীবন জুড়ে ছড়িয়ে আছে যে দুঃখ দারিদ্র্য আর হতাশার অনপনেয় অন্ধকার তার শিকড়ের সন্ধান ইলিয়াস তাঁর উপন্যাসে দিয়ে গেছেন।

■ *লেখক বাংলা সাহিত্যের গবেষক তথা বিশিষ্ট উদীয়মান প্রাবন্ধিক।*

হাঁসুলীবাঁকের উপকথা ঃ
ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্বময় পাঠকৃতি

বিশ্বজিৎ চৌধুরী

যে কোনও উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করতে বসে নানা জটিল প্রশ্নের তীক্ষ্ণ বাণে জর্জরিত হতে হয়। উপন্যাসের পাঠক পাঠকৃতিতে কী পান? যদি বলা যায় পাঠক নিজেকেই দেখতে পান তা হলে কি সবটুকু বলা হল? আমরা নিজের সম্পর্কে কতটুকু জানি? ঔপন্যাসিকের অভিজ্ঞতা আর আমাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা যদি এক না-হয়, তা হলে সে-দেখা কি পাঠক হিসেবে সম্পূর্ণ হল? কোনও এক শিল্পকর্মকে দেখতে হলে যেমন স্থানিক দূরত্বের প্রয়োজন, তেমনি কালিক দূরত্বের প্রয়োজন নয় কি? দৈনন্দিনতার চাপে সমসাময়িক কালে লেখা একটি উপন্যাসকে আমরা সঠিকভাবে ও সম্পূর্ণভাবে দেখতে পাই কি? হয়তো না। সুতরাং আমাদের নিজেদের দেখাটা সম্পূর্ণ ও সঠিক না-ও হতে পারে এ ক্ষেত্রে। তা ছাড়া উপন্যাস তো শুধুই ব্যক্তি-মানুষকে দেখায় না। দেখায় তার চতুর্পার্শ্বকে, প্রবহমান অখণ্ড জীবনকেও। জীবনের অন্তরালে প্রচ্ছন্ন সমাজতত্ত্বও এর থেকে বাদ যায় না, বাদ যায় না মনোতত্ত্ব, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সংস্কৃতি। উপন্যাস তাই মনোস্তাত্ত্বিক হতে পারে, রাজনৈতিক হতে পারে, ঐতিহাসিক হতে পারে আবার সামাজিকও হতে পারে। আবার একই উপন্যাসে এতসব একই সঙ্গে জড়িয়েও থাকতে পারে। এ ক্ষেত্রে আমরা কোনটা রেখে কোনটাকে দেখব? আসলে তো কোনওটাকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। সব কিছু মিলেই তো জীবনপ্রবাহ, মানবসংসার। এই জীবনপ্রবাহ ও মানবসংসারকেই তো উপন্যাসে দেখা যায়। কিন্তু এই দেখার ব্যাপারটা এত সহজ নয়। আবার প্রত্যেক পাঠকের দেখার প্রক্রিয়া, বোধগম্যতার স্তর, অনুভবের ধরন, বিশ্লেষণের ক্ষমতা, ভাবাদর্শগত অবস্থান স্বাভাবিকভাবেই এক নয়। এই বিভিন্নতার জন্যে পাঠকৃতি বিভিন্ন রূপে বিভিন্ন পাঠকের কাছে ধরা দেয়। মিলান কুন্দেরা যথার্থই বলেছেন,"*Every novel says to the reader : 'Things are not as simple as you think.*" কেন? কেন এই জটিলতা? আসলে জটিলতা আমাদের সত্তার মধ্যেই নিহিত। আঙ্গিকের দিক থেকে উপন্যাস সংকেতধর্মীই হোক আর প্রবাহধর্মীই হোক, এপিকধর্মীই হোক আর নাট্যধর্মীই হোক, জন্মসূত্রে তা বর্তমানের কাছেই দায়বদ্ধ। হতে পারে কোনও উপন্যাস ঐতিহাসিক কিংবা অতীতচারী, কিন্তু তার লেখক ও পাঠক তো বর্তমান কালেরই। লেখকের অজ্ঞাতসারেই তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসেও বর্তমানের ছাপ থাকতে বাধ্য। এই বর্তমান সম্পর্কে সব পাঠকের ধারণা সমান নয়। তার কারণ পাঠকসত্তার গঠনপ্রক্রিয়ার মধ্যে পূর্বোক্ত জটিলতা। মানুষের সত্তা যে অসংখ্য অপর সত্তার দ্বারা গঠিত এই অপরতার চরিত্র সব সময় সমান না-ও হতে পারে। প্রতিটি সত্তা ও অপরতার মধ্যে বিভিন্ন সময়ের অভিজ্ঞান ও প্রভাব থাকে। তত্ত্বগতভাবে আমরা প্রত্যেকেই বিভিন্ন সময়ের বাসিন্দা। তাই পাঠকভেদে পাঠকৃতির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। আর এখানেই আসে উপন্যাসের ক্রনোটোপ সংক্রান্ত নানা জটিল প্রশ্ন। এই জটিলতায় প্রবেশ না-করেও

বলা যায় — উপন্যাস আসলে সময়েরই এক বিশেষ ধরনের ও আঙ্গিকের প্রতিবেদন। আর এই প্রতিবেদনের পাঠ মানে সময়েরই পাঠ। ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি সময় দ্বারাই সৃষ্ট, নিয়ন্ত্রিত ও প্রভাবিত। উপন্যাসের আলোচনায় তাই সময়ের বিশ্লেষণ জরুরি হয়ে পড়ে।

এখানে আরেকটি প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে। উপন্যাসে যে কাহিনি থাকে তা যেমন বানানো, তার পাত্র-পাত্রী, পরিবেশ, কথোপকথন সবই তো বানানো। ভৌগলিক বাস্তবে পদ্মানদী আছে, নদীতে পারাপারের জন্য মাঝিরাও আছে বাস্তবে। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসের কাহিনি ও চরিত্ররা তো বাস্তবে নেই। এরা তো মিথ্যা। এই মিথ্যাকে পাঠ করে পাঠক গলদঘর্ম হবেন কেন? এভাবে লক্ষ লক্ষ দৃষ্টান্ত তুলে ধরে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া যায় — মিথ্যার জাহাজে চড়ে পাঠকের কী লাভ? পাঠক জীবন সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক তথ্য যদি জানতে চান, তা হলে তো বিজ্ঞান পাঠ করতে পারেন, যদি ঐতিহাসিক তথ্য জানতে চান তা হলে তো ইতিহাস পাঠ করতে পারেন, যদি সমাজকে জানতে চান তা হলে সমাজবিজ্ঞান পাঠ করতে পারেন। তা হলে উপন্যাস পড়া কেন? হোক না তা ঐতিহাসিক কিংবা সামাজিক। আসলে বিজ্ঞান, ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞানে জীবন প্রত্যক্ষভাবে ধরা দেয় না। এখানেও প্রশ্ন থেকে যায়। জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে জানতে হলে, তার রূপ-রসের স্বাদ নিতে হলে, জীবনের কাছেই তো যাওয়াটা সঙ্গত। উপন্যাস পাঠ করে জীবনকে কতটুকু জানা যাবে? যেহেতু আমরা জীবনের মধ্যেই বাস করি অতএব জীবনকে দেখতে জীবনই তো যথেষ্ট। উপন্যাস কেন? এর সহজ উত্তর হচ্ছে — সমুদ্রে ডুবে থেকে যেমন সমুদ্রের ব্যাপ্তি ও গভীরতা, তার সৌন্দর্য ও ভীষণতাকে সামগ্রিকভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না, তার জন্যে দূরত্বের প্রয়োজন, জীবনের সামগ্রিক রূপকে দেখতে হলেও জীবন থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে হয় অন্তত চিন্তার দিক থেকে, মননশীলতার দিক থেকে। ঔপন্যাসিকরা তাই জীবনে বাস করেও জীবন থেকে দূরে সরে দাঁড়াতে পারেন। দূরত্বে দাঁড়িয়ে তাঁরা যে-মিথ্যাকে বানিয়ে তোলেন তা আসলে মিথ্যা নয়, মিথ্যার আশ্রয়ে সত্য। পিকাসো তো ঠিকই বলেছিলেন, শিল্প হচ্ছে একটি মিথ্যা যা সত্যকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। এই যে মিথ্যারূপী সত্য তা-ও কিন্তু সময়েরই বিশিষ্ট উদ্ভাসন। প্রেক্ষিত ছাড়া তো কোনও সত্য হতেই পারে না। আর এই প্রেক্ষিতেই জড়িয়ে থাকে সময় ও পরিসর। তাই উপন্যাসের বিশ্লেষণ মানে সময় ও পরিসরের বিশ্লেষণ। পাঠকৃতিকে এই প্রেক্ষিত বা প্রসঙ্গে স্থাপন করলেই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। পাঠকভেদে এই প্রসঙ্গ আলাদা হয়ে যেতে পারে। তাই সত্যের আদলও বদলে যেতে পারে। তবে ভ্রান্ত ন্যারেটিভ যাতে উপস্থিত না-হয় তার জন্য পাঠককে কতকগুলি সতর্কতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়। সে অন্য কথা।

এতক্ষণ যে জীবনের সমগ্রতার কথা বলা হল তা কিন্তু উপন্যাস ছাড়া সাহিত্যের অন্য কোনও শাখায় তেমনটি প্রতিফলিত হয় না। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় মানুষ ও মানবজীবনের একেকটি দিকের রূপ কখনও প্রত্যক্ষভাবে কখনও পরাভাষার সঙ্কেতে আভাসিত ও প্রতিফলিত হয়। উপন্যাসে সময় ও পরিসরের প্রসঙ্গে ব্যক্তিমানুষের পারিবারিক জীবন, সমাজজীবন, মনোজগৎ, অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের মধ্যে টানা ও পোড়েন, অসংখ্য অপরতার সমবায়ে গঠিত সত্তার সামগ্রিক রূপ ফুটে ওঠে। অস্তিত্বতাত্ত্বিক ও জ্ঞানতাত্ত্বিক সমস্যা ও

সংকট এর থেকে বাদ যায় না। একক ব্যক্তি মানুষের প্রাধান্য এখানে থাকে না। ঘরোয়া মানুষ, পারিবারিক মানুষ, সামাজিক মানুষ, রাজনৈতিক মানুষ, সংস্কৃতিবান মানুষের জটিল সম্পর্কজালের মধ্যে বিন্যস্ত মানবজীবনের বহু বিচিত্র সামগ্রিক রূপের প্রকাশ উপন্যাসে ঘটে থাকে। মানুষ যখন যুগপৎ আত্মসচেতন এবং সমাজসচেতন, চতুর্পার্শ্বস্থ পরিবেশ ও সময়লালিত সমাজবাস্তবতা মানুষকে যখন উত্তেজিত অথবা নিস্তেজিত, আচ্ছন্ন অথবা দীপিত করে, যুগপৎ ভাঙতে ও গড়তে শেখায়, তখনই আসে উপন্যাসের সময়। দেবমহিমাকীর্তন উপন্যাসের বিষয়বস্তু নয়, মানুষের জীবনযাপনের সত্যকে প্রকটিত করাই তার মূল লক্ষ্য। তাই কাহিনির দিক থেকে উপন্যাস সাহিত্যের অন্যান্য শাখার সমধর্মী হলেও লক্ষ্যবস্তুর দিক থেকে ইতিহাস, ডায়েরি, সমাজবিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির সঙ্গে তার অনেকটাই সাদৃশ্য রয়েছে। আর এ সমস্ত কিছুর সঙ্গে তো অনিবার্যরূপে জড়িয়ে আছে সময়। তাই একটি উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র-বিশ্লেষণ, ভাষা, সমাজচিত্র, মনোস্তত্ত্ব, আঙ্গিক ইত্যাদি বিশ্লেষণের চেয়ে সময়ের বিশ্লেষণই মুখ্য হয়ে ওঠে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' উপন্যাসখানা আলোচনার সময় আমরা এদিকটাকেই প্রাধান্য দেব, লক্ষ করব এটির ক্রমশ উপন্যাস হয়ে ওঠার প্রক্রিয়ায় সময়ের ভূমিকা কতটুকু, যদিও আলোচনার ক্ষুদ্র পরিসরে ততটুকু গভীর বিশ্লেষণ সম্ভব না-ও হতে পারে।

।।দুই।।

তারাশঙ্করের 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-কে উপর্যুক্ত দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হলে তাঁর কথা-সাহিত্যের উপকরণ-উপাদান, স্থান, কাল ও উপন্যাস রচনার তিনটি পর্ব সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকতে হয়। এই উপাদান-উপকরণ ও স্থানের কথা যখনই আসবে তখনই রাঢ়-বঙ্গের, বিশেষ করে বীরভূমের নানা শ্রেণির ও নানা স্তরের মানুষের কথা আসবে, তাদের সামাজিক পরিবেশ ও জীবনযাত্রা প্রণালীর কথা আসবে, আসবে সে-অঞ্চলের রুক্ষ-শুষ্ক ভূপ্রকৃতির কথা, কারণ তাঁর কথাসাহিত্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ অবয়ব গড়ে উঠেছে এসব নিয়েই। পর্বের যে-ব্যাপারটা এখানে উত্থাপিত হল তার গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম। কারণ তারাশঙ্কর দীর্ঘ ঔপন্যাসিক জীবনে প্রতিটি পর্বে নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন, একই জন্মে তাঁর জন্ম-জন্মান্তর ঘটেছে এক্ষেত্রে। 'চৈতালী ঘূর্ণি' (১৯৩১) থেকে 'ধাত্রীদেবতা'-র (১৯৩৯) পূর্ব পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস রচনার সূচনা পর্ব ধরে নিলে দ্বিতীয় পর্ব দাঁড়াবে 'ধাত্রীদেবতা' থেকে 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' (১৯৪৭) পর্যন্ত। তাঁর উপন্যাস রচনার তৃতীয় পর্বের শুরু স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী পর্যায়ে। এ পর্যায়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'আরোগ্য নিকেতন' (১৯৫৩)। এ পর্যায়ে এসে তাঁর মনের বদল হয়েছে অনেকখানি। তাই ঔপন্যাসিকসুলভ বিচার-বিশ্লেষণের ধারারও হয়েছে রদবদল। মোটামুটিভাবে বলা যায় প্রথম পর্বে তারাশঙ্কর স্পষ্টভাবে আধুনিক, কিন্তু শেষ পর্বে এসে তিনি অনেকাংশেই রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসের এরকম আধুনিকতা ও অনাধুনিকতার স্পষ্ট পর্ববিভাগ নেই। তাঁর বৈশিষ্ট্য ও জোর অন্য জায়গায়। কিন্তু তারাশঙ্করে এ বিভাগগুলি স্পষ্ট। মনে হয়, শরৎচন্দ্র ইংরেজি সাহিত্যে কৃতবিদ্য ছিলেন না ও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর সুগভীর যোগাযোগ ছিল না বলেই এমনটি হয়েছে। তারাশঙ্কর যদিও 'ডাইনীর বাঁশী' গল্পের আলোচনার সময় অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন— *"আমি তো ইংরাজীও*

ভালো জানি না। ... ওদের গল্প তো আমি বেশি পড়ি নি।" (আমার সাহিত্য জীবন, ১ম পর্ব, পৃষ্ঠা ১২৪), তবু তিনি ইংরেজি ভালই জানতেন বলে তথ্য রয়েছে। আর ইংরেজি গল্প বেশি পড়েননি বলে জানালেও বিশ্বসাহিত্যের সঙ্গে তাঁর মোটামুটি পরিচয় ছিল। বিশ্বসাহিত্যে সুপণ্ডিত বুদ্ধদেব বসুর মতো 'An Acre of Green Grass' লেখা তারাশঙ্করের পক্ষে সম্ভব ছিল না হয়তো, তবু পাশ্চাত্য সাহিত্যে আধুনিকতার স্বরূপটিকে তিনি ধরতে পেরেছিলেন। উপন্যাস রচনার পূর্বোক্ত সূচনাপর্বে প্রতীচ্যাগত আধুনিকতা ও ভারতীয় ঐতিহ্যের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব ততটুকু প্রকট হয়ে না-উঠলেও দ্বিতীয় পর্বে 'ধাত্রীদেবতা' থেকে তা প্রখর হয়ে উঠেছে। এ পর্বে নতুন ও পুরনোর অবশ্যম্ভাবী দ্বন্দ্বে আধুনিক ভাবাদর্শ, মূল্যবোধ, বিশ্বাস এবং আধুনিক জীবনব্যবস্থার জয়কেই বড় করে দেখিয়েছেন। ইতিহাস, সমাজবাস্তবতা ও জীবনবোধের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণী শক্তির বলে তিনি অনুভব করেছিলেন, নৈতিকতার দিক থেকে ভাল হোক আর মন্দই হোক আধুনিকতার জয় অবশ্যম্ভাবী। এখানে লক্ষণীয় যে, এ জয়কে কিন্তু তিনি মনের দিক থেকে মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলিতে দেখা যায়, আধুনিকতার বিজয়রথের চাকার তলে স্পৃষ্ট হয়েছে চিরায়ত ঐতিহ্য। আর এই পিষ্ট হওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে একটা বিষাদের সুর। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র শেষ পর্ব থেকে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত অংশটি পাঠ করলেই পাঠক এর আভাস পেতে পারেন—

"কাহারেরা এখন নতুন মানুষ। পোষাকে-কথায়-বিশ্বাসে তারা অনেকটা পালটে গিয়েছে। মাটি ধুলো কাদার বদলে মাখে তেলফালি, লাঙল কাস্তের বদলে কারবার করে হাস্বর-শাবল-গাঁইতি নিয়ে। তবে চন্দনপুরের কারখানায় খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা প'ড়ে মরে। কিন্তু তার জন্যে বাবাঠাকুরকে ডাকে না। ইতিহাসের নদীতে নৌকা ভাসিয়ে তাদের তাকাতে হচ্ছে কম্পাসের দিকে—বাতাস-দেখার যন্ত্রটাকে।

তবু চন্দনপুরের ঘুপচি কোয়াটার্সে থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলি বাঁকের দিকে। কিন্তু কি ক'রে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে?

হাঁসুলী বাঁক বসতহীন হয়ে চেয়ে রয়েছে আকাশের দিকে। বন্ধ্যা মেয়ের মতন নতুন সন্তান-সন্ততির জন্য তপস্যা করছে। বন্যায় চাপানো বালির রাশি— হাঁসুলী বাঁকের সোনার মাটির উপর চেপে ধু ধু করছে, সেখানে শুধু নসুবালাই যায়। নিতাই যায়। তারা না গেলে চলে না। সে যায় ওই বাঁকে গোবর কুড়াতে, কাঁকড়া মাছ ধরতে, কাঠ ভাঙতে। চারিদিক তাকিয়ে দেখে আর পা ছড়িয়ে ব'সে কাঁদে — মা জন্মনী গো! আমার মা জন্মনী গো!"

'ধাত্রী দেবতা' (১৯৩৯), 'কালিন্দী' (১৯৪০), 'গণদেবতা' (১৯৪২) ও 'পঞ্চগ্রাম' (১৯৪৪) — দ্বিতীয় পর্বের এই উপন্যাসগুলোর পরিণতি লক্ষ করলেও দেখা যায়, প্রাচীন মূল্যবোধের অপ্রাসঙ্গিকতা ও বিনাশ, প্রাচীন আভিজাত্যের ধ্বস, কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনের অস্তমান আলোকরশ্মিতে শিল্পায়নের নব-উন্মেষ। লোকায়ত জীবনের বিলীয়মান পটভূমির ওপর নাগরিকতার আগ্রাসনে আনন্দের সুর বেজে ওঠেনি এগুলোতে। 'বসন্ত'-এর পরিবর্তে 'বেহাগ'ই লেগেছে, মাঝে-মাঝে উঁকি দিয়েছে 'মেঘমল্লার'। অবশ্য 'কবি' (১৯৪২) এই

পর্বে রচিত ও জনপ্রিয় হয়ে উঠলেও ঐতিহ্য ও আধুনিকতার টানা ও পোড়েনে টান টান হয়ে ওঠেনি পাঠকৃতির অন্তর্বয়ন।

এই যে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব, যা আলোচ্য 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'য়ও তীব্রভাবে প্রকটিত, তাকে বুঝতে হলে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলোর রচনাকালের সামাজিক দ্বন্দ্বকে বুঝতে হবে। আর লেখকসত্তা যেহেতু তাঁর সময়ের দ্বারাই গঠিত অতএব সময়সৃষ্ট লেখকসত্তার মননের গভীরে নিহিত দোটানাকেও বুঝতে হবে। আবেগ যদি হয় চিরায়ত ঐতিহ্যলালিত আর বুদ্ধি যদি আধুনিকতার পক্ষে ওকালতি করে, তা হলে যে মানসিক দোটানা জন্মে, সেই দোটানার কথাই এখানে বলা হয়েছে। অবশ্য এই দোটানা তারাশঙ্করের একার নয়, বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। বরং বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তারাশঙ্করের চেয়ে দোটানার মাত্রা ছিল অনেক বেশি। যার ফলে মনস্ক পাঠক বঙ্কিমচন্দ্রে স্ববিরোধিতার ছড়াছড়ি লক্ষ করবেন। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্র আর ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর। আবার শুধুই প্রবন্ধে স্ববিরোধিতা এতই বেশি যে তাঁর ভাবাদর্শের মূল্যায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। যাই হোক, তারাশঙ্করের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলোতে মার্কসীয় দর্শন অনুযায়ী সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি সুগভীর টান পরিলক্ষিত হয় যা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে আদৌ ছিল না। এই আকর্ষণও কিন্তু কালিক। তাই তাঁর রচনাকালই প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠলে তাঁর উপন্যাসের অন্তর্বয়নকে বুঝতে সুবিধে হবে।

।।তিন।।

মানুষের সামাজিক ব্যবস্থা, সংস্কৃতির রং-রূপ, সমাজ-সংগঠনের অন্তর্বয়ন, চিন্তাধারা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধ, আচার-আচরণ সবই মূলত অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই এসবের আন্তর রূপটিকে বুঝতে হলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কথা আলোচনার আলোয় নিয়ে আসতে হয়। শিল্প বিপ্লবের অবশ্যাম্ভাবী ফলশ্রুতিতে ইংলন্ডে পুঁজির উদ্ভব হয়েছিল। পুঁজির চরম বিকাশের লক্ষ্যে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা ভারতে তাদের অধিকার কায়েম করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বণিকের মানদণ্ড ধীরে ধীরে রাজদণ্ড রূপে প্রাদুর্ভূত হল। যে-পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় তারা তাদের দেশে শোষণ চালাচ্ছিল, সে-প্রক্রিয়া থেকে একটু ভিন্নতর কায়দায় এদেশে শোষণ চালিয়ে যাচ্ছিল। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থার প্রথম দিকে কোম্পানির শোষণের মাত্রা ছিল মাঝারি, পরের দিকে বৃহৎ পুঁজির অর্থাৎ শিল্পকেন্দ্রিক পুঁজির মাত্রা ছিল অধিক। এতে বাংলা সহ ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতির বুনিয়াদ ভেঙে যাচ্ছিল, লুপ্ত হচ্ছিল তাঁত ও চরকা, ধ্বংস হচ্ছিল ক্ষুদ্র কুটিরশিল্প ও পারিবারিক শিল্প। এর প্রথম ধাক্কাটাই লেগেছিল বঙ্গদেশের গ্রামীণ জীবনে। মধ্যযুগীয় পল্লীকেন্দ্রিক অর্থনৈতিক ভিতটি ভেঙে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গজিয়ে উঠেছিল বৃহৎ শিল্প। এতে একদিকে সামন্তবাদী মধ্যযুগীয় অর্থনীতির অবসান সূচিত হয়েছিল, অন্যদিকে পুঁজিবাদী শিল্পায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। উৎপাদিত শিল্পসামগ্রী পরিবহনের সুবিধার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হচ্ছিল, বিশেষত রেল-পরিবহন ব্যবস্থার ব্যাপকতা লক্ষ করা গিয়েছিল। ভূমিহীন কৃষক, ক্ষেতমজুররা পেটের দায়ে কলে-কারখানায় গিয়ে শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে শুরু করেছিল। কামার, কুমোর, ছুতোরেরা গ্রাম ছেড়ে শহরে গিয়ে ব্যবসা ফাঁদতে শুরু করেছিল। কারণ গ্রামীণ কুটির শিল্প থেকে যে আয় হচ্ছিল তাতে পরিবার চালানো কঠিন হয়ে পড়েছিল। তার চিত্র যেমন পাই 'হাঁসুলীবাঁকের

উপকথা'-য়, তেমনি পাই 'গণদেবতা' 'পঞ্চগ্রাম'-এও। 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র করালী যেমন গেছে নিকটবর্তী রেল স্টেশন 'চন্ননপুরে' খাটতে, তেমনি 'গণদেবতা'-র অনিরুদ্ধ ও গিরীশও শহরে গিয়ে দোকান দিয়েছে। এতে গ্রামের কৃষকদের ভীষণ অসুবিধে হয়েছে। কর্মকার ও ছুতোরের অভাবে সময়মতো তাদের গরুর গাড়ির চাকার চারদিকে লোহার পাত লাগানো, লাঙলের ঈষা লাগানোর কাজে ব্যাঘাত ঘটেছে। এ নিয়ে শেষোক্ত উপন্যাসে দেখি গ্রামের কর্মকার ও ছুতোর অনিরুদ্ধ ও গিরীশের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীদের অসন্তোষ। এই যে আর্থ-সামাজিক পালাবদল তা দেখে কার্ল মার্কস বলেছিলেন, *"England, is true, in causing a social revolution in Hindusthan was actuated only by the vilest interests ... whatever may have been the crime of England she was the unconscious tool of history in bringing about the revolution" (British Rule in India, New York Daily Tribune, 25 June 1853)*

একটু আগে যে শিল্পায়নের কথা বলা হল তা কিন্তু সম্পূর্ণ হয়ে ওঠেনি তৎকালীন ভারতবর্ষে। কারণ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজরা চায়নি এদেশে শিল্পায়ন সুসম্পন্ন হোক। যদি শিল্পায়নের প্রক্রিয়া সুসম্পূর্ণ ও সুসম্পন্ন হয় তা হলে দেশি পুঁজি ক্রমে প্রবল হয়ে উঠে বিদেশি ইংরেজের পুঁজিকে চ্যালেঞ্জ জানাবে, তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠবে। ইংরেজ প্রভুদের এ কখনও কাম্য হতে পারে না। অথচ শোষণের প্রক্রিয়াকে অব্যাহত রাখতে শিল্পায়নের দরকারও আছে। এরই নাম ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা যা শিল্পায়ন ঘটাবে আবার ঘটাবেও না বা সম্পূর্ণ করবে না। এই স্ববিরোধিতাই ঔপনিবেশিক অর্থনীতির নিজস্ব স্বাভাবিক প্রবণতা। এই স্ববিরোধী ঔপনিবেশিক অর্থনীতির পথ ধরেই আসে সামাজিক সংগঠনের টানা ও পোড়েন, চিন্তা-মনন-মর্জি-বিশ্বাসে স্ববিরোধিতা। জীবনেও এর প্রতিফলন ঘটে। মধ্যবিত্তের বিকার, বিপর্যয়, স্ববিরোধিতা ও স্খলনকে এরই আলোকে বিচার করে দেখতে হয়। এখানে মনে রাখা দরকার, মধ্যবিত্তের বিকার ও বিপর্যয় এবং অর্থনৈতিকভাবে সমাজের নিচু স্তরের মানুষের বিপর্যয়ের স্বরূপ ভিন্নরকম। তবু সর্বস্তরেই একটা বিপর্যয় ঘটে গেছে এই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়। তারাশঙ্করের আলোচ্য উপন্যাসে পূর্বোক্ত নিচু স্তরের মানুষের জীবনে যে বিপর্যয় নেমে এসেছিল তা-ই চিত্রিত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। এই বিপর্যয়ের ফলেই ব্রাত্য প্রান্তিকায়িত কাহারদের জীবনের ভরকেন্দ্রে ঐতিহ্য ও আধুনিকতার যে তীব্র টানা ও পোড়েন দেখা গিয়েছিল তা-ই প্রতিবিম্বিত হয়েছে বনওয়ারী ও করালীর দ্বন্দ্বের মধ্যে, বিশ্বাস-কাজ-চিন্তা ও মননের পার্থক্যের মধ্যে। বনওয়ারী যদি হয় আলোচ্য উপন্যাসে ঐতিহ্যের প্রতীক তা হলে করালী নিঃসন্দেহে আধুনিকতার প্রতীক। এ বিষয়টি যথাস্থানে বিশ্লেষিত হবে। তার আগে একটি জরুরি আলোচনা এখানে সেরে নিতে হয়।

পূর্বোক্ত অসম্পূর্ণ শিল্পায়নের ফলেই এ দেশে যেরকম এবং যত দ্রুত মধ্যযুগের অবসান ঘটতে পারত, তা কিন্তু ঘটেনি। আধুনিকতা যত তাড়াতাড়ি প্রতিষ্ঠিত হতে পারত তা হতে পারেনি। যে আধুনিকতা এসেছে জীবনে তা-ও এ দেশের ঐতিহ্যের আধুনিকতা নয়, প্রতীচ্যাগত আধুনিকতা যা উপর থেকে চাপানো কিংবা ভিনদেশি। যে তথাকথিত নবজাগরণের হাওয়ার এসেছিল তা-ও সফল হতে পারেনি। যে জাতীয়তার জন্ম হয়েছিল তা-ও প্রগতির মুক্ত পরিসরের দিকে ইতিবাচক পদক্ষেপ ফেলতে পারেনি। যা ঘটেছিল তা এক জগা-

খিচুড়ি-জাতীয় ব্যাপার। ফলে সমাজসংগঠনে, জীবনচর্যায়, সংস্কার ও সংস্কৃতিতে বিকার ও বিকৃতিকেই অনিবার্য করে তুলেছিল। ব্যবহারিক জীবনে বৈষয়িক স্বার্থরক্ষার তাগিদেই প্রতীচ্য-সর্বস্বতা মুখ্য হয়ে উঠল। দেশীয় লোকায়ত ঐতিহ্য ছিন্নমূল হয়ে গেল। 'আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু হায় তাই ভাবি মনে'— এ শুধু মধুসূদনের কবিসুলভ আবেগজাত উচ্চারণই নয়, গোটা উনিশ শতকের জীবনসত্য। লোকায়ত জীবনের কেন্দ্রবিন্দুতে যে-সমবায়ী শক্তি, শ্রী ও দীপায়নের প্রেরণা জাগ্রত ছিল তখনও, মেকলের এ দেশীয় বেজন্মা সন্তানেরা তাকে প্রত্যাখ্যান করল ঔপনিবেশবাদের সাংস্কৃতিক রাজনীতির কারণেই। 'মাতৃকোষে রতনের রাজি'-কে উপেক্ষা করে 'পরধনলোভে মত্ত' হয়ে উঠল। ড০ তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়, *"পলায়নবাদী স্পৃহাকে উসকে দিয়ে এবং আত্মপরিচয় সন্ধানের ব্যাকুলতাকে চূড়ান্তভাবে বিপথগামী করে দিয়ে ক্রমশ নিরঙ্কুশ হয়ে উঠল আদর্শায়িত অতীত ভারতের কল্পমূর্তি নির্মাণের প্রবণতা। ঔপনিবেশিক রাজনীতির চাতুর্যেই ইউরোপীয় প্রাচ্যতত্ত্ব বুদ্ধিজীবীদের চোখে মায়া-কাজল পরিয়ে দিয়েছিল। বর্ণ-বিভাজিত বর্গ-বিভাজিত লিঙ্গ-বিভাজিত সমাজের প্রকৃত বাস্তবকে আচ্ছন্ন করে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থপরিপোষক এই ভাবকল্প ছিল মূলত ব্রাহ্মণ্যবাদী জীবনচর্যার অনুসারী, স্বভাবত এতে সামাজিক ইতিহাসের বিচিত্র কৌণিকতা ও উচ্চাবচতা প্রতিফলিত হয়নি। বাঙালি সমাজে নিঃশব্দ গরিষ্ঠ অংশের কাছে ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রকাঠামোর পরিপোষক ও সুবিধাভোগী বর্গের 'নবজাগরণ' ও সংশ্লিষ্ট উচ্চাকাঙ্ক্ষা কোনো তাৎপর্য নিয়ে আসেনি, যুগবাহিত অন্ধকারের বুক চিরে আলোর কোনো রেখাই তাদের চোখে পড়েনি। ফলে প্রাচ্যতত্ত্ব-প্রসূত আদর্শায়িত অতীতে পৌঁছানোর তাগিদে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে যত ধরনের প্রয়াস সূচিত হয়েছিল, এদের সঙ্গে নিঃশব্দ গরিষ্ঠ অংশের কোনো আত্মিক যোগাযোগ গড়ে উঠল না।" (আধুনিকতা ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর ; ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত, আধুনিকতা ও বাংলা সাহিত্য ; পৃষ্ঠা—১৩)* আর ঠিক এ কারণেই সমাজের পরগাছা বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত লেখকদের সৃষ্ট উপন্যাস জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা ও বাঙালিত্বকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, ঐতিহ্যকে উপেক্ষা ও ঘৃণা করে ঔপনিবেশিক সমাজের মধ্যে গড়ে-ওঠা আধুনিকতার অবভাসকেই উপজীব্য করে তুলেছিল, কথা-গ্রন্থনার দেশজ পদ্ধতি, উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। তাদের উপন্যাসে প্রান্তিকায়িত মানুষ দূরীকৃত অপর সত্তা হয়েই থাকল। এখানেই তারাশঙ্করের জোর। এই দূরীকৃত পরিধিবাসী অপর সত্তা কেন্দ্রে চলে এল তাঁর উপন্যাসে। এই 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'তেই তথাকথিত বিচারপদ্ধতিতে যদিও বনওয়ারীই নায়ক, তবু গোটা কাহারসমাজ ও তাদের জীবনই উপন্যাসটিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। তাদের সমবায়ী শক্তিই উপন্যাসটিকে উপন্যাস হয়ে উঠতে সাহায্য করেছে। সত্যি কথা বলতে গেলে গোটা পরিসর ও সময়ই এখানে নায়ক, বনওয়ারী সেই সময় ও পরিসরেরই একজন। এদিক থেকে বিচার করলে এটি একটি সার্থক সমবায়ী পাঠকৃতি যা দেশজ আখ্যানপদ্ধতিকে অবলম্বন করেই তিলে তিলে গড়ে উঠেছে। উনিশ শতকের বাংলা কথা-সাহিত্যে ন্যাচারেলিজমের যে প্রভাব দেখা যায়, তারাশঙ্করের উপন্যাসে তা নেই, মাছিমারা কেরানির কাজ তিনি করেননি। বস্তুত তার উপন্যাসের বাস্তবতা রিয়ালিজমের বাস্তবতা, কিছুটা মেটিরিয়ালিজমেরও। গঁকুর ভ্রাতৃদ্বয়ের বাস্তবতা বা জোলার বাস্তবতার সঙ্গে ওই বাস্তবতার কোনও মিল নেই কারণ শেষোক্তদের বাস্তবতা ন্যাচারেলিজমের বাস্তবতা, জীবনের যথাযথ রূপায়ণই এদের কাজ।

বিপরীতক্রমে রিয়ালিজমের বাস্তবতাকে খুঁজে পাওয়া যায় ফ্লবেয়ার, টলস্টয়, দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে। এঁরা অভিজ্ঞতার সার সত্যকে প্রকাশ করেন, বস্তুর নিছক দৃষ্টরূপের চিত্রায়ণ এঁদের লক্ষ নয়, বস্তুর মর্মগত সত্যের রূপায়ণই এঁদের অভীষ্ট। একটু বিস্তৃত অর্থে কাফ্কার Trial বা Castle এমনকী Metamorphosis-কেও রিয়ালিজমের বাস্তবতা বলে ধরে নিলে খুব একটা ভুল হবে বলে মনে হয় না। তথ্যে লগ্ন থেকেও তথ্য দ্বারা গ্রস্ত না-হয়ে মর্মগত বাস্তবতার প্রকাশ যদি খাঁটি নভেলের অপরিহার্য সত্য হয়, তা হলে তারাশঙ্করের উপন্যাস সেই খাঁটি নভেলের আদর্শ রূপ। তবু জোলার কঠিন বাস্তবতা যেমন তারাশঙ্করে নেই, তেমনি কাফ্কার উদ্ভট বাস্তবতাও তারাশঙ্করে নেই। উপর্যুক্ত দুই ঔপন্যাসিক বাস্তবতার দুই সীমানায় দাঁড়িয়ে আছেন যেন। এই দুই সীমানার মাঝখানে বাস্তবতার যে বিশাল এলাকা তা-ই যেন তারাশঙ্করে খুঁজে পাই। এই এলাকাটিকে চিহ্নিত করতে হলে পূর্ববর্তী আলোচনাকে আরও একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে অর্থাৎ উনিশ শতক পেরিয়ে বিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত সময়সংক্রান্ত আলোচনাকে টেনে নিয়ে যেতে হবে।

একটু আগে ঔপনিবেশিক বাস্তবের স্ববিরোধিতা সম্পর্কে যে কথা আলোচিত হয়েছিল, বিশ শতকে এসে তার তীব্রতা আরও প্রকট হয়ে উঠেছিল। ইতিহাস যে ঔপনিবেশিক ইংরেজের নিয়ন্ত্রণকে শেষ পর্যন্ত মেনে নেয়নি তার প্রমাণ দুটি বিশ্বযুদ্ধ। এদেশে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অবশিষ্টাংশের উপরিকাঠামোতে ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে গজিয়ে-ওঠা নতুন চিন্তাভাবনায় আরও জটিলতা দেখা দিয়েছিল এ সময়ে। যথার্থ আধুনিকতার পরিবর্তে মেকি ও অনুকরণসর্বস্ব আধুনিকতা প্রাধান্য পেয়েছিল। উনিশ শতকে যেখানে আত্মগত আশু স্বার্থ আদায়ই মধ্যবিত্তের কাম্য হয়ে উঠেছিল, বিংশ শতাব্দীতে এসে তারও সম্ভাবনা সীমিত হয়ে পড়েছিল। শিক্ষার দিগন্ত যতই বিস্তৃত হয়েছিল, নতুন যুগের ধ্যান-ধারণা যতই অনুপ্রবেশ করেছিল, মধ্যবিত্তের ছোট মাপের আত্মস্বার্থের গন্ডি ততই ভাঙতে শুরু করেছিল। এর পর এসেছিল পর পর দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রবল অভিঘাত। সব কিছু তছনছ হয়েছিল এর ফলে। এর পরই ভারতের স্বাধীনতা লাভ। এরই সঙ্গে দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, নতুন অর্থনৈতিক সংকট, নিও-কলোনিয়ালিজমের গোড়া-পত্তন। আসলে ভারতের স্বাধীনতা লাভের সময়ে সামন্তবাদী ও পুঁজিবাদীরা আপোষের মাধ্যমে গাঁটছড়া বেধে হাতে হাত মিলিয়ে একটা নতুন ধরনের শোষণকে ডেকে নিয়ে এসেছিল। তবু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা বিদায় নিয়েছিল, উত্তর-ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা কায়েম হয়েছিল এতে। এই যে একটি সময়ের অবসান ও আরেকটি সময়ের আগমন, এরই প্রেক্ষিতে বুঝতে হবে তারাশঙ্করের দ্বিতীয় পর্বের উপন্যাসগুলোকে বিশেষত আলোচ্য 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-কে কারণ মনে রাখতে হবে, শেষোক্ত উপন্যাসটির রচনাকাল ১৯৪৭। এই সময়ে যাঁরাই উপন্যাস লিখেছেন তাঁদের কেউ কেউ ইউরোপীয় বুদ্ধিবাদের সর্বশেষ আকল্পকে খুঁজেছেন, কেউ কেউ ঐতিহ্যের শেকড়-সন্ধানে ব্যাপৃত থেকে জীর্ণ পুরাতনের কংকালকে জাগিয়ে তুলতে চেষ্টা করেছেন। তারাশঙ্কর দ্বিতীয় গোষ্ঠীভুক্ত। বিকল্প পাঠকৃতি নির্মাণের প্রয়াস তাঁর মধ্যে থাকলেও তা সার্থক হয়ে ওঠেনি। পুরনো সময়ের প্রতি একটা প্রবল টান থেকে গেলেও তাঁর কথা-সাহিত্যে প্রাকৃতায়নের একটি সম্ভাবনার উন্মেষ হয়েছিল বলা যায়। এখানেই তারাশঙ্করের সার্থকতা ও স্বাতন্ত্র্য। তাঁর 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম' বা 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা' পাঠ করলেই পাঠক প্রাকৃতায়নের

এই ব্যাপারটি লক্ষ করে থাকবেন।

যাই হোক, উপনিবেশবাদের সংকটের ফলেই শুধুমাত্র ভারতবর্ষই যে স্বাধীন হয়েছিল তা নয়। পৃথিবীর অন্যান্য উপনিবেশও স্বাধীনতা পেয়েছিল। কিন্তু এ স্বাধীনতা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ছিল শুধুই রাজনৈতিক। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বা মুক্তি বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু ভারতবর্ষে আসেনি। সাদা চামড়ার শোষণের পরিবর্তে কালো চামড়ার শোষণ জারি হয়েছিল। ছেচল্লিশের নৌবিদ্রোহের মাধ্যমে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার যে ঊষালগ্ন আভাসিত হয়েছিল তা-ও ভেস্তে গেল, বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়ে গেল। তবু তা ছিল এক ইতিবাচক পদক্ষেপ। এই ইতিবাচক পদক্ষেপের প্রেরণাও এসেছিল ইউরোপ থেকে। মনে রাখতে হবে, এর আগে ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে জারতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে সোভিয়েত রাশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সমাজতন্ত্র — প্যারি কমিউনের পতনের পর বিশ্বের ইতিহাসে একটি বাঁক-ফেরা মাইলস্টোন। ভারতবর্ষ যখন স্বাধীন হয় তখন চিনের ভেতরে ভেতরে চলছে বিপ্লবের প্রস্তুতি। স্বাধীনতার দু'বছর পরেই অর্থাৎ ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দে চিনে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পুঁজিবাদের ভেতরেই তার সংকট ও ধ্বংসের বীজ নিহিত। উপনিবেশবাদের ক্ষেত্রেও একই কথা। তাই পুঁজিবাদের বুকের ওপরই শ্রমিক শ্রেণী সংগঠিত হয় তাকে ধ্বংস করে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠিত করতে। সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-গণতন্ত্র-সমাজতন্ত্রের আলো ইউরোপ থেকে এদেশে এসেছিল। শোষিত মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে লেগে যায় তখন মানুষ শোষণ থেকে মুক্তি পেতে বিপ্লবের পথেই পা বাড়ায়। অবশ্য বিপ্লবের আগে তার জন্য লাগে দীর্ঘকালীন প্রস্তুতি ও সচেতনতা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আগে সেই সচেতনতার অঙ্কুরোদগম হয়ে গিয়েছিল এদেশে। কম্যুনিস্ট পার্টি তো ইতিমধ্যেই গঠিত হয়েছিল। তাই তারাশঙ্করের আলোচ্য 'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-তে সমাজতান্ত্রিক চেতনার আভাস পরিলক্ষিত হয়। 'ধাত্রীদেবতা'-র কাল থেকে পূর্বোক্ত উপন্যাসের রচনাকাল পর্যন্ত সমাজতান্ত্রিক-সাম্যবাদী আদর্শের প্রতি আকর্ষণটাই ছিল তাঁর কাছে মুখ্য। কিন্তু পরে সে-আকর্ষণে ভাঁটা পড়েছিল তা তাঁর তৃতীয় পর্বের উপন্যাস পড়লেই বোঝা যায়। করালীর মধ্যে যে যুক্তিবাদ, পুরনোকে ভাঙার প্রবল প্রেরণা, বনওয়ারীর সঙ্গে দৈহিক লড়াই ও জয়—সবই সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার ফসল। আসলে বনওয়ারী ও করালীর এ যুদ্ধ শুধু বাস্তব যুদ্ধ নয়, একটি প্রতীকী যুদ্ধও। এ যুদ্ধে করালীর জয় মানে সমাজতন্ত্রের জয়। আর এখানেই উপন্যাসটির আসল সমাপ্তি। এরপরও তারাশঙ্কর উপন্যাসটিকে আরও টেনে নিয়ে গেছেন বহু দূর। কিন্তু তা ওই ঘটনাটিরই জের। বনওয়ারীর মৃত্যু, শহর 'চন্ননপুরে'র আকর্ষণে বাঁশবাঁদির কাহারদের পুরনো জীবনচর্যার অনিবার্য ভাঙন আধা-সামন্তবাদী জীবনযাত্রার অবসান—এ সবই ফলশ্রুতি, সময়প্রবাহের বাঁক-ফেরা,ভিন্নমুখী টান।

।। চার ।।

এই যে সময়প্রবাহের বাঁক-ফেরা ও ভিন্নমুখী টানের ব্যাপারটি এখানে উত্থাপিত হল, তা সম্ভব হয়েছে করালীর মাধ্যমেই। সে সমাজশক্তির অপ্রতিরোধ্য আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেনি। তাই সে গ্রাম ছেড়েছে, শহরে চলে গেছে। তবু অন্তরের অন্তস্থলে দীপিত ও সুরক্ষিত যুক্তিবাদ, সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও জীবননীতি তরুণদের মধ্যে প্রচার করে নিজ শক্তি বৃদ্ধি করেছে, পুরাতনের সম্পূর্ণ উচ্ছেদের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। দৈবনিয়ন্ত্রণ ও অন্ধ বিশ্বাসের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেনি। উচ্চবর্ণের প্রতি নিম্নবর্ণের অন্ধ আনুগত্য, অবৈধ

যৌন সম্পর্কে কুসংস্কারাচ্ছন্ন কাহার সমাজ ও তাদের দলপতি বনওয়ারী দাসসুলভ মনোবৃত্তি থেকে মেনে নিলেও করালীর স্বাধীন চিত্তবৃত্তি, সুতীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধি এগুলোর মধ্যে প্রচ্ছন্ন হীনতা ও অপমানকে উপলব্ধি করেছে, এগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তাই তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে নবযুগের সমাজতান্ত্রিক ও সাম্যবাদী আদর্শের বাণী। স্বজাতির ধর্ম ও আচার-অনুশাসনকেন্দ্রীক জীবন থেকে সে অনেক দূরে সরে গেছে। হিমেরুবিষম দূরত্বে অবস্থিত অতীতচারী বনওয়ারীর সঙ্গে তার সেতুবন্ধ রচিত হয়নি। জাঙল ও বাঁশবাদীর মাঝখানে ব্রহ্মদৈত্যতলা থেকে যে 'শিস'-এর শব্দ শোনা যাচ্ছিল তাকে নিয়ে কাহাদের আধিভৌতিক ও অধিদৈবিক জল্পনা-কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয়নি। কর্তাবাবার বাহন বলে গৃহীত চন্দ্রবোড়া সাপটাকে মেরে সে শুধু 'শিশ' ওঠার কারণকেই উৎসাধন করেনি, সেজন্য পাপবোধের পরিবর্তে বীরত্বেরই প্রকাশ করেছে। গোটা কাহারপাড়া সাপ মারার ভয়ে যেখানে ভীত হয়ে উঠেছে সেখানে করালী মনে মনে বীরপুরুষের মতো দাপিয়ে বেড়িয়েছে। কাহারপাড়ার ভয়ের অনুভূতিটি খুব সুন্দরভাবেই উপস্থাপিত করেছেন তারাশঙ্কর— *"কোপাইয়ের তীরে চিতা সাজিয়ে দাহ হ'ল বাবার বাহনের। গোটা কাহারপাড়া চান ক'রে ফিরল। বানওয়ারী প্রণাম ক'রে এল বাবার থানে।—হে বাবা! রক্ষা কর বাবা! পাষণ্ডকে দমন কর বাবা। কাহারদের মালিক, কাহারদের রক্ষা কর।"* অমঙ্গলের হাত থেকে বাঁচবার জন্য যখন কাহারেরা পুজো দিয়েছে, তখন সেখানে হঠাৎ করালী হাজির হয়ে আরেক কাণ্ড বাঁধিয়ে দিল— *"করালী আর কোন কথা না ব'লে পট পট করে হাঁস তিনটের মুণ্ডু দু হাতে টেনে ছিড়ে ফেলে দিয়ে বলল—কত্তা, খাবে তো খাও, না খাবে তো খেয়ো না, যা মন চায় তাই কর। আমাদের হাঁস খাওয়া নিয়ে কথা, আমাদের বলিদান হয়ে গেল।—ব'লে মুখে বলিদানের বাজনার বোল আওড়াতে আওড়াতে চ'লে গেল—খা—জিং জিং—জেনাক পুজো—*

মুণ্ডুগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে হাঁসগুলোকে নিয়ে সে চলে গেল। গোটা পাড়াটা স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল"। করালীর এই ঘটনা সামন্তবাদী বিশ্বাসের মর্মমূলেই আঘাত করেছে।

দুটি বিশ্বযুদ্ধের প্রসঙ্গ আগেই উত্থাপিত হয়েছে। ওই দুটি বিশ্বযুদ্ধ সমাজের নীচু তলার মধ্যেও ভাঙনের সূত্রপাত করেছিল, তাও আগে উল্লেখ করা হয়েছে। তারাশঙ্করের বর্ণনায় — *"আর একটা যুদ্ধ দেখেছে বনওয়ারী। ছ টাকা জোড়া কাপড় হয়েছিল। ধানের দর হয়েছিল চার টাকা। ওই তখনি চন্দনপুরের মুখুজ্জেবাবুরা কয়লার কারবারে ফেঁপে রাজা হয়ে উঠল। বনওয়ারীর মনিব মাইতো ঘোষ পাট কয়লা বেচে কম টাকা করে নাই। অনেক টাকা। আবার চন্দনপুরের চার-পাঁচ ঘর জমিদার বাড়ি ভেঙে গেল, মহাল বিক্রি করলে, জাঙলের চৌধুরী বাড়ি একেবারে 'নাজেহাল' হয়ে ফেল প'ড়ে গেল। জাঙলের সদগোপদের বৃদ্ধি ওই যুদ্ধের সময়। আগে সবাই ছিল খাঁটি চাষী, কাহার-কৃষাণদের সঙ্গে তারাও লাঙলের মুঠো ধরত, কোদাল ধরত, খাটো কাপড় পরত ; যুদ্ধের বাজারে ধান চাল কলাই গুড় বেচে সবাই ভদ্রলোক হয়ে গেল। এবার আবার সবাই কোমর বেঁধেছে, এ যুদ্ধে যে তাদের কি হবে, কে জানে! তবে তাদের মঙ্গলই কামনা করে কাহারেরা। তাদের লক্ষ্মীর বাড়বাড়ন্ত হ'লেই কাহারদের মঙ্গল, তাদের মা-লক্ষ্মীর 'পাঁজের' অর্থাৎ পদচিহ্নের ধুলো কুড়িয়েই কাহারদের লক্ষ্মী। যুদ্ধে কাহারদের কিছু যায় আসে না।"* এ বর্ণনা থেকে সময়-স্বভাবকে চিনতে অসুবিধে হয় না। তথ্য বলছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের যুগে জমিদারি প্রথা বিলোপের আগে পর্যন্ত

বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণির উচ্চতম স্তরটি ছিল প্রধানত জমিদারদের নিয়ে গঠিত। এসব জমিদার সামন্তপ্রভুদের মতো ছিলেন না। এদের প্রায় সবাই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সৃষ্টি। সামন্ততন্ত্রের মূল কাঠামোটাই নতুন ভূমিব্যবস্থায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ এদের সংকটকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। তাই তারাশঙ্করের বর্ণনায় *"চন্দনপুরের আর চার-পাঁচ ঘর জমিদার বাড়ি ভেঙে গেল, মহাল বিক্রি করলে, জাঙ্গলের চৌধুরী বাড়ি একেবারে 'নাজেহাল' হয়ে ফেল প'ড়ে গেল।"* আবার আরেকদিকে গজিয়ে উঠেছিল নতুন দালালরা। এরা ব্যবসা করে নতুন করে পুঁজি সঞ্চয় করেছিল। এদেরই প্রতীক 'মুখুজ্জেবাবুরা' কিংবা 'সদ্‌গোপ'রা। তবে এতে অর্থনৈতিক দিক থেকে একেবারে নিচুতলার মানুষের বা যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করত তাদের কোনও উন্নতি হয়নি। তাই *'যুদ্ধে কাহারদের কিছু যায় আসে না।'* তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই থেকে গেছে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক থেকেই। অতি নিম্নবর্গের প্রান্তিকায়িত জীবনের প্রতি গভীর মমতা ও সহানুভূতি নিয়ে লেখা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস', মহাশ্বেতা দেবীর 'অরণ্যের অধিকার' বা দেবেশ রায়ের 'তিস্তাপারের বৃত্তান্ত'-এর গোত্রে তারাশঙ্করের এই উপন্যাসটিকে ফেলা যায়। এমনকি তারাশঙ্কর পূর্বোক্তদের পথপ্রদর্শকও বলা যায় কেন না উপন্যাসে প্রাকৃতায়নের দরজাটি তিনিই খুলে দিয়েছিলেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে।

'হাঁসুলীবাঁকের উপকথা'-র সমালোচনা করতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, *"এই উপন্যাসে প্রাচীন মহাকাব্যের নিয়তিবাদ, ও দেবতা-মানুষের অন্তরঙ্গ সম্পর্কে রচিত, দ্যাবা-পৃথিবীর মিলন-সংবেগ-প্রসূত, দ্বি-স্তরবিন্যস্ত জীবনযাত্রা যেন অতি-আধুনিক যুগের সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রতিবেশে এক আশ্চর্য মন্ত্রকুহকে অক্ষুণ্ন, অবিকৃতভাবে সংরক্ষিত হইয়াছে।" (বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা ; চতুর্থ পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৩৬৯ ; পৃষ্ঠা— ৫৫৫)* এ মন্তব্যটিকে সত্য বলে ধরে নিলে এতগুলো শব্দ যে খরচ করা হল তা বৃথাই। প্রাচীন মহাকাব্যগুলির নিয়তিবাদ এক ব্যাপার আর তারাশঙ্করের এ উপন্যাসে বাবাঠাকুর ও কালারুদ্রের যে প্রসঙ্গ বর্ণিত তা অন্য ব্যাপার। ইলিয়াড, ওডিসি, রামায়ণ ও মহাভারতে সব কিছুই দৈব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এমন কি প্রাচীন গ্রিক ট্র্যাজেডিতেও একই ব্যাপার পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে কাহারদের লোকবিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের প্রসঙ্গে দেবতা এসেছেন, তা-ও লৌকিক দেবতা। কিন্তু উপন্যাসের হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে দেবতার ভূমিকা মুখ্য নয়, মুখ্য সময়ের ভূমিকা। আগেই বলেছি, গোটা উপন্যাসের নায়ক হচ্ছে সময়। সময়ের ভাঙা-গড়ার প্রেক্ষিতেই ঔপন্যাসিকের জীবন জিজ্ঞাসা ঘনীভূত হয়েছে। দেবমহিমা কীর্তন তো উপন্যাসের লক্ষ্যবস্তু হতে পারে না। উপন্যাসের লক্ষ্যবস্তু মানুষ ও তার জীবন। অদৃষ্টবাদ বা নিয়তিবাদ উপন্যাসে অপ্রাসঙ্গিক। বরং বলতে পারি, এ উপন্যাসে ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের দিকে প্রবল ঝোঁক রয়েছে। পাঠক এ ব্যাপারটি বিচার করে দেখতে পারেন।

এখানে আরেকটি বিতর্কের অবতারণা করা যেতে পারে। ঐতিহ্যের পুনর্নির্মাণের বদলে ঐতিহ্য রক্ষাই এ উপন্যাসে বড় করে দেখানো হয়েছে। তারই ধারা বেয়ে এসেছে সুচাঁদ চরিত্রটি যা উপন্যাসটিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায়, *"সুচাঁদ যে কাহার-সমাজের ঐতিহ্যরক্ষক ও আধিদৈবিক বিপদের সংকেতবাহী, মাতব্বর বনোয়ারি তাহার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার পরিচালক ও ঐহিক পারত্রিক কল্যাণ সাধনের*

প্রধান হোতা। সুচাঁদের দৃষ্টি অতীত-পরাবৃত্ত ও ঊর্ধ্বলোক-নিবিষ্ট — বর্তমান তাহার নিকট জীবনধারণের কালাধার হইলেও তাহার মানসলোকে ইহা গৌণ। ঠিক অতীতের ছাঁচে বর্তমান ঢালা হইতেছে কিনা ও কালারুদ্র ও কর্তাবাবার ইঙ্গিত ঠিক মত ইহার মধ্যে অনুসৃত হইতেছে কি না, সে দিকে তাহার অতন্দ্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। বনোয়ারির সহিত তাহার সাময়িক মতানৈক্য ঘটিলেও উভয়ের মধ্যে একটি নিবিড় আত্মিক সংযোগ আছে।" (ওই) চারিত্রিক এনাটমি অবশ্য তা-ই বলে। কিন্তু সামগ্রিক বিচারে উপন্যাসের ফিজিওলজিতে অন্য ব্যাপার ধরা পড়ে। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার দ্বন্দ্ব এবং আধুনিকতার প্রতিষ্ঠা ও জয় যেখানে উপন্যাসটির মর্মসত্য সেখানে সুচাঁদ সেই দ্বন্দ্বটিকেই তীব্র করেছে মাত্র। উপন্যাসটি যে নতুন সময়ের দিকে ইঙ্গিত করেছে সুচাঁদ সেই নতুন সময়ের প্রতিভূ হয়ে উঠতে পারেনি। অতীতপ্রীতি এখানে মুখ্য নয়, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে যে মহাসময়ের দ্যোতনা রয়েছে উপন্যাসটিতে তা-ই মুখ্য। বলতে পারি, সুচাঁদ একটি খণ্ডকাল। খণ্ডকাল কীভাবে মহাকালে বিলীন হয়ে যাচ্ছে তা-ই উপন্যাসটির প্রতিপাদ্য বিষয়। আর এজন্যেই এটি একটি বিখ্যাত ক্লাসিক।

ঋণ-স্বীকার ঃ—

১) আমার সাহিত্য জীবন, ১ম পর্ব—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
২) New York Daily Tribune, 25 June 1853.
৩) আধুনিকতা ঃ পর্ব থেকে পর্বান্তর — তপোধীর ভট্টাচার্য।
৪) বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা — সত্যেন্দ্রনাথ রায়।
৫) বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা — শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
৬) বাখতিন ঃ তত্ত্ব ও প্রয়োগ — তপোধীর ভট্টাচার্য।

■ *লেখক বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক তথা 'শরিক সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক।*

ঘরে-বাইরে ঃ চরিত্রের গভীরে স্পট লাইট

বনশ্রী চৌধুরী (চক্রবর্তী)

রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসটির রচনাকাল হচ্ছে ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দ, অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক। সেই সময় সমগ্র ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কবলে। এই সাম্রাজ্যবাদের নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে তখন সমগ্র দেশ জুড়ে স্বদেশী আন্দোলনের এক উত্তাল তরঙ্গ বয়ে চলেছিল, আমাদের বাংলাদেশও এই প্রচেষ্টা থেকে বিরত ছিল না এবং তখনও এই বাংলাদেশ থেকে জমিদারি প্রথা লুপ্ত হয়নি। তাই বিংশ শতাব্দীতে লিখিত হয়েছিল বলেই এই উপন্যাসে সেই কালেরই চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

জমিদারি প্রথা যেহেতু তখনও বিলুপ্ত হয়নি সেহেতু হয়তো এই উপন্যাসের পটভূমি হিসেবে তৎকালীন জমিদার বাড়িকেই লেখক গ্রহণ করেছেন। জমিদার বাড়ির প্রত্যেকটি চরিত্রের জীবনের দ্বন্দ্ব, টানাপোড়েন, জীবনবোধের আদর্শ, প্রেম, বিলাসিতা সব উত্থান-পতনের কাহিনি এই উপন্যাসের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করেছেন তিনি। কাহিনি বিন্যাসে একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে প্রত্যেকটি চরিত্রের আত্মসমীক্ষা তাদের নিজ নিজ আত্মকথনের মাধ্যমে প্রকাশ লাভ করেছে। এখানে এই উপন্যাসের প্রধান তিনটি চরিত্র, আলোচনার প্রতিপাদ্য বিষয়, জমিদার নিখিলেশ, তার স্ত্রী বিমলা ও নিখিলেশের বাল্যবন্ধু স্বদেশী আন্দোলনের নেতা সন্দীপ। এই তিনটি চরিত্রের স্বতন্ত্র ও যৌথমানস প্রতিক্রিয়াকে সমন্বিত করে লেখক এই উপন্যাসের ধারাবাহিকতা খুব সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে রক্ষা করেছেন। অন্যান্য উপন্যাসের মতো নিজের বাচনভঙ্গি ও চরিত্রগুলির মুখে সংলাপ দিয়ে তা রচনা করেননি। সেই ধারাবাহিকতা বর্জন করে তাদের উপর চলমান ঘটনার পেষণ-অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা, আত্মসমীক্ষা ও শেষে স্ব-স্ব ভুলের মাশুল গোনা লেখক নিজের কথায় প্রকাশ না করে তাদের নিজের আত্মকথনের মাধ্যমে পাঠকের সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছেন—এটা এই উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এই প্রয়াস বোধ করি উপন্যাস নিয়ে লেখকের এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা। নিখিলেশ, বিমলা ও সন্দীপ তাদের স্ব-স্ব জায়গায় থেকে নিজস্ব ব্যক্তিত্বে আমাদের সামনে এসেছে তাদের বারবার আত্মকথনের মাধ্যমে। বিমলার আত্মগ্লানি, নিখিলেশের বঞ্চিত হৃদয়ের চাপাকান্না, দার্শনিকতা, সন্দীপের নিঃসংকোচ আত্মসর্বস্বতা, দেহসর্বস্ব নীতিহীনতার দৃপ্ত স্পর্ধা তাদের আত্মকথনের মাধ্যমে অপূর্ব নাটকীয়তায় ও প্রত্যক্ষতায় অভিব্যক্ত হয়েছে।

প্রবৃত্তি নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব, মোহ ও মোহভঙ্গের বেদনা পর্যায়ক্রমে তাদের প্রত্যেকের স্বগত ভাষণ ও আত্ম-উদ্‌ঘাটনের মাধ্যমে এক অপূর্ব রসবোধের সৃষ্টি করেছে। জীবন মন্থন করা সুধা হলাহল আমাদের অনুভূতির পাত্রকে কানায় কানায় রসোচ্ছল করে ও সংকীর্ণ পরিবেশের মধ্যে জীবন সমুদ্রের এই উত্তাল আলোড়ন আমাদের কাছে এক নতুন সম্ভাবনার পরিচয় বহন করে।

বিমলার আত্মকথনের মাধ্যমে এই উপন্যাসের সূচনা। এর মাধ্যমে উপন্যাসের ঘটনাবলির পূর্ব পটভূমিকা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। বিমলা ও নিখিলেশের উপন্যাসপূর্ব দীর্ঘ দাম্পত্যজীবন, নিখিলেশের পারিবারিক বংশপরিচয় বিমলার সঙ্গে তার বড় জা'দের তীর্যক-কটাক্ষপাত, ঈর্ষাবিকৃত সম্পর্ক, রাজবাড়ির রীতিনীতি আদব-কায়দা বিশেষতঃ বিমলা ও

নিখিলেশের পারস্পরিক মনোভাব বোঝাপড়া ও মানবিক পরিচয় এবং শ্বশুররাড়িতে তার অধিকারবোধ ও দ্বিধাসংকোচ—এক কথায় পরীক্ষার পূর্বে যে সংসার যাত্রা তাদের ভবিষ্যৎ সংকটের ভূমিকা রচনা করেছে বিমলার প্রথম আত্মকথায় তা চমৎকারভাবে বিন্যস্তও হয়েছে। এই ভূমিকাপট থেকে আমরা ভবিষ্যৎ জটিলতার সূত্রটিও সহজে আবিষ্কার ও অনুসরণ করতে পারি।

উপক্রমণিকা থেকে যা বোঝা যায়, তা হচ্ছে বিশেষভাবে বিমলা ও নিখিলেশের দাম্পত্য মিলনের স্বরূপ পরিচয়। বিমলার এই প্রাক্‌কথনের মধ্যে পরবর্তী জীবনের ভুলভ্রান্তির জন্য গভীর অনুতাপ ও আত্মধিক্কারের সুর অনুরণিত হয়েছে। বিমলা তার অনাগতের রক্তালোকে অতীতের জীবন স্মৃতিকে অনুরঞ্জিত করে দেখেছে। নিখিলেশের বংশমান সে পূর্ব বেদনার অশুভ ছায়া তার সমৃদ্ধি রৌদ্রকে এক অনিশ্চিত আতংকে পাণ্ডুর ও ধূসর করে রেখেছে। তার জ্যেষ্ঠ দুই সহোদর বিলাস-ব্যসনের অগ্নিশিখায় নিজেদের সাংসারিক সুখ-শান্তি এমনকী পরমায়ু পর্যন্ত আহুতি দিয়েছে। এই দৈবরোষের দাবদগ্ধপথ দিয়েই বিমলা তার দরিদ্রতা ও রূপহীনতা সত্ত্বেও রাজবাড়ির বধূরূপে প্রবেশ করার অধিকার লাভ করেছে। পিত্রালয়ের ঐতিহ্য, মায়ের কাছে শেখা পতিব্রতার সম্পদই সে যৌতুকরূপে বহন করে নিয়ে এসেছে এই রাজবাড়িতে। তার স্বামীপ্রেমের মধ্যে স্বামীর অপরিমিত আদর স্নেহ প্রশ্রয় ও অকুণ্ঠ মর্যাদা পাওয়া সত্ত্বেও স্বামীভক্তির ও পূজার একটি আবশ্যিক স্থান ছিল। ঠাকুমার অতীত দুর্ভাগ্যের স্মৃতিতে স্বপ্নবিড়ম্বিত মনের কাছে এই ছোটবধূটি রাজবাড়ির সর্বময়ী গৃহলক্ষ্মীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। নিখিলেশ যখন তাকে আধুনিক শিক্ষা, বেশভুষায় সজ্জিত করে তার মধ্যে সংস্কার বিরোধী রুচি ও খেয়াল সম্বন্ধে সচেতন করতে চেয়েছিল এবং ঠাকুমার দাক্ষিণ্যে অন্তঃপুরে অবাধ বিচরণের স্বাধীনতা বিমলা পেয়েছিল, তখন মাঝে মাঝে দুই জা-এর শ্লেষ ব্যঙ্গোক্তি তাকে বিদ্ধ করত। বড় জা নিজের পাওনা গণ্ডার হিসেব নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতেন, কিন্তু মেজ জা-এর ভাবভঙ্গি জলি উপাদানে গড়া, এবং তার স্বরূপও প্রহেলিকাময়। তার দৃষ্টি সদা সর্বদা সজাগ প্রহরীর মতো বিমলাকে পাহারা দিত এবং তার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অন্তরাশায়ী ঈর্ষার দ্বারা উদ্রিক্ত অবচেতন অভিপ্রায়ের মর্মবিদারণে অব্যর্থ। নিখিলেশের প্রতি তার কৈশোর লালিত এক যথার্থ স্নেহানুভব ছিল। বিমলা নারীসুলভ অসহিষ্ণুতায় এই খুঁত ধরা ও ব্যঙ্গবিদ্রূপের বিরুদ্ধে যখন নিখিলেশের কাছে নালিশ জানাত, তখন সে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে, তাদের দুর্ভাগ্যের কথা বলে বিমলাকে প্রবোধ দিত। সে বিমলাকে গৃহাভ্যন্তরের ঘেরাটোপ, সমস্ত সংস্কার ও সাংসারিক সন্দেহপ্রবণতা ঈর্ষাকাতরতা থেকে মুক্ত করে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটাতে চেয়েছিল। নিখিলেশের জীবনের পাঠকৃতির সঙ্গে বিমলার জীবনের পাঠকৃতির যে বিশাল বৈপরীত্য ছিল, তা নিখিলেশ অনুধাবন করতে পারেনি, তাই তাকে জীবনের অনেকটা সময় খুব সঙ্কটের মধ্য দিয়ে কাটাতে হয়েছে।

প্রত্যেক নারী হৃদয়েই স্বামী হিসেবে কল্পনায় আঁকা এক পুরুষ থাকে। বিমলার মধ্যেও এই ব্যতিক্রম ছিল না। যেদিন সে প্রথম স্বামীগৃহে প্রবেশ করে সেদিন পর্যন্ত তার অন্তর জুড়ে সেই কল্পিত পুরুষ নিখিলেশই ছিল। সমাজে মানুষ যতই দর্শন তত্ত্ব, জীবনবোধ সম্বন্ধে আগ্রহী হোক না কেন, গার্হস্থ্য জীবনে প্রত্যেক নরনারীর ভালোবাসা বা প্রেম, তত্ত্ব, দর্শনের গণ্ডি ছাড়িয়ে মানবিক দাবির সম্মুখীন হতে বাধ্য। দেহকে বাদ দিয়ে দেহাতীত প্রেম দাম্পত্য জীবনে অচল। তাদের পরস্পরের মধ্যে এক স্বভাবসুলভ পরম্পরা বিরাজ করে।

নিখিলেশ এই স্বভাবজাত প্রবৃত্তিকে নির্বাসন দিয়ে, বিমলাকে আধ্যাত্ম জগতে নিয়ে গিয়ে সেখানে তার সম্পূর্ণ নারীসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল, এবং বাইরের জগৎ যে কত বিশাল উদারতায় বিরাজমান সেকথা বিমলাকে বুঝিয়ে তাকে অসীমের কোলে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। আর এরই প্রয়াসে ব্যস্ত হয়ে সে বিমলার হৃদয়বৃত্তিকে উপলব্ধি করতে পারেনি। সে চেয়েছিল পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতায় বিমলা ঘরের কোণটুকু ছেড়ে বাইরের জগৎকে চিনে নিক। এবং বিমলার হৃদয়বৃত্তিতে বা প্রবৃত্তিতে যে নারীসত্তা ছিল, সেই নারীসত্তাকে সে উর্দ্ধায়িত করে চিরকালীন নারীস্বভাবের থেকে আলাদা করে গড়ে তোলার চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল। নিখিলেশ তখনও বুঝতে পারেনি যে গৃহকোণে প্রজ্জ্বলিত দীপশিখার মৃদু আলো যেমন গৃহকে শান্ত ও স্নিগ্ধ রাখে, তেমনি সেই আলো যদি দীপাধার থেকে ছিটকে বাইরে এসে পড়ে, ঘরের মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে সে যে কী বিষম কাণ্ড ঘটাতে পারে, এবং সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দেয়। এই অজ্ঞানতাবশতঃই সে তার নিজস্ব ভাবাদর্শে বিমলাকে স্বমহিমায় উদ্ভাসিত দেখতে চেয়েছে। এতে তার চরিত্রের ঔদার্যতা, মহত্ব প্রকাশ পায় যদিও, তবুও তার অন্তরালে যে মূর্খতা কাজ করেছে এরই জন্যে অতি সৎ ব্যক্তি হয়েও তাকে নানা কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। জোর করে চাপিয়ে দেয়া বোঝা যে কোনও মানুষের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে যদি তা গ্রহীতার অন্তরের সঙ্গে, তার প্রবৃত্তির সঙ্গে খাপ না-খায়। অথচ নিখিলেশ বিমলার অন্তরের আকুতি বুঝতে পারেনি, স্ত্রীর মর্যাদা দিলেও তার মানসিক চাহিদাকে সে অবহেলা করেছে। বিবাহিত জীবনের পূর্ব থেকেই বিমলার, শুধু বিমলার কেন, সকল নারী হৃদয়ে যে সযত্নে লালিত স্বভাবসুলভ বাসনা কামনা থাকে তা নিখিলেশ বুঝতে অক্ষম বলেই সে বিমলার হৃদয়ের সেই আকুতিকে অগ্রাহ্য করে তাকে আধ্যাত্মদর্শন, তত্ত্ব, সম্বন্ধে জ্ঞান দিতে গিয়ে তার নিজের এবং বিমলার দুজনের জীবনে এক চরম বিপর্যয় ডেকে এনেছিল।

সত্য যত বড় বা ক্ষুদ্রই হোক না কেন তাকে বাইরে থেকে লাভ করা যায় না, অর্থাৎ তা হচ্ছে মানুষের জীবনের সত্য, তাই গৃহী জীবনে আধ্যাত্মিকতার কোনও ফল নেই। সত্যবোধকে নরনারী আপনার নিজস্ব প্রকৃতির গুণে নিত্য নতুনভাবে লাভ করবে এটাই চিরন্তন সত্য। কাজেই এমনি করে নিজের মনে নিজের চলার পথে সত্যকে লাভ না-করলে সত্য কখনও আপনার হয় না। গাছপালার মত অবশ স্বীকৃতিতে সত্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয় না। মানুষ তার দুঃখভোগ, ত্যাগ ও তপস্যার মধ্য দিয়ে যতটুকু সত্য লাভ করে, ততটুকুই তার নিজস্ব, একান্ত, এরই মধ্যে জীবনের সার্থকতা। নিখিলেশ এই সত্যকে উপলব্ধি করতে পারেনি, তাই স্বামীস্ত্রীর মধ্যে যে চিরকালীন একটা বন্ধন, একটা চাহিদা থাকে, বিমলার মধ্যেও সেই চাহিদা ছিল। নিখিলেশ সে বন্ধন সে চাহিদাকে অগ্রাহ্য করে বিমলাকে জগৎ দর্শনের সেই ছোট আমি থেকে বড় আমি উপলব্ধিতে উত্তোলিত করতে চেয়েছিল। নারীকে স্ত্রীরূপে দেখার যে মানস আবেগ, সমাজ সংস্কার ও সার্বভৌমত্ব তার জীবনে দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। জীবনদর্শনের বাইরে গার্হস্থ্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর প্রবৃত্তির স্বীকৃতির উপরই যে দম্পতির নিত্যসম্বন্ধ বিরাজমান তা নিখিলেশের দার্শনিক মনোবৃত্তির আড়ালে চাপা পড়ে যাওয়াতে নিখিলেশ ও বিমলার জীবনে এই বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, নারীসত্তার প্রতি এই অনাসক্তি নিখিলেশের জীবনের চরম এবং পরম ভুল। আর, এই ভুলের মাশুল তাকে গুণতে হয়েছে সুদীর্ঘকাল আত্মদহনের মাধ্যমে।

একদিকে সংসারে পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকলেও বিমলার নারীসত্তার প্রতি

নিখিলেশের অবহেলা, পারিবারিক ব্যঙ্গবিদ্রূপ, অপরদিকে বিমলার নারীমননেব স্বপ্নভঙ্গ তাকে পতনের মুখে ঠেলে দিয়েছে। স্বামীব কাছে যখন জীবনদর্শন বড়, এবং তার নিজস্ব সত্তা ও প্রবৃত্তি অবহেলিত হয়েছে সেই ভাঙা পথের রাঙাধূলায় ঘটেছে সন্দীপের আবির্ভাব।

স্বামী নিখিলেশ স্ত্রীকে পূর্ণ মর্যাদা দিলেও জীবনবোধ, দর্শন জ্ঞান এসব যে স্ত্রীর মানসিক চাহিদার পরিপন্থী, সেকথা বুঝতে না-পারা নিখিলেশ যতই শিক্ষিত মার্জিত, উদার ও আধুনিক মনস্ক হোক না কেন, তাকে প্রকৃত পুরুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা কষ্টকর হয়ে পড়ে। পাপ কাজ করা, বা অন্যায় করা আদর্শহীনতাব পরিচায়ক হতে পারে, তাই বলে স্ত্রীর মানসিক চাহিদা অপূর্ণ করা দার্শনিক নিখিলেশ এখানে সম্পূর্ণ সাংসারিক হয়েও প্রবৃত্তির প্রতি যে অবিচার করেছে, প্রবৃত্তিও তো আদর্শের বশবর্তী হতে পারে। তাই প্রশ্ন জাগতে বাধ্য নিখিলেশের কাছে আদর্শ বলতে কি শুধু সীমা-অসীমার পরিব্যাপ্তি? দর্শনতত্ত্ব কি বেশি কার্যকরী? সীমার মধ্যে অসীমকে পাওয়াই কি জীবনের সার্থকতা? বিবাহিত স্ত্রীর প্রবৃত্তিকে নিবারিত করাও তো স্বামীর একটি আদর্শ। নিখিলেশ সংসার ভুলে জীবনদর্শনের সেই আধ্যাত্মবাদকেই আঁকড়ে ধরেছিল।

সন্দীপ নিখিলেশের বাল্যবন্ধু। সুতরাং সন্দীপের স্বভাব চরিত্র তার অজানা নয়, তবু সে সন্দীপকে তার জমিদারিতে আস্তানা বানাতে সাহায্য করেছিল। তখন সেখানে স্বদেশী আন্দোলনের আগুন জ্বলেনি। সেই জমিদারিতে স্বদেশী পান্ডা হয়ে সন্দীপ ঠাঁই পেল। সন্দীপের স্বদেশীয়ানা মহৎ হলেও তার আদর্শ মহৎ ছিল না। স্বদেশীয়ানার নাম করে অর্থ সংগ্রহ করে তা নিজের স্বার্থে ব্যয় করাই ছিল তার পরম লক্ষ্য ও একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই সময়ে — সময়ে-অসময়ে নিখিলেশ যখন সন্দীপকে অর্থ সাহায্য করত, স্ত্রী হিসেবে বিমলা তখন আপত্তি জানাত, কিন্তু নিখিলেশ তার কথায় কর্ণপাতও করেনি। একজন সতী স্ত্রীর কর্তব্য স্বামীর ভুল কাজে বাধা দেওয়া, কিন্তু বাববার বিমলার সতীত্ব নিখিলেশের কাছে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। সে স্বামীকে দেবতার মতো পুজোর আসনে বসিয়েছিল, কিন্তু বিদেশী শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক নিখিলেশ এই কুসংস্কার মানতে পারেনি; তাই প্রত্যাখ্যাত বিমলা তার আত্মকথনে বলেছে— *"এমনি আমার কপাল, আমার স্বামী আমাকে সেই পূজার অবকাশ দিলেন না, সে ছিল তার মহত্ব। তীর্থের অর্থ পিশাচ পান্ডারা পূজার জন্য কাড়াকাড়ি করে, কেন না সে পূজনীয় নয়, পৃথিবীতে যারা কাপুরুষ তারাই স্ত্রীর পূজার দাবি করে থাকেন, তাতে পূজারি ও পূজিত দুই-এর-ই অসম্মান হয়।"* নিখিলেশের মহানুভবতা বিমলার অন্তর স্পর্শ করেছে। সে বুঝতে পেরেছে দেবতা ও দয়িতকে একাসনে বসানো মানেই দুজনেই ছোট হওয়া। নিখিলেশ পুরুষ, যে রক্তমাংসে তৈরি বিমলাও নারী হলেও রক্তমাংসেরই মানুষ। এই বোধশক্তি থেকে বুঝতে পারা যায় বিমলার গভীরে যে সুপ্ত নারীসত্তা ছিল, তা নিখিলেশের উদারতার স্পর্শে জাগরিত হতে চলেছে। কিন্তু নিখিলেশ বিমলার শিক্ষা পতিব্রতা রমণীসত্তাকে বুঝতে ভুল করেছিল, তাই সে নিজের দার্শনিক মনোবৃত্তি ও ভাবাদর্শের বোঝা বিমলার উপর চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। অথচ শিক্ষিতা নারী হিসেবে বিমলার বোধশক্তিও কম ছিল না। সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায় বিমলার অন্তরের আকুতি ও বেদনা নিখিলেশকে স্পর্শ করতে পারেনি বলেই সে সর্বশক্তি দিয়ে বিমলাকে গৃহের বাইরে নিখিল বিশ্বে টেনে আনতে বদ্ধপরিকর। ঘরের বিমলা যে তার জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ,তা নিখিলেশের চেতনার গভীরে কাজ করেনি; তাই সে নিজের আদর্শের বোঝা বিমলার উপর চাপিয়ে দিতে চেয়ে অন্যায় করেছে।

বিমলা তার সমস্ত পুঞ্জীভূত বেদনা ও দাম্পত্যপ্রেমের সকল শক্তি দিয়ে নিখিলেশকে তার আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারল না। নিখিলেশ বিমলাকে বাইরের জগতের সকল চরম সত্য উপলব্ধি করাতে চেয়েছিল এবং পারিবারিক জীবনের গন্ডির বাইরে যে মহাজগৎ বিরাজমান সেই জগতে তার উত্তরণ ঘটাতে চেয়েছে। এই নীতি অত্যন্ত মহৎ ও উদার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। নারীকে অন্তঃপুরের বাইরে টেনে এনে বিশ্বের দরবারে পরিচয় ঘটানো যে দুঃসাহসিক প্রয়াস নিখিলেশের মধ্যে ছিল তার মূলে ছিল তার পাশ্চাত্য শিক্ষা ও উদার মনোভাব। চার দেয়ালের গন্ডিবদ্ধ সীমানায় আবদ্ধ গন্ডিতে স্ত্রীকে আবিষ্কার করার বিপক্ষে সে; এতো তার উদার চরিত্রের পরিচয় বহন করে। কিন্তু বিবাহিত জীবনে আধ্যাত্মিকতা বা দর্শন কোনওটাই কাজ করে না। সমাজে বিবাহিত নরনারীর জীবন এর বাইরে কাজ করে, তা সে সামাজিক কারণবশতঃই হোক না কেন, সমস্ত ভারতীয় নরনারী এই একই গন্ডিতে আবদ্ধ, একে অপরের পরিপূরক হয়ে সাংসারিক দায়বদ্ধতা পালন ভারতীয় জীবনাদর্শ। এই আদর্শ থেকে বিচ্যুত হলে সমাজে বিশৃঙ্খলা অবশ্যম্ভাবী। নিখিলেশ আত্মসচেতন ব্যক্তি বলে চিহ্নিত হলেও স্ত্রীর জীবনের আদর্শ সম্বন্ধে অজ্ঞান। নিখিলেশ বিমলার প্রতি সেই আদর্শ পালনে ব্যর্থ পুরুষ। নারনারীর জীবনে দুজনই দুটি বিচ্ছিন্ন সত্তা। নারীমনের চিরাকাঙ্ক্ষিত কামনা-বাসনাকে দাম না দিয়ে নিখিলেশ তার স্ত্রীর সত্তাকে বিড়ম্বিত করেছিল। নিজের শিক্ষা ও ভাবাদর্শ দিয়ে তাকে গড়ে তুলতে গৃহশিক্ষিকা মিস গিলাবিকে রেখেছিল, পিয়ানো বাদন থেকে শুরু করে পাশ্চাত্য আদবকায়দায় চুল বাঁধা, খোঁপা করা, জরির জামা জুতো পরায় তাকে অভ্যস্ত করে তুলেছিল। বিমলাও স্বামীর আসক্ত। তাই স্বামীর এই নির্দেশ সে সহজে মেনে নিয়েছিল।অথচ তার নিজের যে শিক্ষা ছিল তার কোনও দামই নিখিলেশ তাকে দেয়নি। এতে করে এটা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে নিখিলেশ যতই আদর্শবান, নীতিবান মার্জিত রুচির পুরুষ হোক না কেন; মনের গভীরে সংগোপনে সেই পুরুষসত্তা কাজ করেছে, যে পুরুষসত্তা তার নিজের অধিকারবশতঃ স্ত্রীকে বাধ্য করে তার নিজের ভাবনাচিন্তায় পরিচালিত করতে। স্ত্রীর যে একটা নিজস্ব সত্তা আছে সে সত্তাকে অস্বীকার করাই যে পুরুষের ধর্ম, তা সামান্য হলেও নিখিলেশের অবচেতনে মনের গভীরে লুক্কায়িত ছিল, যা স্বাভাবিক বা স্বতস্ফূর্তভাবে প্রকাশ পায়নি। তুলনায় নিখিলেশের নারীমুক্তির উদারতা, নারীবাদী মনোবৃত্তি বেশি মাত্রায় প্রকাশিত হয়েছে। অথচ সে যদি শিক্ষিতা বিমলাকে তার নিজস্ব শিক্ষা বিকাশে সক্ষম করতে পারত তা হলে হয়তো সে সফল হত ও তাদের জীবনে এই বিপর্যয় নেমে আসত না।

অথচ বিমলা তার সর্বশক্তি দিয়ে স্বামীকে সন্তুষ্ট রাখতে চেয়েছে, কিন্তু সব নিস্ফল হয়েছে। জগতে প্রত্যেক সুরুচিসম্পন্ন নারীই চায় তার সারাজীবনের সঙ্গিটিকে সেবা করতে, তার গার্হস্থ্য জীবনকে সুন্দরভাবে পরিচালিত করতে। বিবাহিত নরনারীর জীবনে আদর্শের বাইরে আরও একটি জীবনদর্শন কাজ করে, তার মধ্যে চাওয়া পাওয়ার আকুলতা, এবং সহজাত প্রবৃত্তির জীবনাদর্শ, যাকে অতিক্রম করে সংসারে চলার পথকে কন্টকাকীর্ণ করা যায় না। নিখিলেশ তা বুঝতে চায়নি বা বুঝতে পারেনি। নারীসত্তা যদি শিক্ষিত মননশীল হয় তবে তাকে নিজের ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত করা যায় না, কিন্তু নিখিলেশ তাই করেছে, বিমলার নিজস্ব শিক্ষাকে অবহেলা করেছে।

বিমলাকে ঘর থেকে বাইরে প্রকাশ করার যে আদর্শে নিখিলেশ বিশ্বাসী ছিল, সেখানে

আমরা দেখতে পাই যে নিখিলেশের জীবনতত্ত্ব আর বিমলার জীবনতত্ত্ব এক ছিল না। তবুও স্বামী হিসেবে নিখিলেশ তুলনাহীন। তাই বিমলা তার সকল নির্দেশ প্রথম মাথা পেতে নিয়েছিল। সে দরিদ্র ঘরের মেয়ে—জমিদারি চালচলন সম্বন্ধে সে অজ্ঞান, তাই সহজেই নিখিলেশের চাপানো বোঝাকে মেনে নিয়েছিল। বিমলার উপলব্ধিজ্ঞান নিখিলেশের চাইতে অনেক উন্নত বলেই সে স্বামীর নির্দেশ অমান্য করে বিদ্রোহের অনল জ্বালাতে চায়নি। নিখিলেশের কথায় যখন সে জানল যে গৃহ ছাড়া বাইরের জগৎ কত বিশাল, কত বিচিত্র, আমি শুধু আমিতে সীমাবদ্ধ নয়, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত সেই অসীমলোকের প্রতি বিমলার কোনও আসক্তিই জাগল না। নিখিলেশের দেওয়া বোঝার তাড়নায় অস্থির বিমলা ক্রমশঃ তার থেকে দূরে সরে যেতে লাগল, এবং স্বামীর প্রতি সেই শ্রদ্ধাবোধ থেকে সে বিচ্ছিন্ন হতে থাকল যখন দেখল যে তার স্বপ্নের সেই রোমান্টিক পুরুষ নিখিলেশ নয়। ভুল বোঝাবুঝির সেই ছিদ্র দিয়ে তাদের জীবনে বহুরূপী ভণ্ড চতুর, কামনা লালসাতাড়িত সন্দীপের প্রবেশের পথ সুগম হল, এবং তাদের জীবনকোণে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দিল।

নিখিলেশ চার দেয়ালের ঘেরাটোপে বিমলাকে পেতে চায়নি। সে চেয়েছিল বিমলা অন্তঃপুরের গণ্ডি ছেড়ে বাইরের জগতে নিজেকে প্রকাশিত করুক, সে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণা নারীসত্তাকে বিমলার মধ্যে দেখতে চেয়েছিল, নারীর খণ্ডিতরূপ সে চায়নি। কিন্তু শিক্ষিতা বিমলা মায়ের কাছে সংসারধর্মের যে দীক্ষা পেয়েছিল, তা যে নারীর খণ্ডিত রূপ নয় একটা স্বাভাবিক নারীর স্বরূপ—সেই স্বরূপ নিখিলেশ উপলব্ধি করতে পারেনি। বিবাহিতা নারীর জীবনে প্রধান কাজ আগে ঘরকে চেনা, তারপর বাইরের জগৎ তার কাছে গ্রহণীয়। ঘরকে পর করে বাইরের জগৎ চেনার লক্ষ্য মানেই নারীসত্তাকে বিসর্জিত করা। নারীর মধ্যে যে শক্তি আছে তা দিয়ে শিক্ষিতা নারী হিসেবে বিমলা চেয়েছিল আগে স্বামীর ভালোবাসা তারপর বাইরের মহাবিশ্বে বিচরণ এবং এই মনোভাবসম্পন্না হওয়াতে সে নিখিলেশের প্রত্যেকটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে। এতে এটা মনে করা অস্বাভাবিক নয় যে সে নিখিলেশের মতো আদর্শ ও নীতিতে বিশ্বাসী ছিল। পক্ষান্তরে নিখিলেশই বিমলার মনের কথা বুঝতে পারেনি। এই যে গণ্ডিবদ্ধ অন্তঃপুর ঘেরাটোপ থেকে মেয়েদেরকে মুক্ত করে অসীমলোকে বিচরণ করানো, এত নিখিলেশের মধ্যে বিমলা যে উদারতা প্রত্যক্ষ করেছে তাতে তার স্বামীভক্তি আরও প্রবল হয়েছে। কারণ এই উপন্যাসে যে যুগের কথা বলা হয়েছে সে যুগে মেয়েদের কাছে ঘর হতে আঙিনা বিদেশ বলে তারা অন্তঃপুরবাসিনী হয়েই থাকত। সেই সময়ে নিখিলেশ পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর প্রতি এই অবিচারের প্রতিবাদী সত্তারূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। এবং বিমলাও স্বামীর এই ভাবমূর্তিকে সম্মান করেছে এবং তার প্রতি বিমলার ভক্তি আরও বেড়ে গেছে। বিমলার এই সতীত্বের পরিচয় তার আত্মকথনে আমরা পাই—*"মনে আছে ভোরে উঠে অতি সাবধানে যখন স্বামীর পায়ের ধুলো নিতুম তখন আমার মনে হত আমার সীথির সিঁদূরটি যেন শুকতারার মত জ্বল জ্বল করে উঠল।"* এই যে বিমলাকে আমরা এখানে পাই সে যুগপরম্পরায় বিশ্বাসী এক নারী; স্বামীসেবাই তার কাছে প্রধান।

শিক্ষিত স্বল্পভাষি নিখিলেশ স্ত্রীকে শুধু শয্যাসঙ্গিনী হিসেবে পেতে চায়নি, স্ত্রী-পুরুষের জীবনে পরস্পর সমানাধিকারে সে বিশ্বাসী; কিন্তু পরবর্তীকালে তার ভুল ভেঙেছে, সে বুঝতে পেরেছে সত্য ও সুন্দরের মিলনই মানুষের জীবনে অপরূপ, অথচ সে প্রথম সেই সত্যকেই

অস্বীকার করেছিল। তার জীবনাদর্শের সত্য স্বরূপটি বিমলাকে বোঝাতে গিয়ে বলেছিল — *"তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘরগড়া ফাঁকির মধ্যে কেবলমাত্র ঘরকর্ণাটুকু করার জন্য তুমিও হওনি আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাকা হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"*

বিয়ের পর স্বামী-স্ত্রীর স্বাভাবিক সম্পর্ককে টিকিয়ে রাখার নিমিত্ত সত্যমিথ্যার লুকোচুরি খেলায় নিখিলেশ বিশ্বাসী ছিল না। সীমার বাইরে অসীমের মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ককে সত্যের বন্ধনে একসূত্রে গাঁথতে চেয়েছিল সে। কিন্তু বিমলা শিক্ষিতা হলেও সহজবুদ্ধিসম্পন্না নারী, তাই সে মেয়েদের স্বামীভক্তিকে বাধা বোধশক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরেছিল। হিন্দু মেয়েদের স্বামীভক্তি সতীত্ববোধ, সমস্ত জীবনে অখণ্ডরূপে গড়ে উঠে, তার মূলে রয়েছে বংশ এবং সমাজের বিচিত্র সংস্কার ও শাস্ত্রোপদেশ। একটি বাধাবোধে বাঁধা বিশ্বাসের ছাঁচে গড়া ছিল বলেই সে এই বিশ্বাসকেই জীবনের সত্য বলে ধরে নিয়েছিল। এখানেই নিখিলেশের সত্যবোধের সঙ্গে বিমলার সত্যবোধের পার্থক্য।

নিখিলেশ চেয়েছিল সত্য স্বরূপের মধ্যে জীবনকে উপলব্ধি করতে। এবং এই উপলব্ধির বশে সে জীবনের একের পর এক বন্ধন ছিন্ন করেছে, তেমনি সমাজে ও ধর্মে যে মিথ্যাচার বিরাজমান তা দূর করতে সে কৃতসঙ্কল্প। সংস্কারমুক্ত সৃষ্টি ও বিচারবোধ, অপ্রমত্ত অনুসন্ধিৎসা ও সুরুচি শালীনতার এক অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে নিখিলেশের মধ্যে। তার মধ্যে স্ত্রীর প্রতি যে প্রেম তা শান্ত, গভীর ও উদার। তাই সে প্রেম তাকে আত্মবিস্মৃত করতে পারেনি। নিখিলেশ বিমলাকে নিয়ে যে পূর্ণ জীবন লাভ করতে চায়, তা কখনই সার্থক হতে পারে না যদি বিমলা তার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সম্পূর্ণ না হয়, কারণ প্রেম হচ্ছে যুগলের সাধনা, তাই প্রেমের ভিতর দিয়ে জীবনের ধীর বিকাশ ঘটাতে গেলে উভয়েরই চিত্তের মুক্তি, জ্ঞান ও বুদ্ধির মুক্তি, সকল বোধের প্রয়োজন, তা সে মর্মে উপলব্ধি করেছিল, কারণ তার মধ্যে ছিল প্রকৃত জীবনপিপাসা—এই দুর্লভ সত্তা আদি-অন্ত মথিত করে অমৃত আস্বাদ করার গভীর ব্যাকুলতা। পুরুষ ও নারীর ভোগসর্বস্ব তামসিক জীবনের প্রতি ছিল অশ্রদ্ধা। তাই সে বিমলাকে বলেছে— *"স্মৃতিসংহিতার পুঁথির কাগজে কাটা ফুলে আমি ঘর সাজাতে চাইনি, বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে শক্তিতে প্রেমে পূর্ণ বিকশিত বিমলাকে দেখার বড় সাধ ছিল।"* নিখিলেশ বিমলাকে তার নীতিবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারেনি বলে তার আত্মকথনে এই আক্ষেপ করেছে। সে বোঝাতে চেয়েছে যে নারীজীবন শুধু পুরুষের সেবার জন্য নয়, নারীশক্তি মহৎশক্তি, সে শক্তিকে জড়তার পাঁক থেকে মুক্ত করে আনতে গিয়েই কিছুদিনের জন্য নিখিলেশকে নিজের সঙ্গে প্রচণ্ড লড়াই করতে হয়েছে। অর্থাৎ বিমলার নারীশক্তি অসীমের মধ্যে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছিল। নারীকে গৃহাভ্যন্তরে বন্দি না দেখার যে আদর্শ নিখিলেশ হৃদয়ের উদারতা, তাতে করে তাকে সম্পূর্ণ সেকাল থেকে বের করে আমরা এ যুগের শিক্ষিত একজন উদার পুরুষ চরিত্র বলতে পারি।

কিন্তু বিমলার মধ্যে এ জাতীয় পিপাসাই ছিল না। একজন স্বাভাবিক সামাজিক অন্তঃপুরবাসিনী স্ত্রীরূপে স্বামী গৃহের মর্যাদা রক্ষা করাই তার স্বভাবস্বরূপ, আদর্শ দার্শনিকতার অপেক্ষা প্রবৃত্তি ও কল্পনাবিলাসী ভাবুক মনের বিমলা ঘর হতে আঙিনাকে অবলোকন করতে চায়নি, ব্যক্তিকেন্দ্রিক স্বাধীনতা তার কাছে গ্রহণীয় ছিল না, নিজেকে নিখিলেশের অন্তঃপুরেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিল, এবং নিয়ম সংস্কারের বাইরে নিজেকে সে প্রকাশ করতে চায়নি।

চিরাচরিত নারীস্বভাব তার কাছে বিরাজমান ছিল বলেই সে স্বামীসেবার মধ্যেই নারীজীবনের সার্থকতা খুঁজেছিল। তাই আত্মকথনে সে বলেছে— *"বই-এ পড়েছি আমরা খাঁচার পাখি, অন্যের কথা জানিনে, কিন্তু এই খাঁচার মধ্যে আমার এত ধরেছে, সমগ্র বিশ্বেও তা ধরে না।'* পুঁথির থেকে শেখা বুলি সে বলেছে, জীবনটা সংসারের খাঁচার মধ্যে বন্দি করে সে সেখানেই আত্মতুষ্টি লাভ করেছে। কিন্তু গৎবাধা জীবনের বাইরের বিশ্বেও নারীসত্তা বিকাশের প্রয়োজন সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞান, তাই নিখিলেশের আদর্শে সে অনুপ্রাণিত হতে পারেনি। তার শিক্ষা এই পুঁথিকে ত্যাগ করে আর অগ্রসর হতে পারেনি। পাঠ শিক্ষা শুধু তো কয়েকটি বাধাধরা বুলি শিক্ষা করেই সমাপ্ত করা যায় না, সে সম্পর্কে বিমলা সম্পূর্ণ শিক্ষিত হতে পারেনি, শিক্ষা মানুষের চিত্ত জাগরণ ঘটায়, বিমলার সে জাগরণ ঘটেনি, জীবন সম্বন্ধে নিজস্ব বোধ সম্বন্ধে অজ্ঞান। আর সে অজ্ঞানতাই মানুষকে সত্যভ্রষ্ট ও পাপপ্রলুব্ধ করে। যার ফলে পরবর্তীকালে আমরা বিমলাকে তার নিজস্ব প্রতিষ্ঠিত জীবন-সত্য থেকে চ্যুত হয়ে সন্দীপের ভুঁয়ো আদর্শে অনুপ্রাণিত এক আত্মবিস্মৃত নারীরূপে পাই। পরে অবশ্য সে তার ভুল বুঝতে পেরে নিজের জায়গায় ফিরে এসেছে।

তার এই সত্যভ্রষ্ট হওয়ার প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে স্বভাবসুলভ নারীচেতনায় স্বামীর কাছ থেকে যে চিরাচরিত প্রবৃত্তির সুকুমার বৃত্তিগুলি সংসারের মধ্যে থেকে পেতে চেয়েছিল, তার থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা সে সহ্য করতে পারেনি, তাই এই নেমেসিসই তাকে পথভ্রষ্ট হবার রসদ যোগান দিয়েছে। নিখিলেশের স্বভাবসুলভ প্রবৃত্তি হচ্ছে দার্শনিক মনোবৃত্তি এবং তা তাকে প্রলুব্ধ করতে পারেনি। তাই প্রথম যেদিন চণ্ডীমণ্ডপে বক্তৃতা দেওয়াকালীন চিকের আড়াল থেকে সে সন্দীপের অগ্নিময় বীরত্বের ভাষণ শুনল, সেদিন সন্দীপের সুন্দর সুঠাম দেহের মধ্যে অন্তরের এক বীরপুরুষকে যেন সে খুঁজে পেল। মনে হল তার স্বপ্নের সেই পুরুষকে সে এতদিনে পেয়েছে, তাই চিকের আড়াল সরিয়ে সন্দীপকে দর্শন করল। এই ফাঁকে সন্দীপ তার সম্মোহনী শক্তি দিয়ে বিমলাকে প্রচণ্ডভাবে আকর্ষণ করল; এবং বিমলার পূর্বজীবনকে বিস্মৃতির অতলে টেনে নামালো। এর আগে নিখিলেশ যখন অর্থ সাহায্য করত তখন তার স্বভাবসুলভ স্ত্রীসত্তা দিয়ে স্বামীকে বাধা দিত, কিন্তু সেদিন বিমলা সন্দীপকে দেখামাত্র সব ভুলে গিয়ে নিখিলেশকে বলে পরের দিন সন্দীপের রংপুর যাওয়া স্থগিত করে তাকে বৈঠকখানায় খাবার নিমন্ত্রণ জানালো। নিখিলেশ তার উদারতায় বিমলার সেই অনুরোধ রক্ষাও করল। এই সুবাদে সন্দীপ বাইরের মহল থেকে নিখিলেশের অন্দরমহলে প্রবেশাধিকার পেল। নিখিলেশ চেয়েছিল বিমলাকে বাইরের জগৎ সম্পর্কে সচেতন করতে, বর্হিবিশ্বে তার নারীসত্তার বিকাশ ঘটাতে সেখানে বিমলা বাইরের জগতের প্রবেশ ঘটালো তার অন্দরমহলে। নিখিলেশ বাধা দেয়নি, কারণ সে বিমলাকে স্ত্রী হিসেবে ভালোবাসে, তাই সে চেয়েছে সে এতদিনের প্রচেষ্টায় যা পারেনি বিমলা এবার নিজে বাইরের সত্যটাকে উপলব্ধি করুক, যখন সে জগতের সত্য উদ্‌ঘাটন করতে পারবে তখন আপনি আবার স্বস্থানে ফিরে আসবে। এখানেও কাজ করেছে নিখিলেশের শিক্ষিত মনের আদর্শ। বিমলার মধ্যে যে সত্য নিহিত আছে সে সম্বন্ধে সে নিশ্চিত, কারণ সে জানে সোনা আগুনে পুড়লে খাঁটি হয়, বং তার জীবনাদর্শ থেকে সে উপলব্ধি করছে তার বিমলাও সেই বাইরের আগুনে দগ্ধ হয়ে াটি হয়ে সত্যের দ্বার উদ্‌ঘাটনে সমর্থ হবে।

এদিকে স্বদেশী আন্দোলনের ছুঁতোয় সন্দীপের আগমন, তার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা বিমলার

মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল, এবং সন্দীপের মধ্যে এক বীরপুরুষ ও সুদর্শনকে সে আবিষ্কার করল। তার কথা বলার ভঙ্গি ক্রমশঃ বিমলাকে পাপের পথে টেনে নামিয়েছে। অজ্ঞানতা বইপুঁথির সেই সহজ শিক্ষাই এর জন্য দায়ী। তাই নিখিলেশের জীবনের সত্য তত্ত্বের সঙ্গে না মিললেও সন্দীপ সহজে তাকে করায়ত্ত করল। সংস্কারের বশবর্তী হয়েও বিমলা সন্দীপের পাতানো জালে ধরা দিল। সন্দীপের অভিসন্ধিও সিদ্ধ হল। বইপুঁথি পড়ে যে জ্ঞান সঞ্চয় হয় না, তার উদাহরণ বিমলা।

মানুষের প্রবল ভাবাবেগই মানুষকে সহজে অধঃপতনের পথে নিয়ে যায়। ভাবাবেগ যেমন প্রেরণাকে উর্দ্ধায়িত করতে পারে — তেমনি নিম্নতর প্রেরণার পশ্চাতে থেকে মানুষকে অতি দ্রুত নিম্নে আকর্ষণ করতে পারে, এটাই চরম সত্য। এই উন্নততর পরিণাম মানুষের জীবনে ক্ষণস্থায়ী। ভক্তি ও ভাবাবেগের মধ্যে অনেক পার্থক্য — একটি স্থায়ী বোধ, অপরটি অস্থায়ী। নিখিলেশের প্রতি বিমলার যে ভক্তি তা স্থায়ী। ভক্তির মধ্যে আছে অহঙ্কার — পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ। ভাবাবেগের মধ্যে অহঙ্কারই প্রবল, অহংবোধ স্ফীত হয়ে জগতের সাফল্য মহত্বকে ধূলিস্মাৎ করে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে জাগরিত করে; আর ভক্তি সুদীর্ঘকালের অনুশীলন সাধনা ও সংযমের ফল, মানবমনের অতি দুর্লভ বৃত্তি। এখানে যেন বৈষ্ণব পদাবলির রাধাকৃষ্ণের কথা আমাদেরকে মনে করিয়ে দেয়; অর্থাৎ দেহাতীত প্রেমের কথা। কিন্তু সমাজে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এ প্রেম অনস্বীকার্য। অতীন্দ্রিয় প্রেম দুটি নরনারীর মধ্যেও চলে না আর স্বামী-স্ত্রী!

সন্দীপের দেশপ্রেমের পশ্চাতে ছিল স্থূলবোধ, ও ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করা। এবং নিজের পাপশক্তি দিয়ে অন্যের কামনাকে জাগ্রত করা। এমনি করে প্রেমহীন দেশপ্রেমিকের ছদ্মবেশে কত নারীকে ভোগ্য বানিয়ে তাদেরকে ছুঁড়ে ফেলে দিতে তার বাঁধেনি। নারীকে এমনি করে অনেকবার সে ভোগ করে পরে উচ্ছিষ্টের পাতের মত তাদেরকে দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে। বিমলাকেও এমনি করে জাল বিস্তার করে তার ভোগ্যা বানানোর চেষ্টায় ছিল সে। তার পাপবোধকে ক্রমশঃ বিমলার মধ্যে সঞ্চারিত করেছে ও তাকে নিজস্ব আত্মকর্তৃত্ব থেকে চ্যুত করেছে। নারীকে এর আগেও সে এমনি করেছে, ভোগের পর উচ্ছিষ্টের পাত্রের মত দূরে ছুঁড়ে ফেলেছে।

বিমলা ছিল সকল পরিচয়ের উর্দ্ধে, তার বড় পরিচয় সে নারী। এই নারীসত্তা সন্দীপের সঙ্গে পরিচয়ের পূর্বে ছিল, স্বমহিমায় বিকশিত, বিধাতার পরম আদরের ধন, সত্তার এই অন্তহীন মহিমা আর সকল তত্ত্বের চাইতে, এবং তা সকল পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে সে অসীমে পরিব্যাপ্ত তা শুধুমাত্র স্থূলবুদ্ধিসম্পন্না এবং সামাজিক মূল্যবোধসম্পন্ন নারীসত্তার উর্দ্ধে বিচরণ করে। বিমলা তার নিজস্ব মূল্যবোধ ও সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারেনি বলেই নিখিলেশ তাকে সকল সীমা, সকল বাধাবন্ধনের উর্দ্ধে মহাজীবনের সঙ্গে পরিচিত করে দিতে চেয়েছিল। অন্তঃপুরের বাইরেও আরেকটি জীবন ও সত্তা আছে যেখানে সেই সত্তা স্বমহিমায় উদ্ভাসিত হতে পারে সেখানে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। তাই সে বিমলাকে বলেছিল— *"তুমি একবার বিশ্বের মাঝখানে এসে সমস্ত আপনি বুঝে নাও। এই ঘর গড়া ফাঁকির কেবলমাত্র ঘরকর্ণাটুকু করে যাওয়ার জন্যে তুমিও হওনি, আমিও হইনি। সত্যের মধ্যে আমাদের পরিচয় যদি পাক হয় তবেই আমাদের ভালোবাসা সার্থক হবে।"* যে যুগে নারীর অন্তঃপুর ছাড়া আর কোথাও অস্তিত্ব ছিল না, সে শুধু ঘরকন্না করেই সন্তুষ্ট থাকত। সেই যুগে নিখিলেশের মনে নারীসত্তার

প্রতি যে উদারতা ও সম্ভ্রমবোধ তা বোধহয় আজকের এই যুগের অনেক শিক্ষিত পুরুষের মধ্যেও নেই। নিখিলেশ তার নিজস্ব আত্মকথনে বলেছে— *"বিমলা ছিল আমার ঘরের মধ্যে, সে ছিল ঘরগড়া বিমল, ছোট জায়গা এবং ছোট কতকগুলো বাঁধা নিয়মে তৈরি। তার কাছ থেকে সামাজিক ভালোবাসা নিয়মিত পাচ্ছিলুম সে কি তার হৃদয়ের গভীর উৎস সামগ্রী, না- সে সামাজিক মিউনিসিপালিটির বাষ্পের চাপে চালিত দৈনিক কলের জলের বাঁধা বরাদ্দের মত।"* এই সামাজিক ভালোবাসা বলতে নিখিলেশ বোঝাতে চাইছে একটা ছকবাঁধা নিয়মের গন্ডিবদ্ধ প্রাণহীন ভালোবাসা, যাতে নেই কোনও উত্তাপ। সামাজিক বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ, সামাজিক নিয়মে স্বামীর প্রতি তার ভালোবাসা, তার সেবা বিলিয়ে দেবে এটা তো অন্যায়, মনে না-চাইলেও তাকে এই বিধি নিয়ম মেনেই চলতে হবে। নিখিলেশ সে ভালোবাসায় বিশ্বাসী ছিল না, বিবাহিত নরনারী দুজনে একে অপরের পরিপূরক এই সম্পর্কের মধ্যে পরিপূর্ণতা তখন আসবে যখন স্ত্রী স্বামীকে দেবতার স্থান না-দিয়ে, মানুষ হিসেবে তাকে ভালোবাসবে, সেই তত্ত্বে বিশ্বাসী নিখিলেশকে বিমলা বুঝতে পারেনি। দয়িতকে কখনও দেবতার আসনে বসানো যায় না, এটা অনেক পরে বিমলা, সন্দীপের কামনার আগুনে পুড়তে পুড়তে বুঝতে পেরেছিল।

বিমলা শুধু প্রবৃত্তিকেই জীবনের প্রধান অঙ্গ হিসেবে ধরে নিয়েছিল,তার বুদ্ধির এই স্থূলতার জন্যই সন্দীপের কামনার আগুনে সে সহজেই ঝাঁপ দিয়েছে। নরনারীর প্রবৃত্তি ও কামনা-বাসনাই সব, এর বাইরের নারীজীবনের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বিমলা অজ্ঞাত ছিল বলেই নিখিলেশের জীবনবোধ ও চেতনাকে অগ্রাহ্য করে সহজেই সন্দীপের সহজ কামনাময় পঙ্কিল জীবনে সে প্রলুব্ধ হয়েছিল। সন্দীপের স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে আত্মবিস্মৃত বিমলা ভুলেই গিয়েছিল যে সে একজন প্রতিষ্ঠিত জমিদার বংশের কূলবধূ, তা এক সম্মানজনক জীবনের অধিকারিণী সে। তার জীবনধারা ও সন্দীপের জীবনধারা এক নয়, সন্দীপের প্রেমহীন স্বদেশপ্রেমের ভন্ডামিতে তার জীবনের উন্নততর দীপগুলি একে একে নির্বাপিত হয়েছে। সন্দীপ সেই সুযোগে তার কামনার পাত্র বিমলার সামনে তুলে ধরেছে, এই সূত্রে তাদের মধ্যে ঘনিষ্টতা ক্রমশঃ বাড়তে থাকল। সন্দীপ তাকে একে একে কামসূত্রের পাঠ শিখাতে শুরু করল। চিরকালীন সম্পর্ক নয় জেনেও পাবকশিখা লোভে লোভী পতঙ্গের মতো সন্দীপের কামনার শিকার হয়েছে সে, বিমলা জানে না কত বড় এক মহৎ, উদার, ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তিত্বকে পদদলিত করে চলেছিল। এক স্থূল কামুক চরিত্রের করাল গ্রাসের অতলে সে ক্রমশঃ তলিয়ে যাচ্ছিল, তার নিজস্ব সত্তার এই পরিবর্তনে সে মনে মনে গর্বও বোধ করছিল। রূপের প্রশংসায় ব্যক্তিত্বহীন নারীসত্তা খুশি হয়, তাই সন্দীপ যখন তার রূপের প্রশংসা করেছে তখন সে নিজেকে ধন্য মনে করেছে। এটাই তার সম্পূর্ণ অজ্ঞান চরিত্র ও নিজস্ব সত্তাহীন চরিত্রের পরিচয়, সন্দীপের প্রশংসাধন্য হয়ে সে তার আত্মকথনে বলেছে— *"এতদিন আমি ছিলুম গ্রামের এক ছোট্ট নদী— তখন ছিল আমার এক ছন্দ, এক ভাষা, কিন্তু একদিন কোনও খবর না-দিয়ে সমুদ্রে বান ডেকে গেল, আমার বুক ফুলে উঠল আমার কূল ছাপিয়ে গেল, সমুদ্রের ডমুরুর তালে তালে আমার স্রোতের কলতান আপনি বেজে উঠতে লাগল, আমি আপনার রক্তের সেই ভেতরকার ধ্বনির ঠিক অর্থটা কিছুই বুঝতে পারলুম না।"* বিমলার মুখনিঃসৃত কথাগুলি থেকে একথা স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে সে নিজেই জানে না সে কোন পথে চলেছে, মোহগ্রস্ততা, তার দেহমন চক্ষুকর্ণ সমস্ত ইন্দ্রিয়কে অবশ করে দিয়েছে সন্দীপ। সমুদ্রে

যখন বান আসে তখন, সেই জলের তাণ্ডব কি প্রলয়ঙ্করর রূপ ধারণ করে সে বিষয়ে বিমলার পূর্ণ জ্ঞান ছিল না বলেই এই ক্ষণস্থায়ী বানের মধ্যে সে নিজেকে ভাসিয়েছিল। আবার মাঝে মাঝে সে নিজের সত্তা সম্বন্ধে সচেতনও হয়েছে। তাই এক জায়গায় সে নিজেই বলেছে— *"প্রকৃতিতে ডাক্তারিতে ব্যথা অসাড় করার ওষুধ আছে। যখন কোনও গভীর সম্বন্ধের নাড়ী কাটা পড়তে থাকে তখন ভিতরে ভিতরে কখন যে সেই ওষুধের জোগান ঘটে তা কেউ জানে না..... অবশেষে একদিন জেগে উঠে দেখা যায় মস্ত একটা বিচ্ছেদ ঘটে গেছে।"* সন্দীপের সঙ্গে ঘনিষ্ট হলেও সে উপলব্ধি করেছে এই মোহগ্রস্ততা থেকে যখন সে জেগে উঠবে তখন হয়তো নিখিলেশের সঙ্গে তার সব সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এতে বোঝা যায় নিখিলেশের দেওয়া পাঠ সে আস্তে আস্তে উপলব্ধি করতে পারছিল। আবার আরেক জায়গায় বলেছে— *"আমরা নদীর মত, কূলের মধ্য দিয়ে যখন বয়ে যাই তখন আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা লালন করি, যখন কূল ছাপিয়ে বইতে থাকি আমাদের সমস্ত দিয়ে আমরা বিনাশ করি।"* এতেও বোঝা যায় বিমলা ক্রমশঃ বুঝতে পারছে, যে সে তার নিজস্ব কূল ছেড়ে অকূলের পানে চলেছে, যার সীমানা নেই, এবং এখানে সে তার পূর্বজীবনের সব ভালমন্দকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে, অথচ সে এমন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে যেখান থেকে তার ফেরা অসম্ভব। নিখিলেশকে সে কূল হিসেবে কল্পনা করেছে, সন্দীপের কামনার লালসা যে তাকে অকূলে টানছে তাও সে উপলব্ধি করতে পারছিল। ভেতরের অনুভূতি জাগ্রত হলেও বাইরের অনুভূতির কুটুরিগুলির দ্বার মোহের জালে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একদিকে সন্দীপের লালসার শিকার অপরদিকে নিখিলেশের ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ তাকে ভেতরে ভেতরে কুরে কুরে খাচ্ছিল। কিন্তু সন্দীপ যখন দেশোদ্ধারের কাজে তাকে মক্ষীরানি বানালো তখন সে নিজেকে শক্তিরূপিনী নারী বলে ভাবতে শুরু করে সন্দীপের জাল থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারছিল না, কারণ সে সন্দীপের কাছে দুর্বল হতে চায় না। বিমলা স্বভাব প্রকৃতিতে গভীর অভাব ছিল বলেই সন্দীপ সহজেই তার কামাগ্নির আগুনে বিমলাকে প্রজ্জ্বলিত করতে পেরেছিল। এবং সন্দীপ তাকে শিখিয়েছিল প্রবৃত্তিই নরনারীর স্বভাবধর্ম, এছাড়া জগৎসংসার অচল। ক্রমশঃ তাদের ঘনিষ্টতা বাড়তে লাগল। বিমলার প্রসাধন-কলার মধ্যে সন্দীপও কামনার রঙিন বাসনা ইঙ্গিত বুঝতে পারে, সে বিমলার সঙ্গে আরও ঘনিষ্টতর হয়েছে, তার ভোগতত্ত্ববাদ, বস্তুতান্ত্রিক জীবনদর্শনের নানা পাঠ সে বিমলাকে দিয়েছে। দেশোদ্ধারের আয়োজনের মধ্যে আধুনিক কাব্যসাহিত্য পরিবেশিত করে কামশাস্ত্র পাঠ ও আলোচনার সঙ্গি করেছে সে বিমলাকে। ভোগপ্রবৃত্তি যে মানব প্রকৃতির স্বভাবধর্ম ও নীতিসংযম যে তার উপর একটি কৃত্রিম, দুর্বল আরোপ এই তত্ত্ব বিমলার কাছে সহজ করে তোলার জন্য সে যুক্তি আবেগ দৃঢ় প্রত্যয় জীবনসত্যের সমর্থনে সমস্ত অস্ত্র নির্বিচারে প্রয়োগ করেছে। পরাধীনতা থেকে মুক্তি আর নীতিবন্ধন থেকে মুক্তির সংগ্রাম যে পরস্পর পূরক স্তরমাত্র তা সে প্রমাণ করতে ব্যস্ত। মদ যে খাদ্যের মতোই জীবন পুষ্টির আবশ্যিক উপাদান তা বিমলাকে বোঝানোর জন্য সকল শক্তি প্রয়োগ করেছে। অর্থাৎ বিমলার দেহ অধিকার করার আগে তার আত্মাকে কবলিত করার ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত ছিল। সন্দীপ তার স্বভাব অসংযম সত্ত্বেও, প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতির মূল্য বোঝে, তাই সাপ যেমন ব্যাঙকে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরে আস্তে আস্তে গলাধঃকরণ করে, সন্দীপ ও বিমলাকে হঠকারিতার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে বিমলার দেহভোগের লালসায় এগিয়ে আসছিল।

অন্যদিকে নারীকে নিজের স্ত্রীরূপে দেখার যে সমাজসংস্কার ও মানসআবেগ সার্বভৌম

মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে তার বাইরেও তাকে অতিক্রম করে তার একটি নিজস্ব প্রবৃত্তি আছে, এই প্রবৃত্তির নিত্যসম্বন্ধের উপরই দাম্পত্য টিকে থাকে। দাম্পত্য সম্পর্ক যতই শক্ত বাঁধনে বাধা হোক না কেন এতে প্রকৃতির ভগবদ্‌দত্ত অধিকার নেই। সুতরাং যতই বেদনাদায়ক হোক না কেন বিমলাকে স্ত্রীরূপে না দেখে নিজ স্বভাবেই তাকে দেখতে হবে ও চিনতে হবে, এটাই নিখিলেশের দ্বিতীয় কিস্তির আত্মকথায় প্রকাশিত হয়েছে। নিখিলেশ স্থির বুঝতে পেরেছে যে সন্দীপের সঙ্গেই বিমলার যথার্থ প্রকৃতিসাম্য বর্তমান। তার এই যুক্তি খুব স্পষ্ট, তবুও মনে হয় এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার আগে সে কেন বুঝতে পারল না। যার অতীত দৃষ্টি প্রখর সেখানে ভবিষ্যৎ এত প্রমাদগ্রস্ত কেন একথা মনে জাগা অসম্ভব নয়। বিচারবুদ্ধির সঙ্গে বাস্তবদৃষ্টির এই অসঙ্গতি নিখিলেশের ব্যক্তিসত্তাকেই সংশয় বিড়ম্বিত করে তোলে। সে দার্শনিক আদর্শবাদের প্রতীক কিন্তু রক্তমাংসের মানুষের সঙ্গে তার মিল নেই, লৌকিক পরিবেশের সঙ্গে সে বেমানান, জীবনাবেগের সঙ্গে শিথিল সম্পৃক্ত এক ভাববিগ্রহ মাত্র। তাই সে সহজেই বিমলা ও সন্দীপের এই নিবিড় সম্পর্ককে মেনে নিয়েছিল। কোনও স্বামীই স্ত্রীর এই আচরণে চুপচাপ থাকতে পারে না, নিখিলেশ পেরেছিল। কারণ সে জানে বিমলা তাকে প্রত্যাখ্যান করলেও তার ভালোবাসার শক্তিই বিমলাকে বাধ্য করবে তাকে কাছে আবার ফিরে আসতে, সেই আশাতেই নিখিলেশ নীরবে সন্দীপের বিমলার সঙ্গে এই অবৈধ আচরণ সহ্য করে নিয়েছিল।

সন্দীপের স্বদেশীয়ানার সূত্র ধরে অমূল্য বসে বিমলার জীবনবোধের অসাড় তাৎপর্যকে হঠাৎ যেন ভুলিয়ে দিল, তার কচি কিশোর মুখের দিকে তাকিয়ে বিমলার হৃদয়ে মাতৃত্বের বিশালতা ধরা দিল, অমূল্যের মধ্যে সে সন্তানের রূপ দেখতে পেয়ে তার চেনা অসাড়, জগৎকে সে ভুলে গেল, বাৎসল্য রসে ভরে উঠল তার মনোপ্রাণ। সন্দীপের দেওয়া অসার মন্ত্রের বাণী ভুলে সে আবার যখন স্বামীর কাছে ফিরতে চেয়েছে দীর্ঘ ন'বছর পর তখন নিখিলেশ বিমলা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে তাকে ছুটি দিতে চেয়েছে, বিমলা নিখিলেশের এই ছুটি কথাটি শুনে মনে মনে বলেছিল— *"ছুটি কি একটা জিনিস? ছুটি যে ফাঁকা। মাছের মত আমি যে চিরদিন আদরের জলে সাঁতার দিয়েছি, হঠাৎ আকাশে তুলে যখন বল্‌লে ছুটি তখন দেখি এখানে আমি চলতেও পারিনে, বাঁচতেও পারিনে।"* এর পরে সে তার ঘরে যখন সে প্রবেশ করে তখন দেখে যে তার চিরপরিচিত, একান্ত নিজস্ব ঘর, আসবাব সমস্তই যেন তাকে ছুটি দিয়েছে, তার আপন জগৎ থেকে নির্বাসিত করেছে তাকে।

অমূল্য যেন বিমলার জীবনে জীবনকাঠি হয়ে এসেছিল, সে আসাতে বিমলা সন্দীপের সব রকমের দুরভিসন্ধি বুঝতে পারল, সন্দীপ এতকাল তাকে যে মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে দেবীরূপে বরণ করেছিল, সে যে ছলনা ছাড়া আর কিছুই নয় তা বিমলা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারল, তার আফশোস হতে থাকল এতকাল যে মরিচিকার পিছনে ছুটে চলেছিল সে, সেখান থেকে ফেরার সব রাস্তা তো সে নিজেই বন্ধ করেছে। সর্বব্যাপী মহামূল্যবান হৃদয়বৃত্তিকে সে অপমান করে নির্বাসিত করেছে। তাই সে সন্দীপের কাছ থেকে দূরে সরে যাবার পরিকল্পনায় যখন ব্যস্ত তখনই অমূল্যের আবির্ভাবে প্রণয় স্বপ্নবিভোর সন্দীপের মধ্যে এক দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জেগে উঠল। প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সমস্ত বাধাকে তুচ্ছ করে চূর্ণ করে, আপসের প্রশ্রয় না-দিয়ে তার অমোঘ বিজয় রথকে সাফল্যের চরমসীমা পর্যন্ত চালিয়ে নিয়ে যেতে সে দৃঢ়সঙ্কল্প। যুদ্ধে নামলে রসদের প্রয়োজন, সুতরাং অর্থের প্রয়োজন, এবং এই অর্থের দাবিতে বিমলার

সঙ্গে সন্দীপের সম্পর্ক নূতন জটিলতাসূত্রে গ্রথিত হল। এই স্থূল লোলুপতা উৎকটভাবে প্রকাশিত হয়ে—পরিণামে সন্দীপের দেবীপ্রতিমার অন্তরালে বিমলার মৃন্ময় মূর্তির স্তরটি দেখা দিয়েছে। প্রেমিক বীর সত্তার সঙ্গে লোভের যে একটা স্বভাব বৈপরিত্য আছে তা ক্রমে ক্রমে অতিমাত্রায় প্রকট হয়ে সন্দীপ চরিত্রের অধোগতি ঘটিয়েছে ও বিমলার অন্তর্দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়ে তার মোহভঙ্গ ত্বরান্বিত করেছে।

বিমলার কাছে টাকার দাবির মধ্য দিয়ে সন্দীপের মনস্তত্ত্বের বিচিত্র ও বহুমুখী প্রকাশ ঘটেছে। বিমলার কাছে টাকা চেয়েই সে বিমলাকে আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়েছে। সন্দীপের টাকার প্রয়োজন তার প্রকৃতিগত ভোগবিলাসের জন্য ও তার রাজকীয় স্বভাবের মর্যাদানুরূপ জীবনচর্চার তাগিদে। যেমন কবি মধুসূদন অমিতব্যয়িতার দাবি জানিয়েছেন শুধু তার মহাকাব্যোচিত ঐশ্বর্যপ্রকাশের দাবির জন্য নয়, তার আত্মস্বভাবের গূঢ়তর কারণে — তেমনি সন্দীপও তার আত্মস্বভাব ও নেতৃত্ব ভূমিকার যুগ্ম প্রেরণায় তার জীবনে ভোগের উপকরণ সঞ্চয় করতে চায়। লঙ্কার মণি-মাণিক্য দীপ্তি যেমন শেষ পর্যন্ত কবির অন্তর্নিহিত মানস ঐশ্বর্যের বহিঃবিচ্ছুরণ, তেমনি সন্দীপের জীবন ভোগের ছটা নৈর্ব্যক্তিক ও ব্যক্তিগত উভয়বিধ আলোকরশ্মির সমবায়জাত। নিখিলেশের প্রতি ঈর্ষারও একটি তীর্যক রেখা এই বর্ণালী সঙ্গমে যোগ দিয়েছে। যার স্বভাব দরিদ্র হওয়া উচিত ছিল, ঐশ্বর্য তার কাছে একেবারে অর্থহীন। সুতরাং প্রাকৃতিক নিয়মে অপ্রয়োজনীয় অর্থ সন্দীপের জীবনে ন্যায়তঃ উপভোগ্য। কমলাকান্তের বিড়ালের যুক্তি এই নরখাদক ব্যাঘ্রের মুখে খুব কৌতুকজনক মনে হয়।

বিমলা তো তার মান-সম্ভ্রম সব সন্দীপকে বিলিয়ে দিয়েছে, বীরপ্রেমিকের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু সন্দীপের স্বরূপ জানার পরও সে যখন বিমলার কাছে পঞ্চাশ হাজার টাকা চেয়েছে তখনও মোহজাল থেকে বিমলা নিজেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করতে পারেনি, তাই আবার তার মধ্যে প্রবৃত্তি প্রলুব্ধ নারীসত্তা জাগরিত হল। অমূল্যর জন্য তার হৃদয়ে যে মায়ের আসন পাতা হয়েছিল মুহূর্তের জন্য সেখানে যেন সে তালা ঝুলিয়ে দিল। তখন কিন্তু সে সন্দীপকে অপদেবতারূপে ভাবতে শুরু করেছে কিন্তু মোহ কাটাতে পারছে না। তাই নিজের ঘরেই সে সন্দীপের জন্য চুরি করতে বাধ্য হল, তহবিলের অর্থে হাত দিল, কিন্তু মনে মনে একটা অপরাধবোধ কাজ করছিল — তাই তার আত্মকথনে দেখি —*"সেই রাত্রে যখন নিজের ঘরে চোর হয়ে ঢুকতে হল, তখন থেকে এঘর আর আমার আপন রইল না। এঘরে আমার কত বড় অধিকার! চুরি করে সব খোয়ালুম।"* এই কথাগুলি থেকে বোঝা যায় যে পতনের অতল গভীর থেকে তার মন আবার উত্তোলিত হতে চলেছে, তার নিজের ভুল সে নিজেই বুঝতে পারছে। কিন্তু মানুষের যখন পতন ঘটে তখন অন্তর যা-ই বলুক বাইরের সর্বশক্তি দিয়ে সে তার দুর্বলতাকে ঢাকতে চায়। এই সর্বশক্তির পরিচয় পাওয়া যায় তারই নিজস্ব উক্তিতে— *"দেশ আমার দেশ, আমার সোনার দেশ, সব সোনা সেই দেশের সোনা, এ আর কারো নয়।"*

এই ঘরের তহবিল থেকে চুরি করার পর তার অন্তর কিন্তু অপরাধবোধের থেকে মুক্তি পায়নি। এবং পরবর্তী আত্মকথনে আমরা তারই প্রকাশ দেখি— *"আমি ছাদের উপর শুয়ে শুয়ে ভাবছিলুম দেশের নাম করে ওই তারাগুলি যদি একটি একটি মোহরের মত আমাকে চুরি করতে হত, অন্ধকারের বুকের মধ্যে সঞ্চিত ঐ তারাগুলি, তারপর দিন থেকে চিরকালের জন্যে রাত্রি একেবারে বিধবা, নিশীথের আকাশ একেবারে অন্ধ, তা হলে সে চুরি*

যে সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি হত। আজ আমি এই যে চুরি করে আনলুম এও তো টাকা চুরি নয় এযে আকাশের চিরকালের আলো চুরিরই মত; এ চুরি সমস্ত জগতের কাছ থেকে চুরি, বিশ্বাস চুরি, ধর্ম চুরি।" ঘরকে লুট করাই মানে দেশকে লুট করা; দেশ যে ঘরের চাইতে আলাদা নয় বোধ বিমলার মধ্যে জাগ্রত হয়েছে, সে বুঝতে পেরেছে যে এই চুরি তাকে ঘর থেকে বাইরে নিয়ে এসেছে, ঘর তার কাছে আর ঘর নয়, দেশও তার কাছে পর। ঘরকে যে আপন করতে পারে না, লুট করে সে দেশকে নিজের করবে কি করে সেখানেও সে লুটই করবে। তাই সে ভেবেছে এর চাইতে ভিক্ষা করে যদি সে দেশের সেবা করত তাহলে হয়তো দেশমাতৃকা তার পূজা গ্রহণ করতেন, পাপের বোঝা দেবতা বহন করেন না।

এতকাল পর বিমলা বুঝতে পেরেছে ঘরের ধন চুরি করে দেশের সেবা করা যায় না, এ চুরিতে সে নিখিলেশের তথা সমগ্র দেশের বিশ্বাস ভঙ্গ করেছে। তার স্বধর্ম থেকে সে আজ বিচ্যুত হয়েছে। এই আত্মগ্লানি থেকে বোঝা যায় বিমলা সন্দীপের ভড়ংবাজি ও আমলাতান্ত্রিকতা আর সহ্য করতে পারছে না। ঘরের মধ্যে ও বাইরের জগতের সামগ্রিক বোঝাপড়ায় স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যে অটুট বন্ধনে বাধা তা আজ সে বুঝতে পারছে। এবার সন্দীপের আসল রূপ তার কাছে প্রকট হয়েছে। সন্দীপের মতো চরিত্রহীন লম্পট ভাঙতে পারে, পড়তে পারে না। সন্দীপের কাছে সে যে নদীর জলে ভেসে আসা মেঠো ফুল, যার কোনও মূল্যই নেই, সেই মূল্যবোধ তার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে। একদিন নিখিলেশ বিমলাকে যা বোঝাতে চেয়েছিল, সে আজ সন্দীপের কামনার আগুনে পুড়ে তা-ই বুঝতে পারছে। তাই অমূল্য যখন জোর করে সন্দীপের কাছ থেকে গয়নার বাক্স নিয়ে এসে বিমলাকে ফিরিয়ে দিল, সে সময়ে সন্দীপ বিমলার ঘরে যখন পুনঃপ্রবেশ করল ও বিমলাকে আবার প্রলুব্ধ করতে চাইল, তখন বিমলা দৃপ্ত কণ্ঠে সন্দীপকে প্রত্যাখ্যান করেছে। অমূল্যর হাতে বাক্স সম্বন্ধে জানতে চাইলে বিমলা তার কিছুই প্রকাশ করল না। অমূল্যের উপর দৃঢ়বিশ্বাসে বিশ্বাসী সন্দীপ বলেছে—*'তুমি ভাবছ অমূল্য আমাকে বলবে না?"* বিমলা বলেছিল *"না বলবে না।"* সন্দীপ রাগ সামলাতে পারেনি, তাই সে বিমলাকে বলেছে *"তুমি কি আমার উপর প্রভুত্ব করবে? পারবে না। ওই অমূল্য ওকে যদি আমার পায়ের তলায় মাড়িয়ে দিই তাহলে সেই ওর সুখের মরণ হয়, ওকে তোমার পদানত করবে—আমি থাকতে সে হবে না।"* বিমলা এবার বুঝতে পারল এতদিন পর, সন্দীপ তার কাছে কত দুর্বল, এবং সে যে সন্দীপের জাল থেকে মুক্ত হয়ে উপরের কোঠায় চলে এসেছে। সে বুঝতে পেরেছে সন্দীপের সেই বীরের মূর্তি ধ্বংস হয়ে গেছে, তাই তার মুখ দিয়ে কলহের ইতর কর্কশ আওয়াজ উঠছে। বিমলা এবার ধাতস্থ হয়েছে, বুঝতে পারছে নিখিলেশ তাকে যে রানির আসন দিয়েছিল, স্থূলবুদ্ধি ও ভাবাবেগের হাতুড়ির আঘাতে সে তা চুরমার করে দিয়েছিল। এই বোধশক্তি জাগাতে অমূল্যের দান অপরিসীম, সে বালক হলেও সন্দীপের দুরভিসন্ধি ধরতে পেরেছে এবং তার মূলে ছিল বিমলার প্রতি তার শ্রদ্ধা। যে মুহূর্তে সন্দীপ বুঝতে পারল অমূল্য বিমলার বশ মেনে নিয়েছে, সেই মুহূর্তে তার চাপা রাগ সামলাতে না পেরে গর্জে উঠেছে, কারণ বিমলার কাছে হার মানতে সে রাজি নয়; সে হার মানতে জানে না, তাই এই পরাজয় সে মানতে পারল না, তথাপি বিমলার কাছে এই প্রথম ধাক্কা খেল।

বিমলা সন্দীপকে এভাবে ফিরিয়ে দিতে পেরে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিল বলেই সে নিজেই বলেছে—*"এতদিন পরে আমি উপরের কোঠায় এসে দাঁড়িয়েছি। আমার এ জায়গাটুকু*

যেন না-হারায়, যেন না-নামি। আমার দুর্গতির মধ্যেও যেন আমার মান একটু থাকে।" এই কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে জীবনবোধ তার মধ্যে জাগরিত হয়েছে, তার স্বামীটি যে কোথায় ছিল সেই সম্বন্ধে সে এবার পূর্ণ জ্ঞান লাভ করেছে, এবং তার এই নিজস্ব স্থান থেকে সে যেন আর চ্যুত হয় না, সহস্র বাধা ও প্রলোভন যেন আর তাকে উপরের মহল থেকে নীচে টেনে না-নামায়। এতদিনে বিমলার বাস্তুবুদ্ধি জেগেছে, সন্দীপের মিথ্যাচার তাকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাও সে উপলব্ধি করেছে। এবং সবই সে উপলব্ধি করতে পেরেছে অমূল্য আসাতে। অমূল্য বিমলাকে সন্দীপ সম্বন্ধে সব বলেছে এবং সেই গয়নার বাক্স ফেরৎ দিতে গিয়ে সন্দীপের মুখোস সে আরও খুলে দিয়েছে এই বলে— *"গিনি এনে দিচ্ছি বলে আমাকে ভুলিয়ে রেখে ওর শোবার ঘর থেকে আমার তোরঙ্গ ভেঙে গয়নার বাক্স নিয়ে তোমার কাছে এসেছে। এ বাক্স তোমার কাছে আমাকে নিয়ে আসতে দিল না, বলে কিনা এ গয়না ওরই দান, আমাকে যে কতখানি বঞ্চিত করেছে সে আমি কাকে বলব! এ আমি কখনো মাপ করতে পারব না, দিদি; ওর মন্ত্র একেবারে ছুটে গেছে, তুমিই ছুটিয়ে দিয়েছ।"* একথা শোনার পর থেকে বিমলার মনে সন্দীপের জন্য আর কোনও স্থানই রইল না—তাই সে অমূল্যকে বলেছে— *"ভাই আমার, আমার জীবন সার্থক হয়েছে। কিন্তু অমূল্য এখনও অনেক কিছু বাকি আছে, শুধু মায়া কাটালে হবে না, যে কালি মেখেছি তা ধুয়ে ফেলতে হবে।"* সন্দীপের কামনা যে বিমলাকে কালিমালিপ্ত করেছে, সে বিষয়ে তার আর কোনও সন্দেহ নেই। এই জাল থেকে মুক্ত সেই বিমলা তার স্বীকারোক্তিতেই নিজের পাপস্খলন করেছে, এবং বাইরের বিমল ঘরে ফিরেছে। এতকাল এক তঞ্চকের তঞ্চকতায় মিথ্যে দেশপ্রেমে উদ্বোধিত হয়ে যে স্বমহিমায় তাব নারীসত্তাকে প্রকাশ করতে চেয়েছিল, সেই প্রহেলিকা থেকে আজ সে মুক্ত, জীবনের আসল খাঁটি স্বরূপটি সে বুঝতে পেরেছে। তার জীবনে সমস্ত কিছু থাকা সত্ত্বেও সে নিজেকে নিঃস্ব ও একা করে দিয়েছিল। এটা যে তার মহাপাপ। এই পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে নিঃস্ব বিমলা ঘরে ফিরল এবং রাতে ঘুমন্ত নিখিলেশের পায়ে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করল, তার পাপের ভার লাঘব করার জন্য, কিন্তু অভিমান ক্ষুব্ধ নিখিলেশ আস্তে করে পা দিয়ে তার মাথাটিকে ঠেলে দিল, যা হারিয়ে গেছে তাকে সে আর আগলে রাখতে চায় না।

এবার বিমলা উপলব্ধি করল যা হৃদয়ে ছিল তার সমস্ত কিছুই এখনও সে হৃদয়েই আছে। শুধু ক্ষণিকের জন্য সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছিল। যেন বিশ্বব্যাপী একটা বিচ্ছেদের করুণ সুর তার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, পদ্মপাতায় এক বিন্দু জলের মতো সে বেঁচে আছে। অর্থাৎ তার আসন যে টলোমলো করছে, তা সে উপলব্ধি করতে পারছে। ও তার ভেতরে কান্না গুমরে উঠছে। তাই সে মনে মনে বলতে লাগল— *"হে আমার প্রভু, যা কিছু তুমি আমাকে দিয়েছ, আমার জীবনের ধন বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছিলে সে সমস্তকেই আমি আমার জীবনের বোঝা করে তুলেছি। আজ তা বহন করতে পারছি নে, ত্যাগ করতেও পারছি নে। আর একবার তুমি আমার ভোরবেলাকার বাঁশিটি বাজাও সব সমস্যা সহজ হয়ে যাক। তোমার সেই বাঁশিটি ছাড়া ভাঙাকে কেউ জুড়তে পারে না। অপবিত্রকে কেউ শুভ্র করতে পারে না। এই বাঁশির সুরে আমার সংসারকে তুমি নূতন করে সৃষ্টি কর।"* বিমলার আর্তি থেকে বুঝতে পারা যায় যে, পাপবোধ তার মধ্যে থেকে সরে গিয়ে তাকে আবার স্বর্গীয় জগতে প্রতি আসক্ত করেছে, যে বাসরটিকে সে ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছিল, সে বাসরকে আবার নতু করে গড়তে চায়, বিমলা ফিরে আসতে চায় তার যাত্রাপথের নিশ্চিত আস্তানায়। জড়ত

পাঁক ও পাপের জগত থেকে সে ফিরে আসতে চায়, তার মানে আবার সেই ঘরগড়া বিমলের রূপ সে ফিরে পেতে চায়। যেখানে ফাঁকি নেই আছে জীবনের চরম এবং পরম সত্য। সে এতদিন পর আজ বুঝতে পেরেছে জীবনের চিরস্থায়ী সম্পর্ককে ভেঙে সে এক অস্থায়ী প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করেছিল, তাই সে আঘাতে আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে জীবনে পরম সত্যকে উপলব্ধি করতে চলেছে। সন্দীপের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে সে যেন এক কৃষ্ণবিবরে বাস করছিল, সেই বিবর থেকে মুক্তি লাভ করতে চাওয়া মানে, বিমলা তার নিজস্ব জীবনের পাঠকৃতিকে ফিরে পেয়েছে। এতকাল ধরে লালাসার আগুনে জ্বলে পুড়ে দুঃখের মধ্য দিয়ে অনেকটা পথ অতিক্রম করে এবার জীবনে খাঁটি সত্যকে উপলব্ধি করছে, ঘরের বিমলা যে বাইরেটাকে আঁকড়ে ছিল, সেই বাইরেটা কত অসার সে বুঝতে পেরেছে। ঘরের ভেতর থেকে বাইরের জগৎকে চেনা এক, আর লালসাতাড়িত হয়ে ঘরকে তুচ্ছ করে বাইরে বেরিয়ে পড়া কলঙ্কের নামান্তর মাত্র।

বিমলার ঘরে ফেরার আকুলতা নিখিলেশ যখন বুঝতে পারল, তখন সে নিঃসন্দেহ হল যে তার বিমলা মনেপ্রাণে তারই আছে, শুধু ক্ষণিকের তরে সে তার চোখের আড়াল হয়েছিল, এই বিভ্রম রক্তমাংসের মানুষের মধ্যে ঘটে থাকে, আজ বিমলা সেই বিভ্রমের হাঁড়িকাঠ থেকে মুক্ত, তার নিজস্ব ও একান্ত আপন বিমলাকে তাই মনেপ্রাণে সে আবার গ্রহণ করতে প্রস্তুত। বিমলা তাই এবার স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে রাহুমুক্ত হল। যে দেবতাকে সে হারাতে বসেছিল তাকেই সে আজ আবার আপন করে ফিরে পাচ্ছে অনেক দুঃখযন্ত্রণার কালোরাতের অবসানে। তার মধ্যে নতুন করে শক্তি সঞ্চারিত হল, এতকাল নিখিলেশের দেবতার মতো ক্ষমাসুন্দর মানুষটিকে সে দূরে রেখেছিল, আজ আবার সেই দেবতাসুলভ মানুষটির কাছে সে নিজেকে উৎসর্গ করল, তার আত্মকথনে এ বিষয়ে সে বলেছে— *"মনে করে আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, আজ ন বছর আগে যে নহবত বেজেছিল সে আর ইহ জন্মে কোন দিন বাজবে না। এ ঘরে আমাকে বরণ করে এনেছিল যে; ওতো এই জগতে কোন দেবতার পায়ে মাথা কুটে মরলে সেই বউ চন্দনচেলি পরে, সেই বরণের পিঁড়িতে এসে দাঁড়াতে পারে? কতদিন লাগবে আর কত যুগ, কত যুগান্তর; সেই ন'বছর আগেকার দিনটিতে আরেকবার ফিরে যেতে? দেবতা নূতন সৃষ্টি করতে পারেন, ভাঙা সৃষ্টিকে ফিরে গড়তে পারেন, এমন সাধ্য কি তার আছে?"* নদীর যে স্রোত একটি প্রবাহ, জীবন থেকে ক্ষয়ে যাওয়া সেই প্রবাহকে হাজারো চেষ্টাতে ফেরানো বিধাতারও সাধ্যাতীত। হারানো অতীতকে ফিরে পেতে চাওয়ার আকুতির মধ্য দিয়েই বিমলা তার পাপের জীবন থেকে মুক্ত হয়েছে। এক পথভ্রষ্টা নারীর আকুল কান্না, চিরন্তন সত্য হয়ে বিমলাকে সত্য পথে চলার আলো দেখিয়েছে। সে বুঝতে পারছে যতই সে নিজেকে পবিত্র ভেবে নিখিলেশের কাছে ঘনিষ্ট হচ্ছে, নিখিলেশ তাকে আবার গ্রহণ করলেও তাদের মধ্যে যে বিচ্ছেদের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়েছিল তার দাগ তো কোনওদিনই ঘুচবে না সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত বিমলা, বুঝতে পেরেছে যে জীবনস্রোতে ভেসে যাওয়া জীবন, যৌবন, ধনমান আর কোনও দিনও সে ফিরে পাবে না। তবু বাকি জীবন দিয়ে নিখিলেশের গৃহের নির্বাপিত আলো সে জ্বালাবে। সে যে নিখিলেশের ছিল, মাঝখানের এই কালিমাখা দিনের সমাপ্তিকে সে আবার নিখিলেশের গৃহকোণে নিজেকে ধন্য করবে। এবারে আর অন্ধকারের হাতছানিতে সে ভুলবে না। ক্ষণকালে বিভ্রম ঈর্ষাকাতরতা, স্বরূপের হাতছানি তাকে দিকভ্রান্ত করেছিল, পথহারা পথিকের পথভোলাপানা এবার সাঙ্গ, ঘরের

বিমলা ঘরে ঠাঁই পেল।

নিখিলেশের আত্মকথনের মধ্য দিয়ে যে নিখিলেশকে আমরা পেয়েছি সেই নিখিলেশ একজন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত যুবক জমিদার। তার জীবনের সত্য ও আদর্শনিষ্ঠা তার আত্মকথনের প্রথম পর্যায়ে আমরা পাই। শিক্ষায় পাশ্চাত্যতা ছিল বলেই সে নারীদের অন্তঃপুরচারিকা হিসেবে ভাবতে পারেনি, এটাই ছিল তার চরিত্রের প্রধান ঐশ্বর্য। কারণ তখনও ভারতবর্ষে বা বাংলাদেশে নারীরা অন্তঃপুর থেকে আঙিনাকে বিদেশ বলে ভাবতে শিখেছিল সে যুগে নিখিলেশ তার নববিবাহিত বধূটিকে ঘরের বাইরে জগতে আপন ঠাঁই খুঁজে নিতে সমর্থ হওয়ার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। এ তার চরিত্রের একটা মহৎ ও উদারতা আমরা লক্ষ করি। বিমলার জন্যে শুধু অন্তরের দ্বার নয় ঘরের দ্বারও সে খুলে দিয়েছিল। এতে মনে হয় সে যুগের সমাজের সমালোচনা তাকে স্পর্শ করেনি, বা সমাজ তাকে কুক্ষিগত করতে পারেনি সে তার আপন শিক্ষাদীক্ষার বলে সমাজের বাধানিষেধকে তুচ্ছ করেছিল। তাই সে সমাজের আর পাঁচটা পুরুষের মত বিমলাকে গৃহকোণে বন্দি করে ভোগপণ্য বানাতে চায়নি। এখানে এক নারীবাদী এবং নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী পুরুষকে আমরা পাই। বিমলাকে স্ত্রী হিসেবে ঘরে আনার পর নিখিলেশ তাকে অন্তঃপুরে বন্দি না-করে তার নিজস্ব জীবনাদর্শ দিয়ে বিমলাকে আপনার মনের মতো করে তৈরি করতে চেয়েছিল। জীবনের তত্ত্ব ও আদর্শ যে শুধু ঘরকন্নায় নয়, এবং নারীসত্তা যে সমগ্র নিখিল জগৎব্যাপী পরিব্যাপ্ত, সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের মাঝখানে এনে দাঁড় করিয়ে সে বিমলাকে স্ত্রীরূপে পেতে চেয়েছিল, এবং তার জন্য গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা পিয়ানো বাজনা শেখানো, আধুনিক পোষাক দিয়ে তাকে সাজিয়ে তুলে বর্হিবিশ্বে বিমলাকে পরিচয় করিয়ে দেবার শত প্রচেষ্টা সে করেছিল। স্বামী-স্ত্রীর চিরকালীন সম্পর্ক একটা বাঁধা গন্ডিতে আবদ্ধ, সেই ভোগসর্বস্ব, তামসিক দ্বৈত জীবনের প্রতি নিখিলেশের অবজ্ঞার অন্ত ছিল না। নারীর কাছে পুরুষের চাওয়া — কোথাও সন্তান, কোথাও গার্হস্থ্য জীবনের সবরকম সুখ উপভোগ, দেহজ কামনা বাসনা চরিতার্থ করাই প্রধান। শাস্ত্রে বলেছে 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' এই নীতি নির্ভর সমাজে বাস করেও নিখিলেশ নিজেকে উর্দ্ধায়িত করেছিল, সে ছিল তার জীবনাদর্শ, জীবনের সত্য নয়। অথচ জীবন তো সত্যের উপরই প্রতিষ্ঠিত, আদর্শবাদী পুরুষ সংস্কারমুক্ত হতে পারে, কিন্তু জীবনের সত্যকে অস্বীকার করা মানে জীবন দর্শন নয়, বোকামি অথবা চারিত্রিক দুর্বলতা মাত্র, আর নিখিলেশ স্ত্রী হিসেবে বিমলাকে বেশি ভালোবাসলেও তার আদর্শনিষ্ঠা তাকে সত্যভ্রষ্ট করেছিল বলে সুদীর্ঘকাল দাম্পত্য জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে জীবন অতিবাহিত করতে হয়েছে। সামাজিক সত্যকে স্থূলধর্ম হিসেবে ভেবেছে এবং বিমলাকে বলেছে যে সমগ্র বিশ্বের মাঝখানে সে বিমলাকে পেতে চায়, সেখানেই সে প্রকৃত স্বামীধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়েছে, আর বিচ্যুতই সম্ভবতঃ বিমলার পদস্খলন হওয়ার কারণ। জীবনে পাঠকৃতি এবং অভিব্যক্তি সকলের সমান নয়, কাজেই নিখিলেশের জীবনের পাঠকৃতি তার বিমলার জীবনের পাঠকৃতিতে বৈপরিত্য বিরাজমান। বিমলা রাজবাড়িতে এসেছিল নিখিলেশের বধূরূপে, এবং স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যের সব সংস্কার বুকে আগলেই যে এই সংসারে এসেছিল, কিন্তু তার নারীসত্তার যে চাহিদা সে চাহিদা থেকে সে বঞ্চিত হয়েছে। নারীকে নিজ স্ত্রীরূপে দেখার যে সমাজসংস্কার ও মানস আবেগ, সার্বভৌমত্ব মানুষের দ্বিতীয় স্বভাবে পরিণত হয়েছে তার বাইরে তাকে অতিক্রম করেছে নিজস্ব প্রবৃত্তি। এই প্রবৃত্তির স্বীকৃতির উপরই দাম্পত্য জীবন প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু নিখিলেশ

সেই প্রবৃত্তিকে তুচ্ছ করে বিমলাকে অসীমে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। রক্তমাংসের মানুষের জীবনে আদর্শনিষ্ঠ জীবনের গূঢ়তত্ত্ব যতই স্থান পাক না কেন, স্বামী-স্ত্রীর দাম্পত্য জীবনে সেই তত্ত্ব অপেক্ষা প্রবত্তির প্রাধান্যই বেশি। তাই বিচাববুদ্ধির সঙ্গে বাস্তববুদ্ধির এই যে অসঙ্গতি তা নিখিলেশের ব্যক্তিসত্তাকে সংশয় বিড়ম্বিত করে। সে দার্শনিক আদর্শবাদের প্রতীক হয়তো ঠিক কিন্তু রক্তমাংসের মানুষ নয়। লৌকিক পরিবেশের সঙ্গে বেমানান, জীবনাবেগের সঙ্গে শিথিল সম্পর্কযুক্ত এক ভাববিগ্রহমাত্র। তার এই লৌকিক শিথিলতাই সন্দীপকে সাহস জুগিয়েছে বিমলাকে তার কামনা বাসনার সঙ্গী হিসেবে পেতে, অর্থাৎ নিখিলেশের এই নির্বুদ্ধিতাই হয়তো বিমলার নৈতিক পতনেব কারণ। প্রবৃত্তি প্রলোভিত বিমলা বুঝতে পেরেছিল যে স্বামী সকল সংস্কারের উর্দ্ধে বিরাজিত এক বিবেকবান পুরুষ এবং তিনি বিমলাকেও এই স্থূলপ্রবৃত্তি থেকে উর্দ্ধায়িত জীবনে স্বমহিমায় তার নারীসত্তাকে জাগরিত করতে চান। এই বিষয়ে স্বামীর প্রতি তার পরম শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু তবুও মানবী হিসেবে সে প্রবৃত্তি হয়ে সন্দীপের প্রেমের লেলিহান শিখায় আত্মাহুতি দিয়েছিল পাবকশিখা লোভে পতঙ্গ যেমন আগুনে ঝাঁপ দেয় তেমনি। ভবিষ্যৎ পরিণাম চিন্তা করার অবকাশ সে পায়নি, কারণ সন্দীপের মধ্যে সেই কল্পিত পুরুষটিকে সে আবিষ্কার করেছিল বলে। নিখিলেশ যখন দেখল বিমলার উপর তার কোন দাবিই আর খাটছে না, সে ক্রমশঃ তাকে উপেক্ষা করে সন্দীপের সঙ্গে ঘনিষ্টতর হতে থাকল, তখন সে উপলব্ধি করেছিল যে নিজের ইচ্ছের বোঝা জোর করে কারো ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, জীবনবোধের সঙ্গে যখন তত্ত্বের সামঞ্জস্য ঘটবে তখন গ্রহীতা আপনি সেটা গ্রহণ করবে। এই ভেবে সে ক্রমশ বিমলার প্রতি উদাসীন হতে থাকল, তার কোনও কাজেই সে বাধা দেয়নি, সন্দীপ তার বাল্যবন্ধু কাজেই তার চরিত্র নিখিলেশের অজানা নয়, তবুও সে বিমলাকে বাধা দেয়নি। সন্দীপ যখন তার আগ্রাসী নীতিবোধের নাগপাশে বিমলাকে পতনের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল, তখনও নিখিলেশ নির্বিকার। এখানে সে তার জীবনাদর্শকে কাজে লাগিয়েছে, —সে বুঝতে পেরেছে, ও জানে যে একদিন নিজের লাগানো আগুনে পুড়ে তার বিমলা অন্তর্দৃষ্টি ফিরে পেয়ে খাঁটি হয়ে তার কাছে ধরা দেবে, তার বিমলার প্রতি ভালোবাসাই তাকে এ বিশ্বাসে বিশ্বাসী করেছে। কারণ সোনা আগুনে না-পোড়ালে খাঁটি হয় না, সে সোনা যে বিমল নিখিলেশের হৃদয়েশ্বরী। নিখিলেশ যে প্রবৃত্তির বাধনে বাধা পুরুষ নয় এবং তার জীবনবোধ যে বিমলার থেকে আলাদা সেটা বুঝতে পেরেছে এবং আদর্শতাড়িত হয়ে বিমলার স্ত্রীসত্তাকে অবহেলা করে এই বলে সে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছে— *"আমার মধ্যে গুণের অভাব আছে, পুরুষের মধ্যে মেয়েরা যেটা সবচেয়ে বেশী খোঁজে আমার স্বভাবে হয়ত সে জোর নেই।"* আবার নিজেই যুক্তি দিয়ে তার মতকে সে খণ্ডনও করেছে— *"জোর কি শুধু আস্ফালন, শুধু খামখেয়াল, জোর কি এই রকম অসংকোচের পায়ের তলায়' ... ঝগড়া করে সে যোগ্যতা লাভ করা যায় না, অযোগ্য, অযোগ্য, অযোগ্য! না হয় তাই হল ভালোবাসার মূল্য তো তাই, সে যে অযোগ্যকেও যোগ্য করে তোলে। যোগ্যের জন্য পৃথিবীতে অনেক পুরস্কার আছে, অযোগ্যের জন্যে বিধাতা কেবল এই ভালোবাসাটুকুই রেখেছিলেন।"* প্রবৃত্তিতে সে অযোগ্য হলেও তার ভালোবাসার বাধনই শক্ত ও কঠিন, প্রবৃত্তি তো ক্ষণিকের আনন্দ দেয়, ভালোবাসার আনন্দ চিরন্তন। ভালোবাসার সত্যস্বরূপ সে বিমলাকে দেখতে চেয়েছিল, স্ত্রীর উপর সে স্বামীর অহঙ্কার ফলায়নি। তাই একজায়গায় সে বলেছে— *"জবরদস্তকে আমি বরাবর দুর্বলতা বলেই জানি। যে দুর্বল সে সুবিচার করতে সাহস করে না, ন্যায়পরায়ণতার দায়িত্ব এড়িয়ে*

অন্যায়ের দ্বারা তাড়াতাড়ি ফল পেতে চায়। ধৈর্যের পরে বিমলের ধৈর্য নেই। পুরুষের মধ্যে দুর্দান্ত ক্রুদ্ধ এমনকি অন্যায়কারীকে সে দেখতে ভালোবাসে।" বিমলা যে প্রবৃত্তিতাড়িত হয়ে অন্যায়কারী সন্দীপের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে নিখিলেশের মার্জিত স্বভাব, পরিশীলিত রুচি তাকে আকৃষ্ট করেনি, সেটা সে বুঝতে পেরেছে। এও বুঝতে পেরেছে বিমলার ধৈর্যের বাধন নেই। তাই প্রবৃত্তির ফল সে তাড়াতাড়ি পেতে চায়। ফলে সন্দীপের ভণ্ড স্বদেশীয়ানা সহজেই বিমলাকে আকৃষ্ট করেছিল।

নিখিলেশ নিজের সৌন্দর্যধ্যান আশ্রয় করে ভাব ও রস রূপের একটি চিরন্তন বোধ করেছে। যদিও পুরুষের মনে নারী রূপাশ্রয়ী ধ্যান একটা চিরন্তন সত্য, সেই চিরন্তন সত্যোপলব্ধিকে নিখিলেশ জয় করে নিয়ে আপনার জীবনের পাঠকৃতিতে চির বিরাজমান। সে জানে রূপের বঞ্চনায় জীবন শূণ্য হয়ে যায় তাই বিমলার মধ্যে রূপের আড়ালে অরূপের সন্ধানে সে ব্যাপৃত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় রাজা নাটকে রানি সুদর্শনা ভীষণ দর্শন রাজাকে আবিষ্কার করে দূরে চলে গিয়েছিল কিন্তু সেই রাজার কুৎসিত রূপের আড়ালে যে জীবনের চরম সত্য লুকিয়ে আছে এবং চরিত্রটি রূপের বাইরে এক অপরূপ সৌন্দর্যকে আশ্রয় করে আছে তা শেষ মুহূর্তে রানি সুদর্শনা বুঝতে পেরে রাজার কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। বিমলা এখানে নিখিলেশের রূপ আবিষ্কার করার বদলে তার আদর্শকে উপলব্ধি করতে না-পেরে তার ভোগসর্বস্ব নারীসত্তার আড়ালে নিখিলেশের ব্যক্তিত্বকে অস্বীকার করেছিল। রানি সুদর্শনা রাজার মধ্যে রূপ আবিষ্কারে ব্যর্থ আর বিমলা স্বামীর আদর্শ বুঝতে অসমর্থ, এই জায়গায় তাদের তফাৎ। পরবর্তীকালে দুজনের আত্মসমর্পণের রাস্তা একইভাবে প্রকাশ পেয়েছে বলেই এখানে, এই তুলনা অসঙ্গত নয়।

নিখিলেশ আপন জীবনবোধে বিমলার চিত্ত জাগরিত করে তাকে অসীমে টেনে আনতে চেয়েছিল, সেই বিমলা নিজেই তার অজ্ঞানতাবশতঃ সন্দীপের আকর্ষণে বাইরের অঙ্গনে পা বাড়িয়েছিল। এখানে নিখিলেশের চরিত্রের প্রধান ত্রুটি একটাই—বিবাহিত স্ত্রীকে যদিও সে উদার মানসিকতায় সংস্কারের বাধনে বাধতে চায়নি, স্বামীর আদর্শকে অস্বীকার করে তত্ত্বাদর্শ নিজস্ব জীবনবোধে বিমলাকে উর্দ্ধায়িত করতে গিয়ে সে তার নারীসত্তার চিরকালীন প্রবৃত্তিকে আঘাত হেনেছে, সে বুঝতে পারেনি স্ত্রীর কাছে স্বামী এক পরম সম্পদ, জীবনের সব সম্পর্ক একদিকে আর স্বামী সম্পর্ক একদিকে। পুরুষ ও নারী দুটি আলাদা সত্তা, কিন্তু একে অপরের পরিপূরক, কাজেই বিমলা নিখিলেশকে রক্তমাংসের স্বামীরূপে পেতে চেয়েছিল। কিন্তু সেখানে যখন বিমলা বঞ্চিত হল তখনই সে সন্দীপের হাতছানিতে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু অসহায় নিখিলেশ সেখানে বাধা দিতে পারেনি তাই বলেছিল— *"আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব, ছোট জায়গা থেকে বড় জায়গায় যাবার যে ঝড়ো রাস্তা, ঘরের চতুর্সীমানায় যে ব্যবস্থাটুকুর মধ্যে জীবন বাসা বেধেছিল ঘরের বাইরে এসে সে ব্যবস্থায় কুলোচ্ছে না, অচেনা বাইরের সঙ্গে চেনাজানা সম্পূর্ণ হয়ে যখন একটি বোঝাপড়া পাকা হয়ে যাবে তখন দেখব আমার স্থান কোথায়।"* বিমলাকে ফিরে পাওয়ার যে বাসনা সে মনে মনে পোষণ করে তা নিখিলেশের মার্জিত রুচি ও সুশিক্ষার প্রমাণ করে। তাই সে ভাবে এবং ভাবতে ভাবতে একদিন স্পষ্ট অনুভব কবল বিমলার জীবনে সে আকস্মিক মাত্র, বিমলার প্রকৃতির সঙ্গে যার জীবনের সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। তাই সে নিজেকে দীপ্তিহীন প্রকাশহীন বলেছে, চারিত্রিক দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও তার মার্জিত রুচিকে ক্রমশঃ তার এই অসহায়তায় স্তব্ধ করে দিচ্ছে; তাই

সে বলেছে— *"বিমলা যে প্রাণের বেগে একেবারে ভরা ... কিন্তু আমার মধ্যে যদি কিছু থাকে সে কেবল বোবা গভীরতা, সে তো কলধ্বনির বেগ নয়, আমি কেবল গ্রহণ করতে পারি—নাড়া দিতে পারিনে।"* যেন কোনও একটা বোবা কান্না তার অন্তরের গভীর থেকে উঠে আসছে। তবু সে তার এই কান্না দিয়ে বিমলাকে বন্দি করতে চায় না, এমন কাপুরুষ সে নয়। ঘরের আগুনকে সে নিজেই প্রজ্জ্বলিত করেছে। সন্দীপ জোর করে আদায় করে তার বীরত্ব ফলাতে চেয়েছে, এদিক দিয়ে বিচার করলে সন্দীপের বীরত্বের আড়ালে এক কাপুরুষ লুকিয়ে আছে, সে তুলনায় নিখিলেশের বীরত্ব উর্দ্ধগামী, সে নিজের চাহিদাকে আপন অন্তরে বন্দি করে জীবন কাটাতে রাজি, এটাই একজন সত্যিকারের পুরুষের সহজাত প্রবৃত্তি। প্রবৃত্তিকে দমন না করতে পারা কাপুরুষতার নামান্তর মাত্র।

আরেক জায়গায় নিখিলেশ আক্ষেপ করেছে যে বিমলাকে প্রদক্ষিণ করে জীবনের কত মহৎ দিক সে হারাতে বসেছে, মানুষের জীবন যে কত মহৎ ও মূল্যবান তার কথা, সে ভুলতে বসেছে, তার জীবনের এই চরম সঙ্কট মুহূর্তে মাস্টার মশাই চন্দ্রনাথবাবু তাকে সাহায্য করেছেন জীবনের কন্টকাকীর্ণ পথ ছেড়ে সুন্দর মসৃণ পথ পরিক্রমায়। তাব চিরন্তন মহৎ সত্তাকে জাগ্রত রাখতে সাহায্য করেছেন তিনি। মাস্টারমশাই-ই বিমলা ও সন্দীপ সম্বন্ধে তাকে সজাগ করে দিয়েছেন, এক অতন্দ্র প্রহরীর মতো তিনি নিখিলেশকে পাহারা দিয়েছেন।

নিখিলেশ যদিও জমিদার ছিল, কিন্তু জমিদারি হালচাল, প্রজাপীড়ন ও জমিদারি মেজাজসম্পন্ন ছিল না, শিক্ষিত পরিমার্জিত, এক সাধারণ মানুষের চালচলন তার মধ্যে লক্ষ করা যায়। প্রজাদেরে ফসল উৎপাদনের নিমিত্ত অর্থ সাহায্য কবা, ব্যরসায়ের উন্নতিসাধন করা, দেশীয় তাঁতে গামছা ইত্যাদি তৈরি—তা বিপণন কবা, এবং গ্রামেব দরিদ্র ছেলেদেরে অর্থ সাহায্য করা, এইগুলিই ছিল তার দেশসেবার অঙ্গ, আলাদা করে স্বদেশী শিক্ষার তার প্রয়োজন ছিল না। দেশের মানুষের সেবা মানেই দেশের সেবা, দেশ জনতা ছাড়া আলাদা বস্তু নয়। এই নিয়ে সন্দীপ, বিমলার সঙ্গে তার প্রায়ই অনেক তর্কবিতর্ক হত। এছাড়াও তার মধ্যে আমরা সমাজবাদীতার পরিচয় লক্ষ করি। যেমন দেশের অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্য নিমিত্ত সে একটি সমবায় ব্যাঙ্ক খুলেছিল। তার মধ্যে সাম্যবাদী মানসিকতা ছিল। কাজেই সন্দীপ এর সঙ্গে তুলনা করলে সে সন্দীপের চাইতে অনেক বেশি দেশপ্রেমী ছিল, এবং দেশপ্রেম দেখবার জন্য ধ্বজা ধারণ করে এখানে ওখানে বক্তৃতা দিয়ে যে মানুষের দেশপ্রেম আনা যায় না, দাঙ্গা লাগানো যায়, কিন্তু থামানো যায় না, সে দেশপ্রেমে নিখিলেশ বিশ্বাস করত না। তাই সে সন্দীপের 'বন্দেমাতারং' পূজা মন্ত্রটিকে গ্রহণ করেনি, সে বলেছে যে এতে দেশমাতার পূজা হয় না, মাকে পূজার আসনে বসালে তিনি সন্তানের চাইতে দূরে চলে যান। পূজা তার বক্তব্য ছিল যে পূজার বেদীমূলে দেশমাতাকে উর্দ্ধায়িত না-করে, তাকে সাধারণ মানুষের ধবাছোঁয়ার মধ্যে রাখলে তবেই তো দেশের মঙ্গল, মানুষের মধ্যে স্বদেশবোধ জাগ্রত করে তাকে কর্মযোগী করে তুললে তবেই তো দেশসেবা সার্থক, বিদ্রোহ করলে মানুষের চিত্ত জাগরিত হয় না, আগে স্বদেশভূমিকে চিনলে তবেই দেশের সেবা করা সম্ভব। দেশের অর্থে আত্মতুষ্টি করা মানেই দেশকে বঞ্চিত করা। এই উদ্দেশ্যে তার আত্মকথনে সে বলেছে— *"দেশকে আমি সেবা করতে রাজি আছি কিন্তু বন্দনা করবো যাকে তিনি তার থেকে অনেক উপরে। দেশকে যদি বন্দনা করি তবে দেশের সর্বনাশ করা হবে।"* অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়

নিখিলেশ প্রকৃত দেশপ্রেমী ছিল, সমাজের পূজা মানেই দেশের পূজা, চারিদিকে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে দেশের মধ্যে একটা অস্থির অবস্থা সৃষ্টি করার বিষয়ে সে ঘোর বিদ্রোহী ছিল।

সন্দীপকে নিখিলেশ ছোটবেলা থেকেই জানত, তার নৃশংস প্রবৃত্তি নিখিলেশের অজানা ছিল না। যে জ্যান্ত পাঁঠার ঠ্যাং কেটে আনতে পারতো সে তো কসাইর চাইতে আরও বেশি নৃশংস। কাজেই তার পক্ষে সত্যের ভেলকি বানানো যে সম্ভব ও আনন্দ তার কথা আমরা নিখিলেশের আত্মকথনে পাই—*"মধ্য আফ্রিকায় যদি ওর জন্ম হত তাহলে নরবলি দিয়ে নরমাংস ভোজন করাই যে মানুষকে মানুষের অন্তরঙ্গ করার পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধনা এই কথা নূতন যুক্তিতে প্রমাণ ও পুলকিত হয়ে উঠত।"* এতে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে সন্দীপ নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে এবং আত্মতুষ্টির জন্য যে কোনও ধরনের জঘন্যতম পাপ কাজ করতে পারে এটাই সত্য। সন্দীপের এই সকল মারাত্মক চরিত্রদোষকে সমর্থন করতে পারে না, এবং তাকে ক্ষমাও করতে না পেরে নিখিলেশ সন্দীপের মধ্যে প্রায়শই কলহ হত। আজ নিজেকে নিখিলেশ আর অসহায় ভাবে না, তাই আগেকার মতো সন্দীপের দোষত্রুটিকে সে ক্ষমা করতে পারে না; তাই বাব বার তার সঙ্গে নিখিলেশের সংঘাত ঘটেছে। প্রথম থেকে এ সংঘাত ছিল, অতি ভদ্র বিনয়ী নিখিলেশের অন্তরে তা চাপা ছিল, ঢাকঢোল পিটিয়ে বিদ্রোহ করার চাইতে চুপচাপ থেকে শান্তভাবে প্রতিবাদ অনেক সম্মানের।

ক্রমশঃ যখন স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ উত্তাল রূপ ধারণ করল তখন ঢাকা থেকে মৌলবাদীরা নিখিলেশের জমিদারিতে শান্ত মুসলমান প্রজাদেরে ক্ষেপিয়ে তুলতে আরম্ভ করল, তার জমিদারিতে মুসলমান প্রজারাও গোহত্য করত না, সেখানেও গোহত্যা শুরু হল, স্বদেশী আন্দোলনে সন্দীপের মতো নেতারা স্বদেশীয়ানার সঙ্গে সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে লাগল, মৌলবীদের প্ররোচনায় দু'একটা গোহত্যাও শুরু হল, সাম্প্রদায়িক এই ভেদ যে একটা কৃত্রিম ভেদ নিখিলেশ সেটা অনুভব করেছিল এবং এই জেদে বাধা দিতে গেলে সেটা অকৃত্রিম হবে এবং সেটাই বিরোধী পক্ষের চাল তা বুঝতে নিখিলেশের অসুবিধা হয়নি। তাই যেদিন প্রজাদের মধ্যে গোহত্যার বিরুদ্ধে দলাদলির খবর নিখিলেশ শুনল সেদিন সে তার প্রধান হিন্দু প্রজাকে ডেকে পাঠিয়ে বলল—*"নিজের ধর্ম আমরা রাখতে পারি, পরের ধর্মের উপর আমাদের হাত নেই। আমি বোষ্টম বলে শাক্ত তো রক্তপাত করতে ছাড়ে না। উপায় কি? মুসলমানকেও নিজের ধর্ম মতে চলতে দিতে হবে।"* এই উক্তির থেকে বোঝা যায় বিংশ শতকের গোড়ায় জন্ম নিলেও নিখিলেশের মধ্যে ধর্মের গোঁড়ামি একেবারেই ছিল না। তার এই ধর্ম নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিই প্রমাণ করে যে সে একজন সংস্কৃতিবান আধুনিক মনস্ক পুরুষ, এই ধর্মনিরপেক্ষতার পরিচয় তার আরও কয়েকটি কথা থেকে বোঝা যায়, — সবাই যখন তাকে গোহত্যা নিবারণে প্রজাদেরে শাসন করতে বলেছিল তখন তার উত্তরে সে বলেছিল—*"এ দেশে মহিষও দুধ দেয়, কিন্তু তার কাটামুণ্ড মাথায় নিয়ে সর্বাঙ্গে রক্তমেখে যখন উঠোনময় নৃত্য করে বেড়াই তখন ধর্মের দোহাই দিয়ে মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া করলে ধর্ম মনে মনে হাসেন ..... কেবল গরুই যদি অবধ্য হয় আর মোষ যদি অবধ্য না হয়, তবে ওটা ধর্ম নয়, ওটা অন্ধসংস্কার।"* হিন্দুধর্মের এই গোঁড়ামির প্রতি কটাক্ষপাত করে সে দেখিয়ে দিয়েছে, যে দুটি জন্তুরই কাজ এক তবে কেন একটি বধযোগ্য হবে। দুর্গোৎসবে অনেক সময় সোল্লাসে মানুষ মহিষ বলি দেয়, কাজেই গোহত্যাও ধর্মীয় আচার, তাই গোহত্যার প্রতিবাদ করে ধর্মের বড়াই করা যে একেবারেই অমূলক, যুক্তিহীন, এটাই এই বক্তব্যের

মধ্য দিয়ে সুস্পষ্ট হয়েছে। উনিশ শতকের নিখিলেশের মধ্যে যে আধুনিক যুগের এক পুরুষের প্রতিফলন ঘটেছে, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই দিক দিয়ে বিচার করলে নিখিলেশকে আমরা চিরকালীন এক উদারচেতা পুরুষ ভাবতে পারি।

স্বদেশী আন্দোলনের বন্যা যখন খুব প্রবল বেগে দেশের উপর দিয়ে বয়ে চলেছিল, তখন নিখিলেশের জমিদারির অনেক যুবক যারা তারই দান করা অর্থে কোলকাতা পড়তে গিয়েছিল, তারা গ্রামে ফিরে এসে সন্দীপের স্বদেশী পাণ্ডাগিরিতে বিশ্বাস করে, গ্রামের ব্যবসায়ীদের বিদেশি কাপড় চোপড় তুলে দিতে এবং পুড়িয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন নিখিলেশ আপত্তি জানিয়ে বলেছিল ব্যবসা প্রত্যেকের নিজস্ব ও স্বাধীন, তার জমিদারিতে বাস করলেও প্রত্যেকেরই স্বাধিকার আছে, কাজেই অন্যের স্বাধীনতায় বাধা দান করে দেশের স্বাধীনতা আনা যাবে না, ওরা নিজে কিনে এনে তবে তারা তা বাজারে বিক্রি করছে, কাজেই সেগুলো পুড়িয়ে দিলে যে আর্থিক ক্ষতি তাদের হবে তাতে করে তারা কি এই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা স্বদেশীয়ানায় বিশ্বাসী হবে? বরঞ্চ এর ফল আরও ভয়ঙ্কর হবে। কাজেই প্রজাদের এই ক্ষতি সে কোনওদিনই মানবে না। এতে নিখিলেশ যে স্বদেশকে ভালোবাসে তার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে, কারণ দেশের জিনিস নষ্ট করে, মানুষের জিনিস নষ্ট করে তাদেরকে স্বদেশ সম্বন্ধে সচেতন করে তোলা যায় না। নিখিলেশ যে স্বদেশীয়ানার বিরুদ্ধ ছিল একথা বলা যায় না, তার মধ্যে যে স্বদেশীয়ানা ছিল, তা ছিল উদার মনোভাব সম্পন্ন ও মুক্ত স্বদেশীয়ানা। সন্দীপের আন্দোলনে সে কোনওভাবে একমত হতে পারেনি। অন্য জমিদারদের মতো লুকিয়ে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করা বা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ মদতপুষ্ট জমিদার সে ছিল না, সম্পূর্ণ নিজস্ব আদর্শে সে বিশ্বাসী ছিল। তার মধ্যে স্বদেশকে মুক্ত করার সম্পূর্ণ ভাবনা কাজ করত তবে তা ভাঙচুর করে বা মানুষকে ক্ষেপিয়ে নয়। স্বদেশী আন্দোলনের ক্ষেত্রে সন্দীপের আইডিয়োলজির সঙ্গে নিখিলেশের আইডিয়োলজির সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী ছিল, এই দিয়ে সে সন্দীপের সঙ্গে তর্ক করত আর তার জোগান দিতেন মাস্টারমশাই চন্দ্রনাথবাবু।

নিখিলেশের আত্মকথনের শেষ পর্যায়ে এসে তার জীবনতত্ত্বের উদারতা, সত্য, আদর্শনিষ্ঠ জীবনবোধের বাইরে এক নতুন সত্যের পরিচয় পাই; যার কথা না বললে তার চরিত্র বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিখিলেশ স্ত্রী হিসেবে বিমলাকে খুব বেশি ভালোবাসত। অথচ নিখিলেশ ও বিমলার জীবনের পাঠকৃতিতে বৈপরিত্য থাকার দরুণ অনেক ঝড়ঝঞ্ঝার মধ্য দিয়ে তাদের বিবাহিত জীবনের ন'টি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, সন্দীপের মতো একটি দুষ্ট গ্রহ বিমলাকে পথভ্রষ্টা করেছিল, সেই বিমলা সন্দীপের ছলনার জাল থেকে পাপমুক্ত হয়ে নিখিলেশের চিরকালের বিমলা বাইরের অঙ্গন থেকে স্বামীর অন্তরে ও গৃহে ফিরেছে। এখানেই নিখিলেশের ভালোবাসা জয়ী হয়েছে। সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত কোন জিনিসই যে অসফল নয় এটা তারই প্রমাণ। এই কিছুটা কাল নিখিলেশের অন্তরের অতলে যে বিমলা ঝড়ের তাণ্ডব চলছিল, বিমলার ঘরে ফেরাতে তা শান্ত ও শাশ্বত হয়েছে। এবারে সে উপলব্ধি করেছে যে নিজের ইচ্ছের বোঝা অপরের উপর জোর করে চাপানো যায় না। তাই তার আত্মকথনে এই উপলব্ধির কথা সে বলেছে— *"শাস্ত্রে পড়েছিলুম ইচ্ছাটাই বন্ধন, সে নিজেকে বাঁধে অন্যকেও বাঁধে। কিন্তু শুধু কথা ভয়ানক ফাঁকা। সত্যি যেদিন পাখিকে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিতে পারি, সেদিন বুঝতে পারি যে পাখিই আমাকে ছেড়ে দিলে। যাকে আমি খাঁচায় বাধি সে আমাকে আমার ইচ্ছেতে বাঁধে, সেই ইচ্ছের বাঁধন যে শিকলের বাধনের চাইতেও শক্ত। ...*

পৃথিবীতে এই কথাটি কেউ বুঝতে পারছে না। সবাই ভাবছে সংস্কার আর কোথাও করতে হবে; আর কোথাও নয়, আর কোথাও নয়—কেবল ইচ্ছের মধ্যে।" অর্থাৎ সমাজ সংস্কার করতে হলে ইচ্ছেটাকেই সংস্কারমুক্ত করতে হবে, তবেই সমস্ত কুসংস্কাব ধুলিস্যাৎ হবে। এমনি করে অনেক দুঃখ সয়ে নিখিলেশ যখন বিমলাকে ফিরে পেল, তখন তার মধ্যেকার সে দুর্বল নিখিলেশ আব নেই, তখন সে নির্ভীক দ্বিধাহীন পুরুষ, তাই সে সন্দীপকে কঠিনভাবে গ্রাম ছেড়ে চলে যাবার নির্দেশ দিতে একটুও লজ্জা পেল না, কোন শঙ্কাও হয়নি তার মনে। এতকাল যার জন্যে তার ঘরের ভুবন বাইরের ভুবনে হারিয়ে গিয়েছিল, সে-ই আবার সন্দীপের ভণ্ডামি ও ভুলতা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নারীসত্তাকে বিকশিত করে নিখিলেশের গৃহে ফিরেছে, তাই আজ সে নিশ্চিন্ত। এবার সে স্থির করল তার বিমলাকে নিয়ে সে কোলকাতা যাবে, সে উদ্দেশ্যে সে বিমলাকে বলেছে—*"সুখ দুঃখ কেবল জমিয়ে তুলতে গেলে বোঝা ভারি হয়ে উঠে ... আমি যে এই ঘরের কর্তা, এটা বানানো, সত্য এই যে আমি জীবনপথের পথিক।"* জীবনেব পাত্র থেকে যা পড়ে গেছে তাকে সে আর কুড়োতে চায় না, সামনে যা আসবে জীবনে চলার পথে তাই সে তুলে নেবে পরম আগ্রহে। সহজ সুখে সে বিশ্বাসী নয়। জীবনের গণ্ডিবদ্ধ নিয়ম তার কাছে শৃঙ্খল স্বরূপ। তার জীবনদর্শন থেকে বোঝা যায় যে মানুষ পরিচয়ই আসল, পারস্পরিক সম্পর্কের বাধা জীবন মানুষের কাছে বন্ধন স্বরূপ।

নিখিলেশ বিমলাকে নিয়ে যখন কোলকাতা যাবার আয়োজনে ব্যস্ত তখনই আমরা তার জীবনের আর একটি সংগোপিত জীবনের আভাস পাই। সে যখন দেখে মেজরানিও তার জিনিসপত্র বাধাছাঁদা করছেন তাদের সঙ্গে কোলকাতা যাবার জন্য, নিখিলেশ আশ্চর্য হল। মেজবানি তাকে বললেন—*"ভয় নেই ভাই, ভয় নেই, তোমার সঙ্গে ভাবও করতে যাব না, ছোটরাণীর সঙ্গে ঝগড়াও করব না।"* এই বাক্যটি নিখিলেশের মর্মমূলে আঘাত হেনে; পূর্ণস্মৃতি জাগিয়ে দিল—*"আমার বয়স যখন ছয় তখন ন'বছর বয়সের মেজরাণী, আমাদের এই বাড়িতে এসেছেন। এ বাড়ির ছাদে দুপুর বেলায় উঁচু পাঁচিলের কোণের ছায়ায় বসে ওর সঙ্গে খেলা করেছি, বাগানে আমড়াগাছে চড়ে উপর থেকে কাঁচা আমড়া ফেলেছি, তিনি নীচে বসে সেগুলি কুচিকুচি করে নুন, লঙ্কা, ধনে শাক মিশিয়ে অপথ্য তৈরী করেছেন ... তারপরে বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুখদুঃখের রঙ নিবিড় হয়ে উঠেছে, কত ঝগড়াও হয়েছে, বিষয় ব্যাপার নিয়ে অনেক ঈর্ষা, সন্দেহ এবং বিরোধও এসে পড়েছে, আবার তার মাঝখানে বিমলা এসে পড়ে কখনো কখনো এমন মনে হয়েছে বিচ্ছেদ বুঝি আর জুড়বে না। তারপরে প্রমাণ হয়েছে অন্তরের মিল সেই বাইরের ক্ষতের চেয়ে অনেক প্রবল"*—এর থেকেই নিখিলেশের চরিত্রের অন্য একটা দিকের সন্ধান মেলে। মেজরানির সঙ্গে যে নিখিলেশের অন্তরের একাত্মতা ছিল, এটা উপরোক্ত তার নিজস্ব আত্মকথনেই সে প্রমাণ করে দিয়েছে। বিমলাকে সে ভালোবাসে সত্যি এবং সেই বিমল দূরে সরে গিয়ে তার অন্তরে যে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল, মেজরানি অবিচ্ছেদ্যভাবে থাকলেও সেই ক্ষতের উপর প্রলেপ হয়ে এ বাড়ির সম্বন্ধের শাখা প্রশাখায় সমস্ত ঘর আঙিনা, বাগান ছাদে সর্বত্র নিখিলেশের পেছনে ছায়ার মতো তাকে সেবা করে গেছেন। অর্থাৎ নিখিলেশের মনের গহনে মেজরানির সঙ্গে এক নিবিড় সম্পর্কের বাধন ছিল। সম্পর্কের বাধন নয়। অন্তরের সঙ্গে অন্তরের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক। এ সম্পর্ক গড়তে হয় না আপনি গড়ে উঠে, এবং এই সম্পর্কই সামাজিক সম্পর্ককে ছাপিয়ে যায়। তাই মেজরানি আজও নিখিলেশকে ছাড়তে চান না। নিখিলেশ ও মেজরানির মধ্যে যে

গোপন ভালোবাসার সম্পর্ক প্রচ্ছন্নভাবে ছিল উপরোক্ত উক্তি থেকে সহজেই তা প্রমাণিত হয়। যে মেজরানি সেই ন'বছর বয়স থেকে এ বাড়ি ছেড়ে কাটাননি, তার কথা আমরা নিখিলেশের কাছ থেকে জানতে পারি এইভাবে— *"অথচ সেই আসল কারণটির কথা মুখ ফুটে বলতে চান না, অন্য কত রকমের তুচ্ছ ছুতো তোলেন। এই ভাগ্য কর্তৃক বঞ্চিতা পতিপুত্রহীনা নারী সংসারে কেবল এই একটি মাত্র সম্বন্ধকে নিজের হৃদয়ের সমস্ত সঞ্চিত অমৃত দিয়ে পালন করেছেন, তার বেদনা যে কত গভীর সে আজ তার এই ঘরময় ছোঁড়াছুড়ি বাক্স পুঁটুলির মধ্যে দাঁড়িয়ে স্পষ্ট করে বুঝলুম, এমন আর বুঝিনি।"* এর থেকে প্রমাণ হয় যে নিখিলেশের সারাটি জীবনে একটি অবৈধ প্রেম শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে নিখিলেশকে আঁকড়ে পড়েছিল, নিখিলেশের অজান্তে, অথবা সে বুঝে থাকলেও সামাজিক কারণে তা কখনও প্রকাশ করেনি, মাঝখানে বিমলা এসে পড়াতে সেটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। কারণ একমাত্র বিমলাই বুঝতে পেরেছিল মেজরানির নিখিলেশের প্রতি যে দাবি তা শুধু সম্পর্কের দাবি নয়, নিখিলেশের সঙ্গে মেজরানির একটি আশৈশব দাবি। এবং এই আন্তরিক দাবি বিমলার সামাজিক দাবির চাইতে অনেক বেশি জোরালো। যা শত ঈর্ষার কটাক্ষপাতেও নষ্ট হয় না। দায়বদ্ধ ভালোবাসার অনেক উর্দ্ধে বিরাজ করে সেই ভালোবাসা, যার মধ্যে ক্ষুদ্র তুচ্ছ চাওয়া পাওয়ার কোনও দ্বন্দ্ব নেই; সংঘাতপূর্ণ দৈনন্দিন জীবনে সে অচল এবং অনড়। এর মধ্যে আছে উদারতা, নিখাদ সোনার মতো খাদহীন ভালোবাসা বিমলার ভালোবাসার চাইতে অনেক উর্দ্ধে। বৈধতার বিচারে মেজরানির নিখিলেশের প্রতি যে আসক্তি তা সেটি বৈধ কি অবৈধ বিচারের অপেক্ষা রাখে না। কারণ সেই অন্তহীন নিবিড় ভালোবাসা সম্পর্কের গন্ডি ছেড়ে কখনও প্রকাশ হয়নি। অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো ভেতরে ভেতরে প্রবাহিত হয়েছে। মেজরানির এই ভালোবাসা কোনও মোহের বশবর্তী নয়, এখানে দেনা-পাওনার কোনও হিসেব নিকেশ নেই, রক্তমাংসের এই বালবিধবাটি জীবনের সব কিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে সমাজের বাইরে পা না দিলেও মনে মনে তিনি সমাজের বাইরে পা রেখেছিলেন। শেষ পর্যায়ে এসে নিখিলেশ আবিষ্কার করেছে মেজরানির প্রতি তার অন্তরের গভীরতম স্থান কোথায় এবং তাই সে আবার ফিরে পেতে চায় কিশোরবেলার সেই দিনগুলিকে, ইচ্ছে করলেই তো চলে যাওয়া দিনগুলি আর ফিরে পাওয়া যায় না, এবং মেজরানিও রাজি নয় তা তার উক্তি থেকে বোঝা যায়— *"না ভাই মেয়ে জন্ম নিয়ে আর নয়, যা সয়েছি তা একটি জন্মের উপর দিয়েই যাক; ফের আর কি সয়।"* এ সমাজে মেয়েদের অন্তর্জ্বালা ও দুঃখভোগের যন্ত্রণা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই এই উক্তি যা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, বালবিধবা মেয়েদের দুঃখকষ্ট এতকাল তিনি যেভাবে সয়েছেন, তবু তার দুঃখকে ছাপিয়ে তার ভালোবাসাকে তিনি বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাই এই মেয়েজন্ম আর তিনি চান না।

আজ বিমলাও বাইরের ভন্ড জগৎ থেকে ফিরে এসেছে অক্ষত অবস্থায়, অনেক দুঃখের পথ পরিক্রমা করে। মেজরানিও তার অন্তরের দ্বার মুক্ত করে নিখিলেশ ও সমাজের কাছে মুক্ত হয়েছেন। এই মুক্তি অনন্ত মুক্তি, জীবনবোধের উর্দ্ধজগতে তাদের ভালোবাসাও উর্দ্ধায়িত হয়েছে। প্রকৃত ভালোবাসা কখনও প্রিয়কে গ্রাস করতে চায় না, সমস্ত সুকুমার বৃত্তি দিয়ে তার ভালোবাসার বিশ্বাসকে বাঁচিয়ে রাখে, বিনিময়ে কোনও দাবি থাকে না। মনে হয় যেন প্রতিদিন দেবতার জন্য পুষ্পের থালা সাজানোর মতো সারাটি জীবন ভালোবাসার মানুষটির জন্য অন্তরে অরূপের ডালি সাজিয়ে প্রেমিক আত্মতৃপ্তি লাভ করে, প্রতিটি নরনারীর জীবনের

এই একই কথা। মেজরানি ও নিখিলেশ যেন তাই। এক জায়গায় মেজরানি বলেছেন — মেয়েরা বাঁধতে চায়, বাঁধা পড়তে চায়, কাজেই সেই-বাঁধনকে অস্বীকার করে চলে যাওয়ার ক্ষমতা কোনও পুরুষের নেই। তাই বিমলা, নিখিলেশ, মেজরানি তাদের নিজস্ব স্বীকৃতির মাধ্যমে নিজেদের মানসিক টানাপোড়েন থেকে মুক্ত হয়ে এক নতুন বিশ্বের দরবারে এসে সম্মিলিত হয়েছেন।

বিমলা তার সুদীর্ঘ ন'বছরের রাহুগ্রস্ত জীবন থেকে মুক্ত হয়ে নিখিলেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তার সমস্ত পাপের বোঝা থেকে রেহাই পেতে চেয়েছে, তখন নিখিলেশ বিমলার এই বাইরের থেকে ঘরে প্রত্যাবর্তনকে স্বীকার করেছে, কারণ সে উপলব্ধি করেছে বিমলা ভুল বুঝে সন্দীপের মোহে পা বাড়ালেও সে সম্পূর্ণ নিষ্কলুষ সে বিষয়ে সে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ ছিল। এবং বিমলার এই পূজার বেদীমূলে সে আর বাধা হয়ে দাড়ায়নি এবং বলেছে— *"এ পূজায় বাধা দেবার আমি কে? যে পূজা সত্য— সে পূজার দেবতাও সত্য, সে দেবতা কি আমি যে সঙ্কোচ করব।"* অর্থাৎ এখানে যে পূজার দেবতা মানুষ নয়, প্রেমই হচ্ছে সেই দেবতা আজ অনেকদিন পর নিখিলেশ তা উপলব্ধি করেছে। তাই আজ সকলকে নিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়, সকল ভালোবাসা যেখানে পূজার সমুদ্রে মিশেছে, সেই সাগর সঙ্গমে। এখানেও সেই পরম ঈশ্বর সমগ্র জগতের অধিকারী যিনি সকল জীবাত্মাকে আপন পথে চলতে নির্দেশ দেন, সেই আদর্শ ও তত্ত্ব ও তার জীবনে প্রতিফলিত হয়েছে, প্রেমের পূজা যে মানুষকে পূজা নয় অসীমে তা পরিব্যপ্ত এতে আজ সে বিশ্বাসী হয়েছে, এবং স্বীকার করেছে যে পূজায় সে অবিশ্বাসী ছিল, নাস্তিক ছিল, আজ তাতে তার বিশ্বাস জন্মেছে, তাই তার বিশ্বাসী মন বলেছে— *"সেই আমি আপনাকে নিবেদন করে দিলুম তার পায়ে যিনি আমার সকল অপরাধকে তার গভীর বেদনার মধ্যে দিয়ে গ্রহণ করেছেন।"* সকলের জীবনের পাঠকৃতিতে যে বৈপরিত্য ছিল, আজ তা স্বমহিমায় বিকশিত হয়ে মহাকালের পূণ্য ত্রিবেণী সঙ্গমে মিলিত হয়ে প্রত্যেকটি চরিত্র ধন্য ও সার্থক হয়েছে। বিমলার আবেগময় আত্মগ্লানি নিখিলেশের বঞ্চিত হৃদয়ের চাপাক্রন্দন-বিদ্ধ দার্শনিকতা ও মেজরানির স্বীকারোক্তি আজ একাত্ম হয়ে সার্থক হয়েছে।

নিখিলেশের দার্শনিকতার মর্ম যে অত্যন্ত ক্ষীণ ও ক্ষণভঙ্গুর, আদর্শবাদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য মনোবলের একান্ত অভাব, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে একথা সহজেই বলা যায় যে আসলে সে একজন প্রণয়াতুর, স্মৃতিবিলাসী, দুর্বল মানুষ। তা তার চিন্তায় ও আচরণে নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। দাঙ্গার সঙ্কটে ঝাঁপিয়ে পড়া সত্ত্বেও তাকে প্রত্যয় দৃঢ়তার প্রতি যথাযোগ্য গুরুত্ব আরোপ করেও আমরা সামগ্রিক বিচারে তাকে বীরের তিলকভূষিত করতে পারি না। স্বভাব নির্ভীকতার পরিবর্তে এইসব ক্ষেত্রে নীতি অভিমানই তাকে বিপদ বরণের ক্ষণিক প্রেরণা জুগিয়েছে। বিমলার সঙ্গে স্বদেশ সেবার আদর্শ সম্বন্ধে তার মতান্তর যে শুধু দৃষ্টিভঙ্গির অনৈক্য নয়, মৌলিক স্বভাব বৈপরিত্য ও সংসারের সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রে এর আপস-নিষ্পত্তি সম্ভব হলেও, বৃহত্তর কর্মজগতে তা বিপুলতর বৈষম্য সংঘাতে মর্মান্তিক আঘাত হানবে এই প্রচ্ছন্ন সত্যটিকে নিখিলেশ অনুভব করেছে। সবশুদ্ধ আমরা যখন নিখিলেশের চরিত্রটিকে ভাল করে দেখি তখন বুঝতে পারি যে সে দার্শনিক-বুদ্ধিসম্পন্ন, কিন্তু স্বভাব-দার্শনিক নয়।

কিন্তু মহাকালের নির্দেশ কখনও বৃথা হয় না, তাই মাস্টারমশাই-এর কাছে হরিশ

কুণ্ডুর কাছারি লুট ও দাঙ্গার খবর পেয়ে, সকলের নিষেধ অমান্য করে, ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সেই দাঙ্গাস্থলের উদ্দেশে, এটাও সন্দীপের দলের কাজ বুঝতে পেরেও একজন প্রজাবৎসল, সামাজিক দায়বদ্ধ রক্ষক জমিদার হিসেবে প্রাণ সংশয় জেনেও সে ছুটেছিল, প্রজাদেরে দাঙ্গার হাত থেকে বাঁচাতে, ফিরে এল, মাথায় চোট নিয়ে অজ্ঞান অবস্থায়। এখানেও সন্দীপের শয়তানির হাত থেকে তার রেহাই মেলেনি। নিখিলেশের এই আত্মত্যাগ তাকে মহান করেছে, প্রকৃত বীর যে কখনও অন্যায় অবিচার মানতে পারে না, সেই প্রকৃত বীর যে নিখিলেশ একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। কুচক্রী কাপুরুষ সন্দীপ দাঙ্গা লাগিয়ে সেখান থেকে পালিয়ে বেঁচেছে। সঙ্গে, বেচারা অমূল্য একটি নির্দোষ কিশোর প্রাণ হারিয়েছে।

সন্দীপ নিখিলেশের বাল্যবন্ধু হলেও সে নিখিলেশের সম্পূর্ণ বিপরীত আদর্শে অনুপ্রাণিত, পদে পদে নিখিলেশের আদর্শের সঙ্গে তার অমিল অনুভব করা যায়। গুণগত মানের বিচারে সে একটি ঘৃণিত ও পতিত চরিত্র, যে চরিত্র আমরা সর্বকালে সর্বযুগে দেখতে পাই। সন্দীপের আত্মকথনে তার জীবনদর্শনের চরম নৈরাজ্যনীতির অপূর্ব তীক্ষ্ণ ও মনীষদীপ্তি উদ্ভাসিত হয়েছে। নীতিবাদের আফিং খেয়ে যারা জেগে ঘুমায়, কল্পনার কুহকে যারা প্রত্যক্ষ জীবনসত্যকে অস্বীকার ও সার্থকতাকে বঞ্চনা করে তাদের সঙ্গে সন্দীপের আপসহীন সংগ্রাম, এই উপন্যাসে আমরা তাকে পাই আত্মকেন্দ্রিক জীবনসর্বস্ব এক তামসিক মানুষ হিসেবে। স্বদেশীয়ানার মুখোশের আড়ালে নিজের ভোগের পণ্য জোগাড় করাই ছিল তার স্বদেশী আন্দোলনের নেতা হিসেবে তার জীবনের আদর্শ। ভেতরে দেশ সম্বন্ধে কোনও শ্রদ্ধাবোধ তার মধ্যে ছিল না। দেশমাতৃকার পূজার নাম করে যেখানে সেখানে উপস্থিত হয়ে তার আত্মতুষ্টি সম্পূর্ণ করে সে সেখান থেকে পালাত। সন্দীপের মধ্যে এক অহংবোধ কাজ করত যা একান্ত স্থূল প্রবৃত্তিসুলভ। জীবনের আদর্শ নীতিবোধ তার মধ্যে কোনও কালেই ছিল না বরং চরিত্রের অশালীন লোভ লালসা তার মধ্যে প্রকটাকারে প্রকাশ পেয়েছে। এক কথায় সে একজন ভণ্ড দেশসেবক। এদিক দিয়ে নিখিলেশের চরিত্রের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে সে যে একজন ভণ্ড প্রতারক সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এই কেতাদুরস্ত ভণ্ড শয়তানি কারো চোখে সহজে ধরা পড়ে না। নিখিলেশ তার এই ভণ্ড চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত ছিল, তাই বিমলা যখন সন্দীপের সঙ্গে প্রথম ঘনিষ্ট হয়েছিল তখন নিখিলেশ তাকে সাবধান করে দিয়েছিল, বলেছিল সন্দীপকে দূর থেকে যতই ভাল লাগুক না কেন তার বেশি নিকট হলেই ভবিষ্যৎ বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

কোনও তত্ত্বের ভিত্তিতে কোনও চরিত্রেরই বিচার করা চলে না। প্রত্যেকটি চরিত্রের নিজস্ব জীবনের পাঠকৃতি দিয়ে তাকে চিনতে হয়। নিখিলেশের চরিত্র বৈশিষ্ট্য আর সন্দীপের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। সন্দীপের আত্মকথনের মাধ্যমেই আমরা তা বুঝতে পারি। যেমন সন্দীপের সঙ্গে বিমলার যতই ঘনিষ্টতা বাড়তে থাকল ততই নিখিলেশের সঙ্গে তার দূরত্ব বাড়তে থাকল, তখন নিখিলেশ বলেছিল— *"আমি বিশ্বাস হারাব না, আমি অপেক্ষা করব।"* এখানেই সন্দীপকে আমরা পাই প্রবৃত্তিসম্পন্ন স্থূল মানুষ হিসেবে। সে বলে— *"যেটুকু আমার ভাগে এসে পড়েছে সেটুকুই আমার একথা অক্ষমেরা বলে আর দুর্বলেরা শোনে ... দেশে আপনা আপনি জন্মেছি বলেই দেশ আমার নয়; দেশকে যেদিন লুট করে নিয়ে জোর করে আমার করতে পারব সেদিনই দেশ আমার হবে।"* এতে এই কথাই মনে হয় সে একজন কামনা ও লালসাতাড়িত পুরুষের আপনার আসুরিক প্রবৃত্তি দিয়ে শুধু দেশ নয় তার সকল কাঙ্খিত বস্তুকে কেড়ে নেওয়াই তার স্বভাবধর্ম, তার জীবনে কোন আদর্শ বা নীতি কাজ

করে না। জীবনের সত্য এবং তত্ত্ব তার কাছে দুর্বলতা মাত্র। এই স্থূল ও আদর্শহীন সন্দীপের কথা এই যে— *"যারা কাড়তে জানে না, ধরতে পারে না, একটুকুতে যাদের মুঠো আলগা হয়ে যায়, পৃথিবীতে সেই আধমরা একদল লোক আছে নীতি সেই বেচারাদের সান্ত্বনা দিক।"* এই উক্তি সম্ভবত নিখিলেশের উদ্দেশেই করা; কারণ সে বিমলাকে আকৃষ্ট করার পর নিখিলেশকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবেই ধরে নিয়েছে। সন্দীপ কেড়ে খেতেই অভ্যস্ত, স্বদেশীয়ানা তার মুখোশ, স্থূল ভোগ লালসার প্রবৃত্তিই তার কাছে মুখ্য, স্বদেশী আন্দোলনের অগ্নিগর্ভ ভাষণে আকৃষ্ট করে মানুষকে বিপথে চালিত করা তার স্বভাবধর্ম। সে অসীমের পরিব্যাপ্তিতে নিজেকে বিলিয়ে দিতে প্রত্যাশী নয়। এই নিয়ে নিখিলেশের সঙ্গে অনেকবার তর্ক হয়েছে, নিখিলেশ বলত যে ডিমের খোলা থেকে যখন পাখি বেরিয়ে আসে তখন সে পৃথিবীর আলো বাতাসে মুক্তি পায়, যদিও খোলটা বাস্তবসত্য তবু সেই বাস্তবকে পরিত্যাগ করে সে আনন্দ পায়। কিন্তু সন্দীপের জীবনের পাঠকৃতিতে সেই খোলাটার বাস্তবসত্য প্রকাশ পায় না, কারণ মুক্ত বাতাসে সেই পাখিগুলো যে ঠকে যায় সেটাই তার জীবনে পরম সত্য বলে ধরা পড়ে। গৃহের অভ্যন্তর যেমন মানুষের জীবনে প্রয়োজনীয় তেমনি প্রয়োজন গৃহকে স্বীকার করে তার বাইরে অসীম বিশ্বকে জানার চেনার বাসনা, নিখিলেশের বিশ্বাস তাই, তবুও সে একটা ভুল করেছিল বিমলার উপর তার নিজস্ব বিশ্বাসের বোঝা চাপাতে গিয়ে। মানুষ যখন আপন বিচারবুদ্ধি দিয়ে কিছু স্বীকার করে নেয় তখনই সে বর্হিবিশ্বে অন্তরঙ্গ হতে পারে, জীবনের সত্য ও তত্ত্বকে জানতে পারে। বিমলা নিখিলেশের সেই তত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত হতে পারেনি বলেই সন্দীপের ভড়ংবাজিকে আপনার মুক্তির পথ ভেবে তার কামনার আগুনে ঝাঁপ দিয়ে জীবনে অনেক কষ্ট ভোগ করেছে।

প্রথম যেদিন সন্দীপ নাটমন্দিরে স্বদেশীয়ানার প্রচারে বক্তৃতা দিয়েছিল সেদিন জ্বালাময়ী ভাষণ ও সন্দীপের রূপ ও কথা বলার ভঙ্গি বিমলাকে আকর্ষণ করল, চুম্বক যেমন লোহাকে আকর্ষণ করে তেমনি। এর আগে নিখিলেশের সঙ্গে বিমলা তার ফটো দেখেছে, তবে তাকে যে তখন খুব ভাল লেগেছে সেকথা বিমলা বলতে পারে না, তবে তার মধ্যে নিখাদ সন্দীপকে সে খুঁজে পায়নি তাই সে নিখিলেশকে টাকা দিয়ে সাহায্য করতে বাধা দিত। প্রথম ফটোতে সন্দীপকে চেনাই বিমলার ঠিক চেনা ছিল। নিখিলেশের জীবনাদর্শের সঙ্গে তার স্বভাবজনিত অভাব যেটা সে লক্ষ করেছিল। সেটাই তাকে সন্দীপের প্রতি আসক্ত হতে বাধ্য করল। মানব জীবন সম্পূর্ণতা কখনই পায় না,একটা কিছুর অভাব এ জীবনে থেকে যায়। কিন্তু বিমলা সেই প্রবৃত্তি অভাবটুকু সহ্য করতে পারল না, তাই চিকের আড়াল থেকে সন্দীপের বক্তৃতায় আকৃষ্ট বিমলা বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে চিকের বাইরে মুখ বাড়িয়ে সন্দীপকে দেখতে লাগল এবং পূর্বে ছবিতে দেখা সন্দীপ আর এ সন্দীপ যেন এক নয়, তার মধ্যে বিমলার সেই স্বপ্নে দেখা কল্পিত পুরুষটিকে সে আবিষ্কার করল এবং তার আত্মকথনে বলেছে— *"সমস্ত সভায় একটি লোক ছিল না যার আমার মুখ দেখবার অবকাশ ছিল; কেবল এক সময় দেখলুম কালপুরুষের নক্ষত্রের মত সন্দীপবাবু উজ্জ্বল দুই চোখ আমার মুখের উপর এসে পড়ল। কিন্তু আমার হুঁশ ছিল না। আমি কি তখন রাজবাড়ির বৌ? আমি তখন বাংলাদেশের সমস্ত নারীর একমাত্র প্রতিনিধি, আর তিনি বাংলাদেশের বীর।"* সন্দীপ যে তার জীবনে কালপুরুষের মতো ধরা দিয়েছিল এটা বিমলা বুঝতে পেরেছিল বলেই তার সন্দীপকে ত্যাগ করে স্বগৃহে ফিরে আসা সম্ভব হয়েছে। প্রথমে সন্দীপের বক্তৃতা শুনে সে তাকে

সত্যিকারের একজন দেশপ্রেমিক বলে ভেবে নারীর পক্ষ থেকে সেও স্বদেশীয়ানায় যুক্ত হয়েছিল, ক্রমশঃ সন্দীপের আসল অভিসন্ধি ও ভণ্ডামি তার কাছে প্রকাশ পেতে শুরু করেছিল। যে সন্দীপের মধ্যে খাদ দেখা দিয়েছিল, সেই খাদ যখন নিখাদ হয়ে তার কাছে ধরা পড়ল তখনই সন্দীপের অভিসন্ধি সার্থক হল, এবং অতি সুচতুর পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজবাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশের অধিকার পেল।

মেয়েদের সম্বন্ধে তার মনে কোনও আদর্শ, তাদের সম্মান রক্ষার করার কোনও দায়ই তার ছিল না, এমনি করে কত মেয়ের সর্বনাশ সে করেছে বিমলার প্রতি ধীরে ধীরে তার কামনার থাবা বাড়তে লাগল, মেয়েজাতকে এত নীচু ভাবত, তাই সে তার আত্মকথনে বলেছে— *"বার বার দেখলুম আমার সেই ইচ্ছের কাছে মেয়েরা আমাকে ভাসিয়ে দিয়েছে, তারা মরবে কি বাঁচবে তার হুঁশ থাকেনি। যে শক্তিতে মেয়েদের পাওয়া যায় সেইটেই হচ্ছে বীরের শক্তি, অর্থাৎ বাস্তব জগৎকে পারার শক্তি।"* এই উক্তি থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে সে যেন মেয়েদের আত্মসাৎ করার জন্যই জগতে জন্মেছে। সন্দীপের জীবন ভোগবৃত্তি ও লালসাকবলিত, এবং জ্ঞানহীন তঞ্চক; সন্দীপ ভোগবিলাস ছাড়া আর কোনও কিছুই জানে না, আর এই ভোগের বীজমন্ত্র রূপে বন্দেমাতরমকে গ্রহণ করে স্বদেশীয়ানার ছদ্মবেশের আড়ালে এক প্রবঞ্চক পুরুষ সে। মেয়েদেরে সে আদর্শহীনা, স্থূল, ভোগ্য পণ্য হিসেবে কল্পনা করেছে, আমাদের দেশে স্বদেশপ্রেমিকের মধ্যে নারীসত্তার মর্যাদা উচ্চাসনে সমাসীন ছিল সেই সত্তাকে সে ভূলুণ্ঠিত করেছে, তার হৃদয়াসনে নারীদের মর্যাদাপূর্ণ কোনও আসনই পাতা হয়নি। তার কাছে জীবন ধারণের সমস্ত জৈবিক পদার্থ আর নারীর মধ্যে কোনও ধরনের বৈষম্য ছিল না। অনাদিকাল থেকে সকল কাব্য মহাকাব্যে সন্দীপের মতো প্রবঞ্চক, লোলুপ চরিত্রের সাক্ষাৎ মিলেছে এবং আজও মিলছে। সন্দীপের আত্মকথনে আর একটি উক্তি বিশ্বের সকল নারীসত্তাকে ধূলিমলিন করেছে— *"আমি জানি লোভী মানুষকে মেয়েরা ভালোবাসে, ওই লোভের উপর দিয়েই তো মেয়েরা তাকে জয় করে। আমি লোভী তাই বারবার মেয়েদের কাছ থেকে আদর পেয়ে আমার এমন দশা হয়ে গেছে যে লজ্জার লেশমাত্রও নেই ...অতএব আমি কেয়ার করি নে। এই ডাঁটাগুলির প্রত্যেকটিকে চিবিয়ে একেবারে নিঃসত্ত করে ফেলে দেব, তবে ছাড়ব, এই আমার স্বভাব।"* সন্দীপের নিজস্ব উক্তিতে তার স্বভাব সম্বন্ধে আমরা পরিচিত হলাম। কিন্তু নারীর যে তার কাছে কোনও মর্যাদা নেই সে যে তুচ্ছ তাই তাদেরকে সে ডাঁটার সঙ্গে তুলনা করে স্বভাব স্থূলতাকে আরও স্থূল করেছে। তার আত্মসম্মানবোধের অভাব থেকেই নারী সম্বন্ধে এই উক্তি করা তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। বিমলার সঙ্গে ঘনিষ্ট হতে গিয়ে সম্মোহনের মধ্যে সে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সে বিমলার বুদ্ধিকে আধুনিক সাহিত্যের প্রবৃত্তি প্রশস্তিতে অভিভূত করতে চেয়েছে, তার ইচ্ছার পিছনে বুদ্ধি — আত্মরক্ষার একটি দ্বিতীয় প্রাকার নির্মাণ করা। আত্মসম্মানহীন একটি মানুষের পক্ষে অন্যকে সম্মান করা অসম্ভব, তাই লজ্জাহীন সন্দীপ বন্ধুপত্নী বিমলার প্রতি কামনার হাত বাড়াতে একটুও লজ্জাবোধ করেনি। এই প্রসঙ্গে নিখিলেশের সঙ্গে তর্কসূত্রে সে বলেছিল— *"প্রবৃত্তি হচ্ছে প্রকৃতির গ্যাসপোষ্ট, আর প্রবৃত্তিকে যারা মিথ্যে বলে তারা চোখ উপড়ে ফেলে দিব্যদৃষ্টি পাবার চেষ্টা করে।"* লোভ লালসা প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। কিন্তু শিক্ষা মার্জিত রুচিবোধ এবং সংযমের দ্বারা তাকে গ্রহণ করা যায়, তখন সেই প্রবৃত্তিও যে বিশ্বচেতনায় মহাকালের বেদীমূলে সদা ভাস্বর হয় তা সন্দীপের অজানা ছিল বলে মনে হয়।

সন্দীপ তার স্বভাব অসংযম সত্ত্বেও প্রতীক্ষা ও প্রস্তুতির মূল্য বোঝে এবং ভাবদীক্ষার ক্ষেত্র প্রস্তুতির জন্য যে ধৈর্যের দরকার তা সে সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছিল। এবং অনুরাগ প্রকাশের আয়োজনে বর্ণময় বাণীর প্রলেপে সে বিমলার মনকে রাঙানোর আরও একটি উপকরণ কাজে লাগিয়েছে। নিখিলেশের সঙ্গে তার যে ছবিটি বৈঠকখানার টেবিলে রক্ষিত ছিল সেখান থেকে সে বিমলার ছবিটি সরিয়ে নিয়েছে। অর্থাৎ তত্ত্ব ও ছবি এক সঙ্গে কাজ করুক তা সন্দীপের রণনীতির কৌশল, সুকৌশলে সে নিখিলেশের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠার আনন্দে বিভোর।

সন্দীপের সঙ্গে যখন বিমলা সম্পূর্ণ ঘনিষ্টতা লাভ করল তখনি সে সন্দীপের প্রবৃত্তি যে আর পাঁচটা মানুষের মতো সংযত নয় বুঝতে পারল, এবং সন্দীপের এই অসংযমী আত্মার প্রতি সে যতটুকু আসক্তি অনুভব করেছিল ততটুকু অশ্রদ্ধাবোধ করতে লাগল। প্রথম দর্শনে সন্দীপের মধ্যে যে দৃপ্ত পৌরষত্বের প্রকাশ ছিল, সেটা যে চাঞ্চল্য ছাড়া আর কিছুই নয়। সেটা বিমলা বুঝতে পারলো, দেশমাতৃকার সেবার গৌরবে সে সব ভুলে গিয়ে এই ভন্ড দেশসেবকের হাতের খেলার পুতুল হয়ে সে নিজেকে রসাতলে টেনে নামিয়েছিল। তখন তার মধ্যে জীবনাদর্শ বলতে শুধুমাত্র প্রবৃত্তিই জাগরিত ছিল। তাই বুঝতে পেরে অনুতাপ করে বলেছে যে তার ননদ মনুর স্বামী মাতাল হয়ে যখন মনুকে পেটাত তখন তার সর্বাঙ্গ ঘৃণায় জ্বলত, আজ যে নেশা তাকে পেয়েছে তা মনুর স্বামীর মদের নেশার চাইতেও অনেক প্রবল, এর থেকে বোঝা যায় ক্রমশঃ সে তার ভবিষ্যৎ জীবন সম্পর্কে সন্দিহান হয়েছে। কারণ সন্দীপ তাকে শিখিয়েছে প্রবৃত্তিই নরনারীর একমাত্র স্বভাবধর্ম, সন্দীপ যতটুকু পেরেছে বিমলার ইন্দ্রিয় শক্তিকে উত্তেজিত করে শিথিল করেছে তার জীবনের চলার পথ। এবং এও সে বিমলাকে শিখিয়েছে নরনারীকে তাদের স্বভাবজাত বৃত্তি থেকে ছিন্ন করার জন্য কতকগুলি অস্বাভাবিক মানুষ ধর্মের দোহাই দিয়ে সংস্কার দিয়ে সেই প্রবৃত্তিগুলি শৃঙ্খলিত করেছে।

অসংবৃত্ত প্রবৃত্তি দিয়ে বিমলাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল সন্দীপ। তার কামনার পাত্র বিমলার সামনে তুলে ধরে তাকে সমস্ত সংসার জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিল। এতদিন পর যখন বিমলা নিজের পরিণাম সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। সে যে কোন সর্বনাশের পথে চলেছে, সন্দীপের তত্ত্বের পশ্চাৎ প্রেরণা কি এইসব কিছু দিবালোকের মতো সামনে স্পষ্ট হয়েছে। তাই বিমলা তার অপরাধ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে, এমনি করে আস্তে আস্তে বিমলা শরীর সর্বস্ব সন্দীপের হাতছানিতে আকর্ষণ বোধ করে না। এমনি করে বিমলাকে সন্দীপ যে কী সর্বনাশের অতলে তলিয়ে নিয়ে যেতে পারত তা আজ বিমলা বুঝতে পারছে, বিমলার মধ্যে জীবনতত্ত্বের আসল রূপ প্রকাশ পাচ্ছে। সন্দীপ যে মানুষ হিসেবে অত্যন্ত হীন ও সাধারণ বিমলা আজ তা বুঝতে পারছে, তাই সন্দীপের সেই বীরের সাজ আজ ধূলি লুণ্ঠিত হয়েছে।

বিমলার এই গৃহে প্রত্যাবর্তনে নিখিলেশও আবার তার মনোবল ফিরে পেয়েছে, তাই সেদিন বৈঠকখানায় যখন বিমলা ও সন্দীপ মুখোমুখি আলোচনায় ব্যস্ত তখন নিখিলেশের ধৈর্যের বাধ আর মানল না; সে সন্দীপকে গ্রাম ছেড়ে কোলকাতা চলে যাবার নির্দেশ দিল এবং বলল যে এ এলাকা ছাড়া কি জগতে আর কোনও জায়গা নেই। কারণ শান্ত নিখিলেশ সব এতদিন মুখ বুজে সহ্য করেছে, আজ সন্দীপের এই বিশৃঙ্খল কার্যকলাপ সে আর মানতে পারছে না। কারণ তার এই জমিদারির প্রজারা যেখানে সুখশান্তিতে ছিল, দেশদ্রোহের প্রবল

বন্যাও তাদের শান্তি ভঙ্গ করতে পারেনি, সেখানে সন্দীপ এসে বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়েছে, ধর্মবিদ্বেষের বীজরোপণ করে গ্রামকে ছারখার করে দিতে চলেছে এবং তার ঘরের মধ্যেও অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য টাকাপয়সা আত্মসাৎ করবার চেষ্টা চালিয়েছে, এই ঔদ্ধত্য নিখিলেশ আর ক্ষমা করতে পারেনি। ততক্ষণে সন্দীপেরও সম্বিৎ ফিরেছে, সে বুঝতে পেরেছে স্বদেশীয়ানার নাম করে ধর্ম নষ্ট করা, ঘর নষ্ট করা, সমাজ নষ্ট করা আর চলবে না, কারণ বিমলার প্রতি ভালোবাসা তাকে আজ উর্দ্ধায়িত করেছে, সে বুঝতে পেরেছে প্রেম ও করুণা দুর্বল-মোহকাতর মানুষকে দেবের মহিমা দান করে, বিমলার প্রতি তার প্রেম তাকে এক স্বাভাবিক মানুষে পরিণত করেছে। তার এতদিনের ভণ্ডামি সকলে কাছে ধরা পড়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক মনুষ্যত্ব ফিরে পেয়ে সে বিমলাকে বলেছে—*"মক্ষীরাণী আমার কথা এরা কেউ বুঝতে পারে না, হয়ত বা তুমিও বুঝবে না। আমি তোমাকে বন্দনা করি। তোমাকে দেখার পর থেকে আমার মন্ত্র বদল হয়ে গেছে। বন্দে মাতরং নয়, বন্দে প্রিয়াং-বন্দে মোহিনীং। মা আমাদের রক্ষা করেন, প্রিয়া আমাদের বিনাশ করেন, বড় সুন্দর সেই বিনাশ।"* এই উক্তি থেকে বোঝা যায় সন্দীপ এবার উপলব্ধি করেছে দেশমাতাকে, প্রিয়ার সান্নিধ্য তাকে বুঝিয়ে দিয়েছে, ভণ্ড আদর্শ দিয়ে আর সব করা যায় আত্মতুষ্টি করা যায় কিন্তু প্রেমের সঙ্গে ভণ্ডামি চলে না, তাই এতকাল পরে সে সত্যস্বরূপের সন্ধান পেয়েছে, দেশজননীর কোল থেকে তার সেবাচ্ছলে আত্মসাৎ ব্রতে ব্রতী সন্দীপ আজ নতুন করে সত্য মানবের আদর্শে অনুপ্রাণিত হল। এতকাল তার মধ্যে যে দানবসত্তা কাজ করছিল তার থেকে সে মুক্তি পেল। স্বাদেশিকতার মুখোশের আড়ালে সে যে একজন ভণ্ড শয়তান তা উপলব্ধি করল নিখিলেশের কয়েকটি কথায় — *"দেশ যেখানে বলে 'আমি আমাকেই লক্ষ করব' সেখানে সব ফল সে পেতে পারে। কিন্তু আত্মাকে হারায়, যেখানে সকলের বড়কে সকলের বড় করে দেখে সেখানে সকল ফলকেই সে খোয়াতে পারে। কিন্তু আপনাকে সে পায়।"* এখানে নিখিলেশের কথায় গীতার সেই বাণী — কর্মানি স্বাধিকারেস্তু, মা ফলেষু কদাচন কথাটির প্রতিফলন ঘটেছে।

সন্দীপ নিখিলেশের কথার মর্মার্থ বুঝতে পেরেছিল, এতকাল সে ভগবদ্গীতা, ও বন্দেমাতরম দুটিকে তার জীবনের এক বেসুরো তন্ত্রীতে বেধে ফেলেছিল। আজ এই কথার পর সে তার কামনা বাসনার কৃষ্ণবিবর থেকে মুক্তি পেল। তার মনে প্রশ্ন জাগল কেন সে বিমলার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে চাইছে? বিমলা এখন তার জীবনে এক বিষম দায় হয়ে ঠেকেছে, এর থেকে তার উত্তরণ প্রয়োজন, তাই সে বলেছিল যে — যে রাবণকে সে রামায়ণের প্রধান নায়ক বলে মনে করে সেও তারই মত সীতাকে অশোক কাননে বন্দিনী করে রেখেছিল, এবং সেই বীরের মধ্যেও ওই একই জায়গায় সঙ্কোচ ছিল, তার জন্যই লঙ্কাকাণ্ড ব্যর্থ হয়েছিল। তার মধ্যে সঙ্কোচ না-থাকলে সীতা সতী হতে পারতেন না। আজ সে উপলব্ধি করেছে যে বিমলাকে তার নিজের গণ্ডির বাইরে চেয়েছিল বলেই তাকেও পরাজিত হয়ে চলে যেতে হচ্ছে। অর্থাৎ সন্দীপ তার নিজমুখে স্বীকার করতে বাধ্য সে রাবণ আর বিমলাকে সতী-সীতার আসনে বসিয়েছে। সে যুগে দেশাত্মবোধের প্রথম উন্মেষক্ষণে আদর্শনিষ্ঠাই প্রবল ছিল, তার সঙ্গে স্থূল-ভোগ চিন্তা আত্মতৃপ্তির ভেজাল মিশ্রিত ছিল না। সন্দীপের যুগে প্রায় পঁচিশ বৎসরের ব্যবধানে এই নির্মল বন্যাস্রোত অনাবিল বন্যাস্রোতে পরিণত হয়েছে। তা দেশপ্রীতিকে সাময়িক সুবিধাবাদের পর্যায়ে নামিয়ে তাকে শাশ্বত নীতি বিরোধী করে তুলেছে। সন্দীপ এদেরই

দলের ছিল। পরবর্তী কালে বিমলাও বুঝতে পারল এবং অন্তঃপুরের আব্রু থেকে বের হয়েও বিমলা আত্মরক্ষায় ব্যাকুল হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হয়েছে যে যারা তাকে দেশলক্ষ্মীর দিব্য মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল তারাই তাকে কত অল্পমূল্যে, সামান্য কয়েকটি মোহরের বিনিময়ে দেবীপ্রতিমাব বেদী থেকে নামিয়ে অমর্যাদার ধূলায় বিসর্জন দিল, এই বোধশক্তিই বিমলাকে সন্দীপের আকর্ষণ থেকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। আজ আর সন্দীপও বিমলাকে সে দেবীর আসন থেকে ধূলিমলিন করতে চায় না।

অপরদিকে নিখিলেশের তত্ত্বনিষ্ঠ অনুভূতিতে জীবনের চমক নেই, আছে সত্যদৃষ্টির ক্ষীণ উদ্ভাসন। বিমলাকে সত্যই যদি সে বুঝতে পারত, শুধু দার্শনিকের নির্লিপ্ত দৃষ্টি দিয়ে তার বিচার না করে ভালোবাসার রঞ্জন রশ্মিতে সে প্রবেশ করতে পারত বিমলার অন্তর্লোকে, কিন্তু সে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিতে মোহান্ধ হয়ে জীবনের সুকুমার বৃত্তির রূপই প্রত্যক্ষ করেছে। অপরদিকে সে ক্ষেত্রে সন্দীপ প্রবৃত্তি নির্ভর হলেও তার অন্তরের সুকুমার বৃত্তি ও রূপের প্রশংসায় বিমলাকে সে আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিল। তাই সহজেই একথা বলা যায় যে রবীন্দ্রনাথ নিজে আদর্শনিষ্ঠ ছিলেন বলেই আদর্শবাদীর দুর্বলতার প্রতি অতিমাত্রায় প্রশ্রয়শীল ছিলেন, নতুবা সন্দীপ ছাড়া নিখিলেশই তার বিদ্রূপের লক্ষ্য হতে পারত। নিখিলেশের মধ্যে তত্ত্ব আদর্শ অতিমাত্রায় ছিল বলে তাকে জীবনের সুদীর্ঘকাল কষ্টভোগ করতে হয়েছিল। তার আদর্শ চরিত্র যদিও মহানুভবতার পরিচয় বহন করে তবুও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আদর্শ পালনে অসমর্থ পুরুষ দুর্বল পুরুষেরই প্রতীক। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় অতিমাত্রায় আদর্শবান লেখক নিখিলেশের গুণটুকুই শুধু আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার দুর্বল পুরুষত্বকে ভ্রূক্ষেপই কবেননি। অথচ নিখিলেশের পাশে সন্দীপের মতো একটি চরিত্র যদি না-থাকত তাহলে আদর্শবান নিখিলেশ চরিত্রের দোষত্রুটি আরও বেশি মাত্রায় সমালোচকের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়ত। উপন্যাসের শেষ পর্বে সন্দীপের আত্মকথনে যে সন্দীপকে আমরা পাই তাতে বুঝতে পারি বাইরে যদিও একটি অত্যন্ত হীন চরিত্র, তবুও বিমলাকে ভালোবাসে, সে তার চরিত্রের দোষত্রুটি উপলব্ধি করতে পেরেছে, বলেই অন্তিম মুহূর্তে তাকে সতীর আসনে প্রতিষ্ঠা করেছে, এখানেই পূর্বে কৃত সকল পাপকর্ম থেকে উর্দ্ধলোকে তার উত্তরণ ঘটেছে। লেখক বা সমালোচক নিখিলেশের প্রতি অতিশয় আসক্তি বশতঃ হয়তো সন্দীপের এই উত্তরণ অনুভব করতে পারেননি।

এই ঘরে-বাইরে উপন্যাসে বর্ণিত তিনটি চরিত্রই প্রধান ও তাদের জীবনের কাহিনির সংঘাতরেখা গভীরভাবে মুদ্রিত হয়েছে। এই তিনটি চরিত্রের মধ্যে নিখিলেশ ও সন্দীপ ঘটনাপ্রবাহের সম্মুখীন হওয়ার আগে থেকেই নিজ নিজ বিশিষ্ট জীবন দর্শনে দীক্ষিত ও তার লৌহবর্মে আংশিকভাবে সুরক্ষিত। পক্ষান্তরে বিমলাই একমাত্র চরিত্র যে কোনও পূর্বগঠিত মানসিকতা নিয়ে আসন্ন বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়নি। তার জীবনে যে নিদারুণ ঘটনা ঘটেছে তা থেকে রক্ষার নিমিত্ত তার কোনও পূর্বনির্ধারিত ব্যবস্থা ছিল না। সমুদ্রে মন্থনের সমস্ত দুর্বিষহ আলোড়ন তার উপর দিয়ে ঘটে গেছে। নিখিলেশ ও সন্দীপের তুলনায় সে যে কত তুচ্ছ ও সাধারণ, তারই ফলে তার অরক্ষিত অঙ্গে সংগ্রামের সমস্ত আঘাত চিহ্ন রক্তাক্ষরে ফুটে উঠেছে। সে হয়ত তার মনকে ষোল আনা বুঝতে পারেনি। তার গার্হস্থ্য ও দাম্পত্য জীবনের সীমিত অভিজ্ঞতা তাকে জীবনের দুর্বিষহ পাঁক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা প্রদান করেনি, এবং এই সীমিত জ্ঞানই তাকে পথভ্রষ্ট হবার ক্ষেত্রে এগিয়ে দিয়েছিল।

এই মুখ্য তিনটি চরিত্রের উপস্থাপনে লেখকের কল্পনা ও মনস্তত্ত্বাশ্রয়ী পরিবেশ রচনার অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে। এবং ভাষণে গাঢ়বন্ধ মননশীল জীবনসমীক্ষা উপন্যাসটির উপজীব্য হলেও এটিকে একটি প্রেমোপখ্যান ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তত্ত্ব, দর্শন, জীবনবোধ, পাপশক্তি, তামসিকতা সকল কিছুকে ছাপিয়ে একটি ত্রিভুজ প্রেমের দ্বন্দ্ব সংঘাতই সুস্পষ্ট ফুটে উঠেছে। কারণ, এখানে স্বামী-স্ত্রীর জীবন সমস্যা, প্রাত্যহিক দ্বন্দ্ব, ভালোবাসার আকুতি, জীবনের সংঘাতই, জীবনদর্শন, তত্ত্ব দর্শন, জীবনবোধকে ছাপিয়ে প্রাধান্যতা লাভ করেছে। এই ত্রিভুজ প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্ব সকল আদর্শ তত্ত্বকে অতিক্রম করে স্বামী-স্ত্রীর জীবনাদর্শ প্রধান ও প্রকট হয়েছে। স্বামীর কাছে প্রেমে প্রত্যাখ্যান পেয়েছে বদলে স্বামীর বন্ধু সন্দীপের কাছে নিজের রূপের প্রশংসা পেয়ে বিমলা নিজেকে ধন্য মনে করেছে। সকল নারীই রূপের প্রশংসায় আত্মপ্রসাদ লাভ করে। বিমলাও তার ব্যতিক্রম নয়, অতএব একথা বলা যায় যে নারীর এ জাতীয় স্বভাবধর্মই তাকে স্থানচ্যুত করেছিল। বিমলার প্রবৃত্তিগত চাহিদা নিখিলেশ পূর্ণ করতে অক্ষম হয়েছে যেখানে সেখানে একটি বুভুক্ষু নারী হৃদয়ে অন্যের প্রতি আকর্ষিত হয়েছে, এই আসক্তি অস্বাভাবিক নয়। কারণ সংসারী মানুষের জীবনদর্শন স্ত্রীর দেহকে ছাড়িয়ে প্রেম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না, এটাই মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। কাজেই স্বামী নিখিলেশের বিমলার নারী হৃদয়ের আর্তি পূর্ণমাত্রায় গ্রহণীয় না-হওয়াতে সে সন্দীপের নারীলোলুপসত্তার প্রতি যে আকৃষ্ট হয়েছিল, তা চিরকালীন শাশ্বত নারীসত্তার পক্ষে অস্বাভাবিক নয়। বিমলা এখানে সেই শাশ্বত নারীসত্তার প্রতিভূ হিসেবে এই উপন্যাসে একটি চরিত্র। সন্দীপের প্রতি আকর্ষণ কিন্তু তার বিবাহিত জীবন থেকে সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন করলে তার সত্তাকে পাপবিদ্ধ করতে পারেনি। এখানে লেখক উল্লিখিত চরিত্রগুলির মানসিক দ্বন্দ্ব প্রেমের টানাপোড়েনের যে বিস্তৃত চিত্র অঙ্কন করেছেন, তাতে তাঁর দূরদৃষ্টি ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির এক অপূর্ব ও সংস্কারবিরোধী মনের পরিচয় পরিলক্ষিত হয়। বিশ্লেষিত এই কাহিনির পরিপ্রেক্ষিতে এটুকু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এখানে প্রত্যেকটি চরিত্র কালের সীমা অতিক্রম করে সর্বকালে সর্বযুগের একখানি প্রেমের উপন্যাসের অমরতা দাবি করতে পারে।

এছাড়াও উপন্যাসের পটভূমি যেখানে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের একটি জমিদার বাড়ি, সেখানে একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে লেখক রবীন্দ্রনাথ, তাঁর এই উপন্যাসে সব কিছুই কল্পনার আশ্রয় নিয়ে উপস্থাপন করেননি, তাঁর নিজস্ব জমিদারির কয়েকটি চরিত্রের এবং তাঁর নিজস্ব বাড়ির পরিবেশের ছায়াও এখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির আনাচে কানাচে ঘটিত কিছু ঘটনার প্রতিফলন খুব সুক্ষ্মভাবে দৃষ্টি না দিলেও বুঝতে কষ্ট হয় না। যেমন নিখিলেশের সঙ্গে মেজরানির সম্পর্ক তিনি বর্ণনা করেছেন, এতে লেখকের নিজের জীবনের সঙ্গে তার মেজবৌঠানের যে কৈশোর সম্পর্ক একটা জড়িত ছিল, তা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং তাঁর আত্মজীবনীর হুবহু মিলও পাওয়া যায়। এখানেও যে লেখক তাঁর নিজস্ব জীবনের কিছুটা ছায়াপাত ঘটিয়েছেন, সে বিষয়ে অসঙ্কোচে এই কথা বলা যায় যে চরিত্রগুলি সম্পূর্ণ কল্পনাপ্রসূত নয়। এবং নিখিলেশের আত্মকথনে শামলাদহের বোটে বিমলাকে নিয়ে প্রতিবছর ভাদ্রমাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রাত কাটানোর কথা আমরা পাই এবং প্রকৃতির দৃশ্য অবলোকনের যে আনন্দ নিখিলেশকে উপভোগ করতে দেখি, এখানেও আমাদেরকে শিলাইদহ বোটে থাকাকালীন লেখকের নিসর্গ প্রীতিরই যে মিল পাই তাতে একথা বলতে বাধা নেই, এই উপন্যাসে লেখকের নিজস্ব মননশীলতা ও নিজ জীবনের ছবি, জ্ঞান অথবা

অজ্ঞানতাবশতঃই হোক এই উপন্যাসে উপস্থাপিত করে নিজ জীবনের পাঠকৃতিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

কল্পনাপ্রসূত হলেও এই উপন্যাসে বাস্তবসত্যকে কিছুটা তুলে ধরেছেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক এবং স্বদেশী আন্দোলনের চিত্র অঙ্কিত হলেও, সর্বকালে সর্বযুগে পাঠকের গ্রহণযোগ্য একটি আধুনিক উপন্যাসরূপে পরিগণিত বলে মনে করতে দ্বিধা নেই। চরিত্রচিত্রণে, ভাষায়, কালের বিশ্লেষণে, প্রকৃতি ও প্রেমের যুগপৎ সম্মিলনে সর্বকালের সামাজিক একটি উপন্যাসরূপে স্বীকৃতি লাভের উপযোগী এই 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসখানি, একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

তথ্য সূত্র ঃ— 'রবীন্দ্র সৃষ্টি সমীক্ষা'—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

■ *লেখিকা করিমগঞ্জ নীলমণি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের বিষয় শিক্ষিকা ও বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক।*

সীতার বনবাস ঃ একটি নতুনত্বের অনুসন্ধান

বর্ণশ্রী বকসী

যখন থেকে পর্বত-গুহাচারী মানুষ জোটবদ্ধ হয়ে সমাজ গড়তে শিখল এবং সাংসারিক জীবন-যাপন করতে আরম্ভ করল, অর্থাৎ যখন থেকে মানব মনের বিকাশের শুরু তখন থেকেই তারা নানা শিল্প-ভাস্কর্য সৃষ্টির মাধ্যমে মানসিক খাদ্য আহরণ করতে শিখল। এভাবেই একসময় তাদের মুখেমুখে গল্প সৃষ্টির সূচনা। সময়ের সাথে-সাথে পদচারণা করতে করতে তাদের সেই সৃষ্টিমুখ মন ক্রমশ নিজেদের সৃষ্টিকে লেখার মাধ্যমে চিরস্থায়ী করতে প্রয়াসী হল, আর এভাবেই আমাদের সৃষ্টিশীল সাহিত্যের জয়যাত্রারও সূচনা বলা যায়।

পদ্য দিয়ে সাহিত্যের দরজা খুললেও গদ্য তার স্বাভাবিক পথ ধরেই এসেছে। বাংলাসাহিত্যও প্রথমাবস্থায় কাব্যিকই ছিল, দিন বদলের সঙ্গে-সঙ্গে গদ্য এসেছে তার স্বাভাবিক পথ ধরেই। অনুবাদ-অনুকৃতির মধ্য দিয়েই বাংলা সাহিত্যের অগ্রসরশীলতা, সংস্কৃত ভাষার রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির ছন্দবদ্ধ অনুবাদ হয় প্রথমে বাংলা ভাষায়। তারপর একসময় মানুষের গাদ্যিক চাহিদায় সংস্কৃত, ইংরেজি, হিন্দি প্রভৃতি ভাষায় সাহিত্যকে বাংলায় অনুবাদ করে বাঙালি গল্পরস পিপাসু সাহিত্যরসিক পাঠকদের মনে চাহিদা পূরণের চেষ্টা করেন উনিশ শতকের নবজাগরণের নতুন সূর্যের সারথি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনিই প্রথম অনুবাদ ও অনুকৃতির মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষায় গদ্য রচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর দেখানো পথ ধরেই বর্তমান বাংলা সাহিত্যের গদ্য অর্থাৎ কথা সাহিত্য এত সমৃদ্ধ হতে পেরেছে।

হাত দিয়ে দ্বার খুলবো নাগো গান দিয়ে দ্বার খুলবো; — এই যে দ্বার খুলতে যাওয়ার কথা কবি বলেছেন, এ তো আসলে কোনও নতুনকে জানতে চাওয়ারই আত্মিক অভিপ্সার কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এমনই একজন নতুন দরজার উন্মোচক যাঁর স্বচ্ছন্দ উপস্থিতি বাংলা সাহিত্যকে করে তুলেছে বিকশিত, সবুজাভ। *'A single consciousness is contradiction in adjecto. consciousness is in essence multiple'* – এই কালের প্রখ্যাত তাত্ত্বিক বাখতিনের এই উক্তিটা সবসময়ই সত্য মানবমনের প্রস্ফুটনের ক্ষেত্রে। কারণ চেতনা নিজেকে অর্থাৎ আত্মস্বরূপকে উপলব্ধি করতে পারে কেবলমাত্র অপরসত্তার সঙ্গে দ্বিবাচনিকতায়। আর এই দ্বিবাচনিকতা ফুটে বেরোনোর সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম হল উপন্যাস-শিল্প। বাংলা সাহিত্যে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মধ্যেই যদিও বলা হয়ে থাকে সকল উপন্যাসের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, তবু আমরা মনে করি ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' অবলম্বনে বিদ্যাসাগর অনুদিত 'সীতার বনবাস'ই প্রথম উপন্যাসের বীজ বপন হয়েছিল। যদিও অনুবাদ সম্পর্কে Gadamar বলেছেন

'No translation can replace the original ..... the translator's task is never to copy what is said, but to place himself in the direction of what is said (i.e. in its meaning in order to carry over what is to be said into the direction of his own saying).' অর্থাৎ কোনও অনুবাদই পুরোপুরি মূলানুসারী হয় না, কারণ অনুবাদকের কাজ নকল করা নয়। তার কাজ হল মূলে কী বলা হয়েছে তা অনুধাবণ করে নিজস্ব অভিমত পোষণ করা। দক্ষ অনুবাদক বিদ্যাসাগর যখন

ভবভূতির 'উত্তর রামচরিত' অনুবাদ করতে গেলেন তখন তাতে মূল রামায়ণেরও সংমিশ্রণ ঘটালেন। এর ফলে তাঁর অনূদিত 'সীতার বনবাস' নতুন মাত্রা লাভ করল। 'সীতার বনবাস'-এর মূল বিষয় রাম সীতার ক্ষণস্থায়ী সুখী দাম্পত্য জীবন নির্বাহ ও প্রজাবৎসল রাজার প্রজানুরঞ্জনের নিরপরাধা-প্রাণপ্রিয়া-পূর্ণগর্ভা পত্নীকে বাল্মিকী মুনির তপোবনে নির্বাসনে পাঠানো। সেখানে সীতার যমজ সন্তান লব ও কুশের জন্মদান, বাল্মিকীর স্নেহচ্ছায়ায় তাঁর পরিচর্চায় দু-ভায়ের বেড়ে ওঠা ও শেষে পুনর্মিলন এবং দুঃখিনী সীতার দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা চাওয়ায় প্রাণত্যাগ। এই বইয়ের অনুবাদ করতে গিয়ে দক্ষ ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগর গল্প পরিবেশনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি পাত্র-পাত্রীদের মুখে সংলাপ বসানোর ব্যাপারে যেমন পারঙ্গম তেমনি বর্ণনার ছলে গল্প বলতেও পটুত্বের অধিকারী।

বিদ্যাসাগর তাঁর অনূদিত 'সীতার বনবাস'কে আটটি পরিচ্ছেদে ভাগ করেছেন এবং তিনি কাহিনির স্বাভাবিকতাকে বজায় রাখতে কোথাওবা কথোপকথন রেখেছেন আবার কোথাও বর্ণনাত্মক পন্থা অবলম্বন করেছেন। 'সীতার বনবাস'এর নান্দীমুখ অর্থাৎ সূচনা হয়েছে বর্ণনার-ছলে—*"রাম রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, এবং অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্যশাসন, ও অপত্য নির্বিশেষে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শাসনগুণে, স্বল্প সময়েই, সমস্ত কোশল রাজ্য সর্ব্বত্র সর্ব্বপ্রকার সুখ-সমৃদ্ধিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফলতঃ তদীয় অধিকারকালে; প্রজালোকের সর্ব্বাংশে যাদৃশ সৌভাগসঞ্চার ঘটিয়াছিল; ভূমণ্ডলে; কোনও কালে, কোন রাজার শাসন সময়ে সেরূপ লক্ষিত হয় নাই। তিনি, প্রতিদিন, যথাকালে; অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া, অবহিত চিত্তে, রাজকার্য্যের পর্যালোচনা করিতেন; অবশিষ্ট সময়, ভ্রাতৃত্রয়েরও জনক-তনয়ার সহবাসসুখে, অতিবাহিত হইত।*

কালক্রমে, জানকীর গর্ভলক্ষণ আবির্ভূত হইল। তদ্দর্শনে, রামের ও রামজননী কৌশল্যার আহ্লাদের সীমা রহিল না; সমস্ত রাজভবন উৎসবে পূর্ণ হইল; পুরবাসিগণ, অচিরে রাজকুমার দেখিবে, এই মনের উল্লাসে; স্ব স্ব আবাসে, অশেষবিধ উৎসব চলিতে লাগিল।"

উপরের অনুচ্ছেদ দুটো ভবভূতির 'উত্তর রামচরিতে' নেই, এটা বিদ্যাসাগরের স্বনির্মিতি, এই দুটো অনুচ্ছেদের বর্ণনাত্মক রীতি দেখে একে আমরা বাংলা উপন্যাসের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ধরতে পারি। কারণ পরবর্তীকালে বাংলা উপন্যাস যাঁদের হাতে বিকশিত হয়েছে, যেমন বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, তাঁরাও এই বর্ণনাত্মক রীতির ব্যবহার করেছেন তাঁদের উপন্যাস সৃষ্টিকলায়। *'Two voices is the minimum for life, the minimum for existence.'* বাখ্‌তিন উল্লিখিত সর্বজনীন এই উচ্চারণ বাংলা উপন্যাস পাঠের ক্ষেত্রেও আমাদের পথ প্রদর্শক। উপন্যাসে উপসংহার আলাদাভাবে বড় হয়ে উঠে না, তার নির্মিতিকেই আমরা বেশি গুরুত্বপূর্ণ বলে বুঝতে পারি। সুচারু ভাষা-শিল্পী বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' অনুবাদ করতে গিয়ে এর নির্মাণের অর্থাৎ গঠনের উপরে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। সহানুভূতিশীল, সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর তৎকালীন সমাজে নারীদের ওপর প্রচলিত দুঃখজনক সামাজিক আচরণকে দেখে তাঁর লেখার মাধ্যমে সেগুলোকে সহৃদয় মানবমনের কাছে পৌঁছানোর জন্যে রামায়ণ-মহাভারতের আখ্যানকে অনুবাদের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছেন বাংলা ভাষায়। উপন্যাসের অনেকগুলো বিভাগ আছে আমরা জানি। সেই বিভাগেরই একটি প্রধান বিভাগ হল 'সামাজিক উপন্যাস'। বিদ্যাসাগর অনূদিত 'সীতার বনবাস'-এ আমরা

সামাজিক কাহিনির নির্গমনই দেখতে পাই। সামাজিক উপন্যাসে, সমাজের কোনও একটি সমস্যাকে গল্পের আকারে পাত্র-পাত্রীদের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলতে হয়। সে হিসেবে দেখতে গেলে 'সীতাব বনবাসে' আমরা দুঃখিনী সীতার মিথ্যা অপবাদ এবং প্রজাবৎসল রাজা রামের সমাজকে মেনে চলার ঠুনকো-আবেগ দেখিয়ে, পতিপ্রাণা সতী-স্ত্রীর সতীত্ব পরীক্ষার মতো জঘন্যতম ব্যবহারকেই তুলে ধরা হয়েছে। রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করলে সমস্ত মুনি-ঋষিরা সেই যজ্ঞে আমন্ত্রিত হলেন। ঋষি বাল্মিকী ঠিক করলেন তিনি একা যজ্ঞস্থলে যাবেন না, সঙ্গে যাবে জানকী-নন্দনেরা অর্থাৎ লব ও কুশ। তিনি ছোট থেকে লব-কুশকে সযত্নে রামের জন্ম থেকে পরবর্তী ঘটনার গান করা শিখিয়েছিলেন। অশ্বমেধের যজ্ঞস্থলে গিয়ে সবার কাছে রামায়ণ গান গেয়ে শোনাতে লাগল বাল্মিকী মুনির প্রিয় শিষ্যদ্বয় লব ও কুশ। একদিন রামচন্দ্রের কানে এই অপূর্ব বালকদের সুমিষ্ট গীতের কথা এসে পৌঁছালো এবং তারা তাঁর সামনে এসে এই গান শোনানোর জন্য আদেশ পেল। রাম ও তাঁর মায়েরা রামের মতো আকৃতি বিশিষ্ট বালকদের দেখে এক অদ্ভুত ধরনের স্নেহের উৎসারণ অনুভব করলেন তাঁদের হৃদয়ে। তার পর যখন জানতে পারলেন এ দু'জন আর কেউ নয় রাম-সীতার আত্মজ, তখন আবেগ-বিহ্বল কৌশল্যার মন সীতাকে দেখার জন্যে আকুল হয়ে উঠল। তাঁদের আবেগ অনুসারে সীতাকে সেখানে আনা হলে লোকাপবাদ ভয়ে ভীতরাম দ্বিতীয়বার অগ্নিপরীক্ষা যাচনা করলেন সকলের সামনেই। অনেক বাদানুবাদের পর এটাই স্থির হল যে, *'সমবেত সমস্ত লোকের সমক্ষে, সীতা স্বীয় শুদ্ধাচারিতা প্রমাণসিদ্ধ করিলে রাম তাহাকে গৃহে লইবেন।'*— এই যে সীতার সতীত্ব প্রমাণের জন্য তার নারীত্বের অবমাননা তা কেবলমাত্র কোনও একজন বিশেষ সীতার নয়, তৎকালীন সমাজের প্রায় প্রতিটি মেয়েরই। এই প্রসঙ্গে বাখ্‌তিনের প্রবাদ-প্রতিম বক্তব্যকে তুলে ধরা যেতে পারে — *'The contexts of dialogues are without limit. They extend into the deepest past and the most distant future.'*

'সীতার বনবাস'-এ শেষপর্যন্ত আমরা দেখি সীতাকে পুনরায় গ্রহণ করার বিষয়ে প্রজাদের মধ্যে দু'ধরনের মতবাদ পোষণ হচ্ছে। একদল সীতা যে পবিত্র-নিষ্কলুষ সে বিষয়ে দৃঢ়ভাবে নিশ্চিত হয়ে তাঁকে গ্রহণ করতে বলেছে সরবে। আরেক দল মৌনতা দিয়ে বোঝাচ্ছে তারা সীতার পুনরায় পরিশুদ্ধতার পরিমাপেচ্ছু। এর ফলে রাম সীতার বিষয়ে নিঃসন্দেহ থেকেও মৌনীদের পক্ষ অবলম্বন করেন। সীতার পরিশুদ্ধতা দ্বিতীয়বারও পরীক্ষার মুখোমুখি জেনে মহর্ষি বাল্মিকী দুঃখিত হৃদয়ে সীতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন— *'বৎসে জানকি! তোমার চরিত্র বিষয়ে প্রজালোকের মনে যে সংশয় জন্মিয়াছে, অদ্যাপি তাহা অপনীত হয় নাই; অতএব তুমি কোনও বিশিষ্ট প্রমাণ দর্শাইয়া সকলের অন্তকরণ হইতে সেই সংশয়ের অপসারণ কর। সীতা, বাল্মিকীর দক্ষিণ-পার্শ্বে দণ্ডায়মান থাকিয়া, নিতান্ত আকুল হৃদয়ে, প্রতিক্ষণেই পরিগ্রহ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, শ্রবণমাত্র বজ্রাহতার ন্যায় গতচেতনা হইয়া বাতাহতা লতার ন্যায় ভূতলে পতিতা হইলেন।'* সীতা এই প্রচণ্ড অপমানকে সহ্য করতে না-পেরে সর্বসমক্ষে প্রাণত্যাগ করলেন। বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস'-এ ঔপন্যাসিকতাকে একটি পরিমিত পাঠকৃতিতে রূপান্তরিত করেই তার তাৎপর্য বোঝাতে চেয়েছেন বাঙালি গল্পরস পিপাসু পাঠকদের। কারণ বিশৃঙ্খল চিন্তা-প্রবাহে শৃঙ্খলা আনার জন্য চূড়ান্ত শৈল্পিক আকল্পের মধ্যে দিয়ে তাকে পরিবর্তিত করতে হয়।

No doubt each great man creats his own form — সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে এই আপ্তবাক্যকে মেনে নিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অনূদিত 'সীতার বনবাস' সম্বন্ধে একথা বলা যায় যে, যদিও সমাজ-সংস্কারক, মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারের উদ্দেশ্যেই হাতে কলম তুলে নিয়েছিলেন এবং বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যকে অনুবাদের মাধ্যমে আপনত্বের মোহর লাগিয়েছিলেন তবুও তাঁর সেই সব সাহিত্যের সৃষ্টিই শেষপর্যন্ত বাংলা সাহিত্যকে করে তুলেছে সমৃদ্ধ। 'সীতার বনবাস' অনুবাদের মাধ্যমে তিনি যদিও বাঙালি পাঠককে রামায়ণের রস-আস্বাদন করাতে চেয়েছিলেন, তাঁর সৃষ্টিশীল প্রতিভা তাঁকে অনুবাদকের পরিচয়েই সীমাবদ্ধ থাকতে দেয়নি। তাঁর লেখা হয়ে উঠেছে মৌলিক, চিন্তাশীল পাঠকের চিন্তার ক্ষেত্র। 'সীতার বনবাস' অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদক বিদ্যাসাগরের হাতে অজ্ঞান্তেই প্রথম বাংলা উপন্যাসের বীজ প্রোথিত হয়েছে বলে মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ রয়েছে। ইউরোপীয় সমালোচকের উদ্ধৃতি দিয়ে এই প্রবন্ধের ইতি টানা যাক — "*Every time we talk we give order to the world; every time we write or read a literary text we give the greatest degree of possible order to a world.*"

■ *লেখিকা বদরপুর নবীনচন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা, বিশিষ্ট উদীয়মান কবি-প্রাবন্ধিক ও বিদ্যাসাগর গবেষক।*

পুতুলনাচের ইতিকথা ঃ
নিহিত রহস্য-রূপের গূঢ় কথা-শরীর

দিলীপ বিশ্বাস

পুতুলনাচ—এক অতিলৌকিক চেতন-ক্রিয়া; প্রাকৃতিক শক্তির এক অন্তহীন রহস্য ইতিকথা — কথার শরীর বিন্যাস, জীবনের অভিজ্ঞতার তরঙ্গ-প্রবাহ।

গহন জটিল মনোলোক ও মানুষের সমাজ জীবনের বাস্তবতা, মানুষের অস্তিত্বের সংকট, জীবন যন্ত্রণা, জীবন-জিজ্ঞাসা, একদিন প্রতিদিনের জীবন-মৃত্যুর বিক্ষুব্ধ তরঙ্গের অন্তরঙ্গ দর্পণে বিম্বিত মানুষের ইতিকথা — মহাকাব্যের আলোকে ব্যঞ্জনাময় বাস্তব। উপন্যাসের নায়ক শশীর মনোলোকে লালিত ভাববাদের সঙ্গে বাস্তবতার সংঘর্ষের চিত্র।

জীবন নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আবর্তিত হতে হতে অস্তিত্বের নানা সংকটের মুখোমুখি। মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত মানুষের শতচ্ছিন্ন জীবন-চলন এবং অন্তর্লোকের নির্মম বাস্তব অন্বেষণ—পুতুল নাচের ইতিকথা — মানুষের মনের অবচেতনের বিকৃতি ও পাপচেতনা একদিকে, অন্যদিকে স্বচ্ছ জীবনচেতনা, এই দুই চেতন লোকের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব। একপৃষ্ঠে জীবন, অন্যপৃষ্ঠে মৃত্যু; একপৃষ্ঠে অন্ধকার, অন্যপৃষ্ঠে আলো — এই জীবন-নৃত্য, যে জীবন মানুষের প্রান্তিতে তাতেই চূড়ান্তভাবে বেঁচে থাকা ও জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা অর্জন। কারণ,'জীবনকে শ্রদ্ধা না করিলে জীবন আনন্দ দেয় না।'

আপাত বিচ্ছিন্ন অনেক ঘটনার সমষ্টিতে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এই উপন্যাসে গ্রামীণ — প্রধানত নিম্নবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত — মানুষের জগৎ ও জীবন তরঙ্গের সংঘাত, গূঢ় জীবন রহস্যের আলোছায়া নির্মাণ করেছেন।

প্রায় সমসাময়িক সময়ে রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি' তথাকথিত নিচুতলার শ্রমজীবী মানুষের জীবন সংঘর্ষ। দুটি উপন্যাসের প্রেক্ষাপট গ্রাম হলেও চরিত্র ও জীবন-সমস্যার বিস্তারে ভিন্ন জগৎ সৃষ্টি হয়েছে।

পুতুল নাচের সূচনাতেই একটি সৌন্দর্যহীন মৃত্যু-দৃশ্য—জীবন রহস্যে আভাসিত— বজ্রাঘাতে হারুঘোষের অসহায় মৃত্যু। এই মৃত্যু যেন রহস্যময়ী নিয়তির মায়াবী দ্যুতি। এখানেই আমরা লক্ষ করি প্রাকৃতিক শক্তির অন্তহীন রহস্য—আকাশের দেবতার কটাক্ষ— প্রকৃতির কাছে মানুষের অসহায়তা। তবু মৃত্যু এখানে শেষ কথা নয়, শেষ কথা জীবন। কারণ মৃত্যুর স্থানটিতে 'ওজনের ঝাঁঝালো সামুদ্রিক গন্ধ ক্রমে মিলাইয়া আসিল' এবং 'অদূরের ঝোপটির ভিতর হইতে কেয়ার সুমিষ্ট গন্ধ ছড়াইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল।' এখানে বুঝতে পারি শেষ বলে কিছু নেই। জীবন ও মৃত্যু সৃষ্টির এই দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়া চলতেই থাকে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ — মানুষ প্রথম প্রত্যক্ষ করেছে এত অসহায় মৃত্যু, বিশ্বব্যাপী এতবড় যুদ্ধ। এই উপন্যাসের রচনাকাল প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাল। যুদ্ধোত্তর সময়ের মানসিক সংশয়, সংকট, অস্থিরতা, অসহায়তা ইত্যাদি আধুনিক ব্যক্তির মানস দর্পণে প্রতিফলিত।

নায়ক শশীর দৃষ্টির আলোকে ঔপন্যাসিক আমাদের উজ্জীবিত করেছেন এক গভীর

জীবনবোধে। জীবন ও মৃত্যুর রহস্যের অসামান্যতায় একটি মানুষের বজ্রাঘাতে মৃত্যু দৃশ্যের পাশাপাশি আমরা বকুলতলায় একটা পুতুল পড়ে থাকতে দেখি। একটি পুতুলের পড়ে থাকার মধ্যে আমরা যেন বজ্রাহত হারুকেই দেখতে পাই। 'রাত্রে পুতুলের শোকে মেয়েটা কাঁদিবে'। এখানে পুতুল মানুষেরই সত্তা যেন। এবং সামাজিক মানুষের অসহায়তা একটি পুতুলের উপমায় বিধৃত।

মনন ও চিন্তনে শশীর প্রকাশ এক যন্ত্রণাবিদ্ধ চরিত্ররূপে। চরিত্রের অন্তর্মুখিনতার জন্যই পুতুলনাচের ইতিকথা-য় কাহিনির প্লট মুখ্য নয়, মুখ্য—চরিত্রগুলির মানসিক জটিলতার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া।

হারুর মৃত্যুদৃশ্যের পাশাপাশি একটি মৃত্যু সংবাদ, সে মৃত্যু কোনও এক পঞ্চুর। পঞ্চুকে মৃত্যুর অনেকদিন পর 'চণ্ডীর মা আবিষ্কার করিয়াছিল। সর্বাঙ্গে খাবলা খাবলা পচা মাংস, কোথাও হাড় বাহির হইয়া পড়িয়াছে। দুই হাতের মুঠোর মধ্যে প্রকাণ্ড খরিশ সাপটা শুকাইয়া হইয়া আছে একেবারে দড়ি।' হারুর মৃত্যুকে, শবদেহের রহস্যময়তা বুঝাতে গিয়েই পঞ্চুর মৃত্যু-দৃশ্যের অবতারণা। মৃত্যুই এখানে মৃত্যুর একমাত্র উপমা।

উপন্যাসটিতে আরও ক'টি মৃত্যু-দৃশ্য আছে। সেনদিদির সন্তান-প্রসবকালীন মৃত্যু। চিকিৎসা ও সেবাদ্বারা চিকিৎসক শশী বসন্ত রোগগ্রস্থ সেনদিদিকে একবার বাঁচিয়েছিল। দুর্ঘটনাগ্রস্থ বাসুদেব বাড়ুজ্যের পুত্র ও সেনদিদির প্রসবকালীন মৃত্যুকে ডাঃ শশী বাঁচাতে পারেনি। চিকিৎসা হচ্ছে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি এবং সেবা—মানবিক। মানুষের হৃদয়ের রসে জারিত না-হলে চিকিৎসা — বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া ব্যর্থ হতে বাধ্য। ডাঃ শশীর মুখেই আমরা শুনতে পাই বিজ্ঞানের অসম্পূর্ণতার কথা — *'শশী জানে এরকম হয়, মানুষের দেহের মধ্যে আজও এমন কিছু ঘটিয়া চলে এ যুগের ধন্বন্তরীরও যা থাকে জ্ঞানবুদ্ধির অগোচরে।'* উপন্যাসটিতে আরও দুটি মৃত্যু — তথাকথিত সিদ্ধপুরুষ যাদবপণ্ডিত ও তার স্ত্রীর আফিম সেবনে আত্মহত্যা। উপন্যাসে কোনও একটি মৃত্যুর মধ্যে কোনও রোমান্টিক সৌন্দর্য নেই। ধর্মীয় আবেগ ও মানুষের আত্মিক অহংকার তীব্রভাবে পরিস্ফুট এই আত্মহত্যায়। ডাঃ শশী ঘটনার ঘনঘটায়—সামাজিক প্রতাপের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। এই দম্পতির মৃত্যু রহস্য সাধারণের কাছে অলৌকিকতার মাহাত্ম্যে মহিমান্বিতই থেকে যায় — ডাঃ শশীদের মতো বিজ্ঞান মনস্ক মানুষেরও সত্য প্রকাশে ব্যর্থতার জন্যই গণমানুষ সত্যভ্রমের চশমা পরেই কাটিয়ে দিচ্ছে একটা গোটা জীবন।

'আমি রথের দিন মরব শশী'। এই কথার নেপথ্যে কাজ করছে যাদব পণ্ডিতের অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনের অহংকার। কিন্তু বিপরীত কথাটাই এখানে প্রকট *'রথের দিন দেহত্যাগ করিবার কথা যাদব যা বলিয়াছিলেন শশী জানে তা কথার কথা।'* শশী সত্য সন্ধানী, অন্যরা সত্য সন্ধানী নয়। যাদব পণ্ডিত ও তার স্ত্রীর আফিম সেবনে আত্মহত্যা—একজন সিদ্ধপুরুষ ও তার স্ত্রীর অলৌকিক দেহত্যাগ সাধারণ্যে মহিমান্বিত হয়ে রইল— *'মিথ্যারও মহত্ত্ব আছে। হাজার হাজার মানুষকে পাগল করিয়া দিতে পারে মিথ্যার মোহ। চিরকালের জন্য সত্য হইয়াও থাকিতে পারে মিথ্যা।'* সমাজের মনন উপন্যাসে এভাবে বিস্তার লাভ করেছে।

বিষণ্ন মৃত্যুপথ দিয়েই শরবাহক শশীর সঙ্গে আমাদের গাওদিয়া গ্রামের জীবনের সঙ্গে পরিচয়। এ গ্রাম লেখকের কল্পনার আলোকে উদ্ভাসিত নয়। ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গদেশে এ ধরনের গ্রামের দেখা পেতে আমাদের কষ্ট করতে হবে না। *'রাস্তাটি চওড়া মন্দ নয়, কিন্তু কাঁচা, বর্ষাকালে কোথাও এক হাঁটু কাদা হয়, কোথাও এঁটেল মাটিতে বিপজ্জনক রকমের পিচ্ছিল হইয়া থাকে'* ইত্যাদি।

গ্রামের মানুষ শশী শহরে ডাক্তারি পড়িয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। কিন্তু এখনও তার চেতনায় শহর উজ্জ্বল। বিজ্ঞান ও কাব্যে মিশিয়া এমন জটিল এমন রসালো মানুষের জীবন তবু গ্রামে ডাক্তারি করিতে আসিয়া সে যেন হাফাইয়া উঠিল। জীবনটা কলিকাতায় যেন বন্ধুর বিবাহের মতো বাজিতেছিল হঠাৎ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।' গদ্যময় পঙক্তির মাঝে মাঝে এরূপ কাব্যময় ভাষার দ্বারা শশীর মানসলোকের দ্বন্দ্ব বিস্তারিত হয়েছে।

উপন্যাসে গ্রামীণ জীবনের বিশ্বাস, অর্থনৈতিক অসহায়তা, সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা ইত্যাদি অলঙ্কৃত হয়েছে লেখকের সূক্ষ্ম কলমে— *'সন্ধ্যা আসিয়াছে। বাড়িতে একটা বৌ আছে। অথচ সন্ধ্যাদীপ জ্বলে নাই, গলায় দড়ি দিয়ে বৌটা মরিয়া যায় না কেন?' 'এই বাস্তুভিটাটুকু ছাড়া হারু ঘোষের সর্বস্ব কুসুমের বাবার কাছে বাঁধা আছে আজ সাত বছর।'* 'সন্ধ্যাদীপ' এই শব্দবন্ধের মধ্যে চিহ্নায়িত লোকায়ত ঐতিহ্য। গ্রামের মানুষ শশীকে সম্মান করে। কুসুমের উক্তি *'পূজ্য, মানুষ আপনি, আপনাকে পূজা করে আমাদের পুণ্যি হয়।'*

আধুনিক যুবক শশী গ্রাম শহরের দ্বন্দ্বে মানসিকভাবে শহরকেই প্রাধান্য দিয়েছে। *'যত দিন যায় গ্রাম ছাড়িয়া নূতন জীবনে নূতন করিয়া জীবন আরম্ভ করিবার কল্পনা শশীর মনে জোরালো হইয়া আসে।'* শশীর আধুনিক Carrierist মানসিকতার প্রকাশ এভাবে — *'শুধু শহরে গিয়ে ডাক্তারি করার ইচ্ছা থাকলে কথা ছিল না, এত বড় বড় কথা আমি ভাবি। বিদেশে যাব, ফিরে এসে কলকাতায় বসব, মানুষের শরীর আর মনের রোগ সম্বন্ধে নতুন নতুন গবেষণা করব, দেশবিদেশে নাম হবে, টাকা হবে।'*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় রচনাতেই সমাজের অবহেলিত শ্রমজীবী মানুষের ক্ষুধা ও যৌন সমস্যার চিত্র পরিস্ফুট। পুতুলনাচের ইতিকথায় যৌনতা ও নরনারীর প্রেম বিষয়ের বিস্তার মুখ্য না-হলেও কুসুম-শশী, মতি-কুমুদ, সেনদিদি-গোপালের চরিত্রে প্রেম ও যৌনতার ছবি জীবনের গভীর অনুভব-উপলব্ধির সঞ্চার করেছে। শশীর প্রেম পরকীয়া এবং অন্তর্লীন। কিন্তু মাঝে মাঝেই চমকে উঠেছে কালো মেঘে বিদ্যুতের ছটা। শশী চিকিৎসক, চিকিৎসার প্রয়োজনেই তাকে সদ্য যুবতী মতির বুকে স্টেথোস্কোপ লাগাতে হয়। কুসুমের মনে এতেই সন্দেহের উদ্রেক করে — *'বুকে ওর হয়েছে কি? এত পরীক্ষা কীসের?'* সেই প্রেম ব্যক্ত হল সাত বছর পর যখন চিরবিচ্ছেদের পর্ব। কুসুম শশীর সঙ্গে দেখা করতে এসে শশীর গোলাপ গাছটিকে মাড়িয়ে দেয়। এই গোলাপ গাছটিকে মাড়িয়ে দেওয়াব মধ্যে আধুনিক মানুষের জটিল অন্তর্লোক উদ্ভাসিত। কুসুম চিরদিনের জন্য গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে যখন ঠিক তখনই শশীর হৃদয়, প্রেমের ভারে দীর্ণ টের পাওয়া যায়। এর মধ্যেও শশী সান্ত্বনা লাভ করে এই ভেবে — *'ঘরে আগুন লাগলে আগুন নেভে — বাহিরেও মনেরও।'* শশীর সংগ্রাম নিজের অভ্যন্তরে। শশী ডিপ্রেশনের শিকারে পরিণত হয় না। পুতুলনাচের ইতিকথায় ধ্বনিত অস্তিবাদী দর্শনেরই কথা।

জীবনের কোনও সরল পথ নেই। জীবনের উপর নেই কোনও নিয়ন্ত্রণও। এই স্বনিয়ন্ত্রণহীন প্রবাহের মধ্যেই মানুষের জীবন চলন। এরূপ প্রেম ও বিচ্ছেদ জীবনের অন্তর্নিহিত ভয়ঙ্কর সত্য। উপন্যাসটিতে প্রেমের দৃশ্য আরও একটি,— কুমুদ ও মতি — কুমুদ যাত্রাদলের নায়ক, মতি গ্রাম্য সাধারণ মেয়ে। একালের কোনও যুবতীর সিনেমার নায়কের প্রতি মোহান্ধতা-ই দেখতে পাওয়া যায় মতির—কুমুদ অভিনীত প্রবীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে — কুমুদের প্রতি ভালবাসা। বর্তমান সময়ের কোনও যুবতীর মনের আবিরেই রাঙানো প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের কোনও যুবতী মন। মতির মনের দর্পণে প্রেমের এক রহস্য-তাৎপর্য প্রতিফলিত। এক্ষেত্রে নারীমনের অবচেতনের জটিল মনস্তাত্ত্বিক দিক বিস্তার লাভ করেছে। দাম্পত্য জীবনে ভিত্তিহীন, অনিশ্চিত উপার্জন, বাউণ্ডুলে *'গৃহবিমুখ যাযাবর স্বামীর সঙ্গে মতি আজ এলোমেলো পথের জীবনকে বরণ করিল—'*। এই প্রেমের জীবনের অপর দিকে লেখক স্থাপন করেছেন, জয়া-বনবিহারীর প্রেমহীন আধুনিক দাম্পত্য জীবনের জটিলতা ও জয়ার স্বপ্নভঙ্গ—যা মতি-কুমুদের প্রেমকে আরও উজ্জ্বলতা দান করে।

কুমুদ চরিত্র লেখকের কল্পলোকের নয় — বাস্তবনিষ্ঠ, বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ের যুব-মানসের ধ্বংসাত্মক রূপ। যেমন, কুমুদ হোটেলের ভাড়া পরিশোধ না-করে সদ্য-ক্রীত টিনের শূন্য তোরঙ্গটি হোটেলের ম্যানেজারকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য হোটেলে রেখে মতিকে নিয়ে হোটেল থেকে বেরিয়ে আসে। কুমুদের উক্তি *'টাকার জন্য ... একটু কৌশল করলাম।'* এই বিবৃতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের নৈতিকতার অবক্ষয়। মতি-কুমুদের প্রেমের পদাবলি — *'ওই চেয়ে দ্যাখ কদমতলে আমরা গলাগলি।'* কদমতলার কৃষ্ণপ্রেমে তো আর জীবন চলে না, তাই এ গল্পের শেষ কথা *'হয়তো একদিন ওদের শিশুর প্রয়োজনে নীড় না-বাঁধিয়া চলিবে না।'* এই বিবৃতি বিশৃঙ্খল থেকে শৃঙ্খলায় প্রত্যাবর্তনের ইঙ্গিত। মতির কুমুদের প্রতি প্রেম ও পরবর্তীতে বিবাহ এবং জীবনচর্চা সাধারণ নারীজীবনের রাধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাধা — এই জীবন প্রবাহ থেকে মুক্তি ঘোষণা করে। পুতুলনাচের ইতিকথা এভাবেই জীবনের ব্যাপকতর প্রতীতি অর্জন করেছে। লেখকের কথায় 'প্রক্ষিপ্ত' এই কাহিনির মধ্য দিয়েও জীবনের প্রচ্ছন্ন আলোছায়ার রহস্যলোকের সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়েছে।

মার্ক্সীয় ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকেই ঔপন্যাসিক বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও মানুষের যৌনতার আলো-আঁধারির খেলা। সেনদিদির প্রতি শশীর কোনওরূপ গোপন সম্পর্ক — শশীর বাবা গোপালের এরূপ সন্দেহ। পাঠক আমরা জানতে পারি *'সেনদিদি শশীকে আকর্ষণ করিত বটে। এবং লাবণ্যময়ীর স্নেহ স্বভাবতই মানুষ একটু বেশি পছন্দ করে বলিয়া সে মমতা দাবীও ছিল শশীর কাছে।'*

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কলমে ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের আলোকেই আমরা অবলোকন করি আধুনিক মানুষের জটিল অন্তর্লোক। কিন্তু গূঢ় জীবন সন্ধানে কোথাও মার্ক্সীয় ও ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের অতি আতিশয্য নেই।

শ্রেণি বিভক্ত সমাজের মানসিক দ্বন্দ্ব — নিম্নবর্গের মতি যাত্রা দেখতে গিয়ে সমাজের উচ্চবর্গের মহিলাদের মধ্যে বসে পড়া এবং উচ্চবর্গীয়দের আচার আচরণে মতির মানসিক যন্ত্রণা, মার্ক্সীয় আলোকেই এরূপ ঘটনার বিন্যাস। *'শীতলবাবুর বাড়ির মেয়েরা গায়ে সিল্কের ব্লাউজ দেয়, বোম্বাই শাড়ি পরে ... বিমলবাবুর স্ত্রী-কন্যারা পায়ে জুতাও দিয়া থাকে। হারু*

ঘোষের কন্যা মতিকে তাহাদের মাঝখানে বসবার ব্যবস্থা করে দেওয়ায় শীতলবাবুর আর বিমলবাবুর বাড়ির মেয়েরা বিশেষ অসন্তুষ্ট হইলেন।' 'মতির কাছে যাহারা ছিলেন, তাহারা বাড়ির মধ্যে যাওয়ার ছলে উঠিয়া গেলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া অন্যত্র বসিলেন। ... 'হাত পা ছড়াইয়া আরাম করিবার সুযোগ পাইয়াও মতির কিন্তু আরাম হইল না।' মানিকের অন্যান্য উপন্যাসের মতো মার্কসীয় দর্শন পুতুলনাচের ইতিকথায় প্রকট না-হলেও এই চরিত্রগুলির মনোলোকে দেখা যায় মার্কসীয় শ্রেণি চেতনার আশ্রিত রূপ। এ ধরনের বাস্তবনিষ্ঠ মনোলোকের বিশ্লেষণের মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত উপন্যাসটির প্রাণ।

সমস্ত গাওদিয়া গ্রাম, গ্রামীণ চরিত্র আমরা শশীর পায়ে পায়ে হেঁটেই চিনতে পারি।

শশীর পিতা গোপাল। *'গোপাল দাসের কারবার লোকে বলে ছুরি দেওয়া। আসলে সে করে সম্পত্তি কেনাবেচা ও টাকা ধার দেওয়া, অর্থাৎ দালালি ও মহাজনি। শোনা যায়, এককালে সে নাকি বার-তিনেক জীবন্ত মানুষের কেনাবেচার ব্যাপারেও দালালি করিয়াছে।'* সামন্ততান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক বীভৎসতার প্রতীকী চরিত্র গোপাল। প্রগতিশীল শশীর সঙ্গে সামন্ত সমাজ-প্রতিভূ মহাজন পিতা গোপালের দ্বন্দ্ব—এ দ্বন্দ্বের আর-এক রূপ দেখা যায় — *'গ্রামে একটি হাসপাতাল করার উপযুক্ত যা কিছু ছিল যাদবের, সব তিনি দান করিয়া গিয়াছেন। ব্যবস্থার ভার শশীর, দায়িত্ব শশীর।'*— যাদব পণ্ডিতের উইল করা সম্পত্তি নিয়ে পিতার সঙ্গে সংঘাতের মধ্য দিয়েও শশী নিজের জীবনের সৌন্দর্য অনুধাবণ করতে পেরেছে। পুত্রের সঙ্গে পিতার সংঘাত দুই প্রজন্মের সংঘাত। জীবন দর্শনের সংঘাত।

শশী পিতার ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করে শহরে চলে যেতে চেয়েছে এবং বাস্তবেও চলে যাওয়ার ব্যবস্থা যখন ঠিকঠাক, ঠিক তখনই বিষয়াসক্ত গোপাল হঠাৎই একদিন পুত্রের হাতে সমস্ত সমর্পণ করে সেনদিদির গর্ভজাত তারই অবৈধ সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে কোথায় চলে যায়। সামন্তবৃত্ত ছেড়ে গোপাল বেরিয়ে যায়। উপন্যাসে এভাবেই বিধৃত হয়েছে সামন্তপ্রভুর পরাজয়ের বার্তা এবং মানুষের অন্তর্লোকের দ্বৈতসত্তা।

উপন্যাসে মানব মনের অন্তর্গূঢ় রহস্য-আচ্ছন্ন শশীর বোন বিন্দুর কাহিনি। স্বামী নন্দর কাছে বিন্দু প্রমোদের উপকরণ গণিকা মাত্র। সে কোনওদিন স্ত্রীর মর্যাদা পায়নি। এই অস্বাভাবিক জীবন-চলনে বিন্দুর মনোরাজ্যে দেখা দিয়েছে নানা বিকৃতি। সুরাসক্ত বিন্দু একদা পতিগৃহে অপর্যাপ্ত মদ্যপান করে জ্ঞানহারা যখন তখন দাদা ডাঃ শশীর ধারণা বিন্দু বিষ পান করেছে। *'শশীর মনের ভেতরটা হিম হইয়া গেল।'* বিন্দু মদ খায়। *'আকণ্ঠ মদের পিপাসার সঙ্গে বিন্দুর মনে মদের প্রতি এমন মারাত্মক ঘৃণা আছে যে, নেশার শেষে আত্মগ্লানিতে সে আধমরা হইয়া যায়।'*

পরবর্তীতে শশী যখন জানতে পারে বিষ নয়, বিন্দু মদ খেয়েছিল, তখন তার মনে হয় *'বিন্দু কেন সেদিন বিষ খাইল না।'*

মানুষের দ্বান্দ্বিক রূপ এসব বয়ানে পরিস্ফুট।

বোন বিন্দুর সমস্যা সমাধানে শশী ব্যর্থ—তাই বিন্দুর মৃত্যু-কামনা।

শশীর মানসিকতা পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপেরই ফসল।

সমস্ত অপমান-অনাচার বরণ করে বিন্দু পিতৃগৃহ ত্যাগ করে স্বামী নন্দর ঘরে ফিরে গেল, এ-ও পুরুষতান্ত্রিক প্রতাপের কাছে নারীর নতি স্বীকার।

সমাজের আধিপত্যবাদের স্বরূপ আরো একবার উন্মোচিত হয়েছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠাসূত্রে গ্রামীণ ভদ্রলোক উচ্চবিত্তীয় অহংকারে *'শশী কর্তালী করিবে, গ্রামের জমিদার তিনি শুধু দিবেন পরামর্শ? স্পর্ধা বটে শশীর।'*

পুতুলনাচের ইতিকথায় পুতুল জীবনের প্রতীক হয়ে এসেছে বারবার, ছোট বোন সিন্ধুর *'পুতুল খেলা' শশী অস্বাভাবিক মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করে।'*

এই লক্ষ করা আসলে জীবনের অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য, জীবনের সৌন্দর্য, জীবনের বাস্তবতা, সামাজিক মানুষের মানসিক অবস্থার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরিবর্তনের অনুসন্ধান।

জীবন এ জন্যই সৌন্দর্যময় যেহেতু আগে থেকে কিছুই আঁচ করা যায় না।

■ *লেখক বিশিষ্ট কবি ও 'একাবলি' কবিতা বিষয়ক পত্রিকার সম্পাদক।*

বঙ্গজ আধুনিকতার দ্বৈতরূপ ও বিভূতিভূষণ

সুজিৎ চৌধুরী

[বিভূতি-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত ১২, ১৩ ও ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৯৪ কলকাতায় সাহিত্য অকাদেমি এক জাতীয় সেমিনারের আয়োজন করে। ওই সেমিনারে এই নিবন্ধটি পঠিত হয়েছিল। সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল "Bibhutibhushan and modernity in Bengali novel"। এই অনুষঙ্গটি আলোচনার পটভূমিকে নিরূপিত করেছে।]

"পথের পাঁচালী"র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯২৯ সালে। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার সংজ্ঞা নিরূপণের দায়িত্ব তখন কল্লোল গোষ্ঠী সমঝে নিয়েছে। ওই সময়ে রচিত বুদ্ধদেব বসুর দুটো উপন্যাসে "পথের পাঁচালী"র প্রসঙ্গ রয়েছে। একটাতে সরাসরি, অপরটিতে একটু পরোক্ষ। সেই বক্তব্য অকরুণ এবং আক্রমণাত্মক। বোঝা যায় কল্লোল গোষ্ঠী বিভূতিভূষণকে আধুনিক বলে বিবেচনা করেনি। অপরদিকে সমসাময়িক অপর একটি গোষ্ঠী এবং গোষ্ঠী বহির্ভূত অনেক সাহিত্যরসিক উপন্যাসটি সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। "তৃণাঙ্কুর"-এ বিভূতিভূষণ জানাচ্ছেন যে, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রজনীকান্ত দাস ও অশোক চট্টোপাধ্যায় তাঁকে সঙ্গে নিয়ে "পথের পাঁচালী"র গ্রাম দেখতে গিয়েছিলেন। এদিকে অমিয় চক্রবর্তী এক চিঠিতে লিখেছেন ঃ *"বই পড়ে গ্রামখানি দেখতে ইচ্ছা হয়। শিল্পীর সৃষ্ট গ্রামখানি শাশ্বতকালের, জানি না ভৌগোলিক গ্রামখানি দেখতে কিরকম দেখব।"* — এই গুণগ্রাহীরা নিশ্চিতই আধুনিকতার অন্য একটি ধারার প্রতিনিধিত্ব করছেন। তাহলে দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থেকে "পথের পাঁচালী"র মূল্যায়নে হেরফের ঘটছে। এখানে আধুনিকতার যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণের প্রশ্নটা আসছে। কাজটা সহজ নয়। আধুনিকতার ধারণাটির জন্ম পশ্চিম ইউরোপে। সেখানে এর ভাবগত ক্রমবিকাশের ইতিহাস মোটামুটি সন-তারিখসহই নির্ণয় করা সম্ভব। তবু খোদ ইউরোপ-আমেরিকাতেই আধুনিকতার সংজ্ঞা এবং সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রশ্নে বিতর্কের অবধি নেই। কোনও কোনও সময়ে সেই মতভেদ দুই বিপরীত মেরুপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়। এদিকে বঙ্গজ আধুনিকতার ধারণাটা ওই পশ্চিম থেকেই লব্ধ। ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত তার উপর আবার বিচিত্র সমস্ত জটিলতার আস্তরণ ফেলেছে। দ্বিধা, সংশয়, দ্বন্দ্বের মধ্যে তার যাত্রারম্ভ। একদিকে বিমুগ্ধতা অপরদিকে বিস্মরণের অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তার পরিপুষ্টি। এতে বিপত্তি ঘটেছে এবং সেই বিপত্তির অভিঘাত সমাজদেহের বিভিন্ন স্তরে আনুপাতিক হারে সঞ্চারিত। সাহিত্য যেহেতু শুধুমাত্র সমাজের প্রতিবিম্ব নয়, সমাজের সঙ্গে তার নিরন্তর দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক বিদ্যমান, অতএব আধুনিকতার পরিব্যাপ্ত সামাজিক ধারণা বৌদ্ধিক অন্যান্য ক্ষেত্রের মতো সাহিত্য ক্ষেত্রেও তার প্রভাব ফেলেছে। বিভূতিভূষণের সাহিত্যকর্মের মূল্যায়ন নিয়ে এই যে প্রারম্ভিক অনিশ্চয়তা, আমাদের বিবেচনায় তার সঙ্গে বঙ্গজ আধুনিকতার গোলমেলে স্বরূপটির সম্পর্ক রয়েছে। শুধু তাই নয়, বিভূতিভূষণের পরবর্তী সমস্ত মূল্যায়নও কোনও না কোনওভাবে তার দ্বারা প্রভাবিত।

।।দুই।।

ব্রিটিশ শাসনের সূত্র ধরে উনিশ শতকে বাংলায় নূতন যে ইংরেজি শিক্ষিত শ্রেণি গড়ে উঠল, তাঁরা মূলত দুটো ভাগে বিভক্ত হয়ে যান। একদল পাশ্চাত্য ধ্যান-ধারণার একটু বেশি

অনুরাগী—ইয়ং বেঙ্গলের মধ্যে এদের চূড়ান্ত প্রতিফলন পাই। এই গোষ্ঠীর সবচাইতে মাত্রাজ্ঞানসম্পন্ন প্রতিনিধি হিসাবে রামমোহন-বিদ্যাসাগরের কথা উল্লেখ করা যায়। অপর দল ঐতিহ্যবাদী, এঁদের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব এবং এই গোষ্ঠীর সবচাইতে মানবিক প্রতিনিধি বোধ হয় বঙ্কিমচন্দ্র। একজন সমাজবিজ্ঞানী দেখিয়েছেন যে, হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ, পরস্পর সংলগ্ন দুটি শিক্ষায়তন মূলত বিবদমান এই দুই গোষ্ঠীর পার্থিব অভীপ্সার প্রতীক। মৌলিক ক্ষেত্রে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে তেমন কোনও পার্থক্য ছিল না, —উভয় দলই একান্ত নাগরিক, কলকাতা-নির্ভর এবং বাঙালি বর্ণ হিন্দু সমাজ থেকে আগত। ইংরেজ রাজত্বে চাকুরি ও অন্য পেশাগত ক্ষেত্রে নূতন যে সমস্ত সুযোগ উন্মোচিত হচ্ছে, তার উপর স্বীয় স্বত্ব সংরক্ষণ ও সম্ভাব্য স্থলে সম্প্রসারণই উভয়গোষ্ঠীর লক্ষ্য। এই দুটি গোষ্ঠীর বিভাজন রেখা তাই সব সময় স্পষ্ট নয়, আর উভয় গোষ্ঠী থেকেই কিছু ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত যে বের করা যায় না এমনও নয়। আমাদের এই বিশ্লেষণ একটু সরলীকৃত, তবে বর্তমান প্রসঙ্গে এর চাইতে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার প্রয়োজন নেই। এটুকু শুধু মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের আধুনিকতা জন্মলগ্নেই কতকগুলো মৌলিক দুর্বলতায় আক্রান্ত ছিল। প্রথমত, তার মৌলিক কোনও আর্থনীতিক ভিত্তি ছিল না। ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণে তার সুযোগ ছিল সীমিত। দ্বিতীয়ত, তার চিন্তাভিত্তিটা পুরোটাই বিদেশাগত, মাঝে-মাঝে ওখান থেকে জল এনে এখানে সিঞ্চন না-করলে তার পুষ্টি হত না। পাশ্চাত্যবাদীরা সেটা আনতেন ওখানকার শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গন থেকে, ঐতিহ্যবাদীরা মূলত ওখানকার ওরিয়েন্টালিস্টদের গবেষণাপত্র থেকে। এ-দুটো দুর্বলতাই কাটিয়ে ওটা যেত যদি ব্যাপকতর কোনও গণভিত্তির উপর তাকে দাঁড় করানোর চেষ্টা হত। কোনও পর্যায়েই নাগরিক এলিট শ্রেণি সে-ধরনের কোনও প্রকল্প নিয়ে চিন্তাভাবনা করেননি। অর্থাৎ গ্রাম-বাংলার সামাজিক বাস্তবতার সঙ্গে আমাদের আধুনিকতার ধারণার কোনও যোগসূত্র আদৌ গড়ে উঠল না। বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে যখন বিভূতিভূষণের আবির্ভাব, তখন তৃতীয় বা চতুর্থ প্রজন্মের হাতে এই আধুনিকতার হস্তান্তর ঘটেছে। মহাযুদ্ধ, অসহযোগ, আন্তর্জাতিক মন্দার পদসঞ্চার ইত্যাদির চাপে ওই আধুনিকতার রং তখন অনেক ফিকে হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যবাদী ও ঐতিহ্যবাদীদের স্বতন্ত্র অবস্থানও তখন আর দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। তবু সমাজদেহে দুটো ধারারই অস্তিত্ব অন্তর্লীন ছিল। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারেই বিপর্যয়ের সময়ে অস্তিত্বের সরব ঘোষণা অনিবার্য হয়ে পড়ে। বিপন্ন আধুনিকতার পুনরুদ্ধারের দায়টা সমসাময়িক পাশ্চাত্যবাদীরা তাই হাতে তুলে নিলেন। বুদ্ধদেব বসুর "অতি আধুনিক বাংলা সাহিত্য" শীর্ষক আলোচনাটি ১৯২৭ সালে রচিত। উদ্ধৃতি বাদ দিলে তার আয়তন হবে ছয় পৃষ্ঠার মতো। ওইটুকু রচনার মধ্যে যে-পরিমাণ ইংরেজি শব্দ এবং যত পাশ্চাত্য লেখক ও তাঁদের সাহিত্যকৃতির উল্লেখ রয়েছে, তাতে তাঁর তৎকালীন প্রেরণার উৎস নির্ণয়ে কোনও অসুবিধা হয় না। ঐতিহ্যবাদীরা ততদিনে অনেক বেশি আত্মস্থ, স্বদেশী ও অসহযোগ তাঁদের আত্মবিশ্বাস ও সামাজিক উপযোগিতা অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে। তদুপরি পাশ্চাত্য মানবিক জ্ঞানের চর্চায় তাঁরা অনেকেই পাশ্চাত্যবাদীদেরও ছাড়িয়ে গেছেন। তবু কারণে-অকারণে বেদ-উপনিষদের উদ্ধৃতি দেখে তাঁদের আনুগত্য নিরূপণও কঠিন হয় না।

পাশ্চাত্যবাদীরা বিভূতিভূষণকে অপাংক্তেয় বিবেচনা করলেন, তিনি আশ্রয় পেলেন ঐতিহ্যবাদীদের কাছে। ফল হল এই যে, বিভূতিভূষণ "দাও ফিরে সে অরণ্য, লহ এ নগর"-এর প্রতীক হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি প্রকৃতিপ্রেমিক ছিলেন, পল্লীপ্রেমিক ছিলেন, সবই সত্যি, কিন্তু এও সত্যি যে তিনি শুধুমাত্র সেটুকুই ছিলেন না। অথচ গুণগ্রাহীদের একটি বিশেষ

দৃষ্টিভঙ্গির দরুন তাঁর রচনার সার্বিক অখণ্ডতা ঢাকা পড়ে গেল। খণ্ড পরিচয়েই তিনি পরিচিত হলেন। আমাদের নাগরিক এলিট শ্রেণি গ্রামজীবনের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন করার বিনিময়েই নিজেদের বিশিষ্ট পরিচিতি ও অবস্থানটি অর্জন করেছেন। সেই বিচ্ছিন্নতা থেকেই এসেছে দৃষ্টিভঙ্গির এই অসম্পূর্ণতা। পল্লীকে তাঁরা দেখেন ট্যুরিস্টের চোখে। তার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে তাঁরা আবিষ্কার ও অবলোকন করেন। বিভূতিভূষণের মতো গাইড পেয়ে তাঁরা উৎফুল্ল বোধ করবেন, এটাই স্বাভাবিক। লক্ষণীয় যে, বহু বৎসর পর (১৯৪৮) বুদ্ধদেব বসু যখন "পথের পাঁচালী" সম্পর্কে অন্তত তাঁর মত পরিবর্তন করেন, তখনও তিনি প্রকৃতি আর গ্রামীণ সরলতার (innocence) কথাই বলেন। গ্রামে যে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষও রয়েছে, তারা যে শুধুমাত্র প্রকৃতির দুলালই নয়, সমাজ, সংসার, দুঃখদারিদ্র্য, সংঘাত-দ্বন্দ্ব সবকিছুরই যে তারা শরিক, এটা তাঁরা দেখেন না, বিভূতিভূষণ দেখিয়ে দিলেও নয়। এমন যদি চোখ সরানো না যায়, তখন তাঁরা বলবেন যে, এ সমস্ত না থাকাই সঙ্গত ছিল।

।।তিন।।

ঠিক এই কথাই বলেছেন প্রমথনাথ বিশী, যাঁকে আমরা ঐতিহ্যবাদী তথা বিভূতিভূষণের গুণগ্রাহীদের মধ্যে প্রতিনিধিস্থানীয় বলে ধরে নিতে পারি। প্রমথনাথের মতে ঃ *"আমার কেমন যেন বিশ্বাস 'বল্লালী-বালাই' ও 'অক্রুর সংবাদ' পথের পাঁচালীর অনিবার্য অংশ নয়, ... তাই ওই আদি ও অন্তটুকু অর্থাৎ 'বল্লালী-বালাই' ও 'অক্রুর সংবাদ' ছেঁটে ফেললে পথের পাঁচালীর রসহানি হয়, এমন মনে হয় না।"* প্রমথনাথের আরো দুটো বক্তব্যও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথমত, তাঁর বিবেচনায় শুধু অপু নয়, হরিহর, সর্বজয়া এরা সবাই চিরশিশু এবং নাবালক। দ্বিতীয়ত, "পথের পাঁচালী"র জগতে প্রবেশ করলে "দারিদ্র্য নামক ভয়াবহ জীবটা বন্ধু হয়ে পড়ে", তার স্বভাব ভুলে যায়। অর্থাৎ, গ্রামীণ দারিদ্র্যের উপর বিভূতিভূষণ মোহময় আবরণ বিছিয়েছেন। —এই যে রসবিচার, একে প্রমথনাথের একান্ত ব্যক্তিগত অভিমত ভাবলে ভুল হবে। এটাই হচ্ছে "পথের পাঁচালী" সম্পর্কে বাঙালি এলিট সমাজের সংহত ভাবনার নির্যাস। বেচারা বিভূতিভূষণ! তিনি বা তাঁর রচনার জগৎ যে অতটা সরল নয়, সেটা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কার করতে হয় বিদেশীকে ঃ *... but the book is so well written that to the layman Mr. Banerjee cannot have been that simple.*

যাই হোক, "পথের পাঁচালী"র পর্যায়বিভাগের কথায় আসি। "পথের পাঁচালী" একটি পরিকল্পিত উপন্যাস। তার একটি প্রতিপাদ্য রয়েছে, সেই প্রতিপাদ্যের পেছনে রয়েছে উপলব্ধি। ল্যাজমুড়ো কেটে ফেললে তা দাঁড়ায় না। শিশু অপুর বড় হওয়ার কাহিনি লেখক বলতে চান, কিন্তু এই শিশু ভুঁইফোড় নয়, সে কিছু উত্তরাধিকার নিয়ে জন্মেছে, তার কিছুটা সামাজিক, কিছুটা পারিবারিক। যে গ্রামে সে জন্মেছে, তারও একটা ইতিহাস রয়েছে। ইন্দিরা ঠাকরুন সেই সামাজিক, পারিবারিক ও গ্রামীণ ইতিহাসের প্রতিভূও বটে, সাক্ষীও বটে। এই উত্তরাধিকারের প্রায় পুরোটাই নেতিবাচক—সেখান থেকেই অপুর যাত্রারম্ভ। গ্রাম-বাংলার এই সর্বস্ব খোয়ানো রূপটি বড় অস্বস্তিকর। কারণ, ছায়া সুনিবিড় শান্তির নীড়ের যে সযত্ন-লালিত ধারণা এই এলিট শ্রেণিকে নিরুদ্বেগে রাখে, তার সঙ্গে এর মিল নেই। স্বপ্নের নিশ্চিন্দিপুরকে বাস্তবের স্পর্শে কলুষিত করছে যে-বল্লালী বালাই, তার নির্বাসনদণ্ডই প্রাপ্য। চিরন্তন গ্রামের কোলে চিরন্তর শিশু অনাদিকাল ধরে মোহমুগ্ধ স্বপ্ন নিয়ে খেলা করবে—এলিটভোগ্য এই বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য বিভূতিভূষণ কলম ধরেননি। তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী "অক্রুর সংবাদ" ও তাই অনিবার্যভাবেই এসেছে। বৃন্দাবনের কৃষ্ণের কাছে মথুরার

আহ্বান পৌঁছে দেওয়ার যে পৌরাণিক ধ্যান, নাগরিক বাঙালির কাছে তার কোনও প্রাসঙ্গিকতা নেই। কিপলিঙীয় দ্বৈতবাদের এদেশীয় সংস্করণ হচ্ছে গ্রাম গ্রামই থাকবে, শহর থাকবে শহর, দুই-এর মধ্যে দেওয়া-নেওয়া নৈব নৈব চ। বিভূতিভূষণের ধ্যান অন্যরকম। তাঁর অপু বিশ্বনাগরিক হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে এ-দেশীয় সংস্করণ হচ্ছে নাগরিক হওয়াটা তার জন্য জরুরি। খোলস ভেঙে বেরিয়ে আসার এই কাজটা সহজ নয়, অপুর পক্ষেও সহজ হয়নি। ভেতরে ও বাইরে দুদিকেই বাধা। ভেতরের বাধার একটি হচ্ছে হরিহরের আর্থ-সামাজিক অবস্থান—এই পিতৃপরিচয় নিয়ে নাগরিক সমাজে দাঁড়ানো যায় না। কাশীর বালক বন্ধুদের কাছে পর্যন্ত অপুকে তার পিতৃপরিচয় গোপন করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় বাধা মায়ের স্নেহ, যা তার চিরন্তন আশ্রয়ও বটে। আবার বাঁধনছেড়ার লগ্নে তা প্রতিবন্ধকও বটে। মায়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে তাই অপুর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল *"একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস।"* পরে সচেতন প্রয়াসে এই মনোভাবকে সে হটিয়ে দিয়েছে — *"তবু ইহা সত্য— সত্য — তাহাকে উড়াইয়া দেওয়ার উপায় নাই।"* মনের গহনের জটিল এই ক্রিয়া-প্রক্রিয়া অভিজ্ঞ শল্য চিকিৎসকের ছুরি দিয়ে বিভূতিভূষণ অবলীলায় তুলে নিয়ে এসেছেন। এই সমস্ত বর্ণনায় তাঁর গদ্য সাদামাটা, স্পষ্ট, নিরলংকার—স্বপ্ন, মায়া, মোহ কিছু নেই। পিতা, মাতা ও পুত্রের ত্রিভুজ সম্পর্কের যে সূক্ষ্ম জটিলতা অবচেতনে থাকে, তাকে যে লেখক অনায়াস দক্ষতায় পাঠকের সামনে বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরতে পারেন, সেই লেখকও নিতান্ত সরল নন, যে-চরিত্রের মাধ্যমে সেই রহস্য উন্মোচিত হয়, সেই চরিত্রও নিতান্ত নাবালক নয়। বাইরের বাধাটা এসেছে নাগরিক সমাজ থেকে। আত্মপরায়ণ সঙ্কীর্ণ যে-ছকটি এ-দেশীয় নাগরিক সমাজ উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জন করেছেন এবং সর্বপ্রযত্নে প্রতিপালন করছেন, এই প্রতিরোধ তার অনিবার্য অনুষঙ্গ গণ্ডির বাইরের কারো সেখানে সহজ প্রবেশাধিকার থাকে না। শতবর্ষের ব্যবধানে ঠেলাঠেলি করে অনেকেই সেখানে ঢুকে পড়েছে বটে, কিন্তু তাতে আবার সীমানারক্ষীদের সতর্কতা ও সচেতনতা দুই-ই বেড়ে গেছে। এই নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে অপুর লেনদেনটা কোনোদিনই স্বস্তিকর বা প্রীতিকর হয়নি। হওয়ার কথাও নয়। ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই ছোট এ তরী তন্ত্র সাধনার প্রথম পর্যায়ে ডাকিনী-যোগিনীরা ভয় দেখায়। অপুর নাগরিক-সাধনার উষালগ্নে বড়বাবুর বেত্রদণ্ড ছিল সেই ডাকিনী-বিদ্যার প্রয়োগ। "অক্রূর সংবাদ"-এর সমাপ্তিও এখানে। ওই বাধা জয় করে এবং এ-থেকে রসদ সংগ্রহ করেই অপুর পথ চলা শুরু হয়। এই পর্যায় বাদ দিলে "পথের পাঁচালী"র পথটাই নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত।

"অক্রূর সংবাদ" একাধারে "পথের পাঁচালী"র সমাপ্তিপর্ব, আবার "অপরাজিত"র সঙ্গে তার যোগসূত্রও। অক্রূর সংবাদে শুধু বড়বাবুই ছিলেন না, লীলাও ছিল। অপুর ধারণা ছিল লীলাই কলকাতার প্রতিভূ। কারণ সেখানে রয়েছে "জীবন, আলো, পুষ্টি, প্রসারতা"। বহু তিক্ততার মধ্য দিয়ে তাকে আবিষ্কার করতে হল যে, কলকাতায় লীলা আসলে বন্দিনী। এ শহর আসলে হীরক সেনদের—যাঁরা বড়বাবুরই সমধর্মী — অনধিকার অনুপ্রবেশকারীর জন্য এখানে কথার চাবুক বরাদ্দ। নাগরিক সমালোচকরা অপুর কলকাতার অভিজ্ঞতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তারাপদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন ঃ *"কলকাতায় যে ব্যাপারটি সম্পর্কে অপু সর্বাপেক্ষা বেশি সচেতন এবং যে-ব্যাপারটি তাকে সর্বাপেক্ষা বেশি পীড়িত করেছে তা হলো অন্নকষ্ট। ক্ষুধা ও ক্ষুন্নিবৃত্তির চিন্তা লেখক এবং অপু দুজনকেই বড় বেশিরকম উদ্‌ভ্রান্ত করেছে।"* অতঃপর নিশ্চিন্দিপুরের "মুগ্ধ বালকটিকে" "কলকাতার খাঁচায় ছাতু খাইয়ে হত্যা" করার

জন্য অপু ও অপুর স্রষ্টার জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। সুপণ্ডিত সমালোচকের এই মন্তব্য, বিশেষত তার তির্যক ব্যঞ্জনাটুকু, একটু বিস্ময়কর ঠেকে বৈকি! ক্ষুন্নিবৃত্তির চিন্তা যার বাস্তবিকই রয়েছে, তার পক্ষে উদ্‌ভ্রান্ত হওয়াটা কি সত্যিই আপত্তিকর? আর-ছাতু যাই হোক মনুষ্যখাদ্য, অনশনের মোকাবিলা মানুষ আরো অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়েও করে। লক্ষণীয় যে, সমালোচক এখানে অপু এবং তার স্রষ্টা উভয়ের জন্যই দুঃখিত হয়েছেন। একই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুও লেখককে টেনেছেন ঃ *The boy-hero Apu grows up and comes to Calcutta where he is as much lost as his author.* এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, অপুর কলকাতার জীবনকে বিভূতিভূষণ যে রূঢ় বাস্তবতার উপর দাঁড় করিয়েছেন, তা নাগরিক সমালোচকদের অপ্রসন্ন করেছে। নইলে এই দারিদ্র্য বর্ণনার মধ্যে যে-শিল্পগত উৎকর্ষ রয়েছে, তা তাঁদের চোখ এড়াতো না। কাপড় কাচতে গেলে অপুর ক্ষুধা বেড়ে যেত, অথচ তা মেটানোর ক্ষমতা তার ছিল না — অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার উপর এই মর্মান্তিক বৈপরীত্য আরোপ অতি কুশলী শিল্পী ছাড়া সম্ভব নয়। এমন দৃষ্টান্ত আরও অনেক রয়েছে। সেগুলোর অনুসন্ধান ও আবিষ্কার সম্ভব হয় না এই কারণে যে বাঙালির নাগরিক আধুনিকতার প্রকল্পের সঙ্গে কলকাতার প্রতি আনুগত্য মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। সে পূর্বশর্ত প্রতিপালিত না-হলে বাকি আর কিছু বিবেচনাযোগ্য বলেই মনে করা হয় না। সবসময় যে তা সচেতন অবজ্ঞার প্রকাশ তা নয়, আত্মস্থকরণের দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় তা অবচেতন প্রতিরোধে দাঁড়িয়ে গেছে। এটা সত্যি যে অপুর অভিজ্ঞতার মধ্যে বিভূতিভূষণের ছাত্রজীবনের উপলব্ধির নির্যাসটুকু রয়েছে। অপু বা বিভূতিভূষণ কেউ-ই কলকাতার জীবনকে আপন করে নিতে পারেননি। কলকাতাই কি তাঁদের গ্রহণ করেছে? নামধাম হওয়ার পর অপু বড় বড় বাড়িতে নেমন্তন্ন পেত, বিভূতিভূষণও পেয়েছেন। কিন্তু সেই সমাজে তিনি গৃহীত হয়েছিলেন কি না, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সুনীতিকুমার অত্যন্ত সহৃদয় স্মৃতিচারণেও একথা উল্লেখ না-করে পারেননি যে, বিভূতিভূষণ মাঝে-মধ্যে বোকার মতো আচরণ করতেন এবং *"এতে করে নিজেকে মাঝে-মধ্যে খেলো করে ফেলতেন।"* নীরদ চৌধুরীর স্ত্রী অমিয়া চৌধুরানীও স্বামীর এই বন্ধুটি সম্পর্কে লিখেছেন ঃ *"তাঁর নানারকম ছেলেমানুষি করার জন্য মাঝে-মাঝে আমার স্বামী ভয়ঙ্কর ধমক দিতেন।"* আসলে এদেশীয় নাগরিকতার ধারণার সঙ্গে বিভূতিভূষণের মানসিকতার একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব ছিল এবং সাহিত্য বা জীবনপর্যায় কোথাও তিনি এই ব্যাপারে আপস করেননি। ফলে নাগরিক সমাজ তাঁকে গ্রাম জীবনের রূপকার হিসাবে স্বীকৃতি দিলেন, কিন্তু তাঁর নগরজীবনের সত্য-উপলব্ধিকে অনধিকার-চর্চা বলে মনে করলেন। "অক্রূর সংবাদ" বা তারই সম্প্রসারণ "অপরাজিত"কে তাই মাঝে-মধ্যেই আসামীর কাঠগড়ায় তোলা হয়।

বিচার বিভ্রাটের এই ডামাডোলে বিভূতিভূষণের সাহিত্য-কর্মের আরেকটি দিক প্রায় অনালোচিতই রয়ে গেছে। অপুর কাহিনি লিখতে গিয়ে পাশাপাশি বাংলার সামাজিক বাস্তবতার ধারাবাহিকতাকে বিভূতিভূষণ স্পর্শ করতে চেয়েছেন। "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"র কাঠামো তৈরি হয়েছে ওই উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে—ব্যক্তিমানুষ এবং সামাজিক ধারাবাহিকতাকে একই ক্যানভাসে ধরার পক্ষে এই ছকটির উপযোগিতা স্বীকার্য। এরিক এরিকসনের ভাষায় ঃ

We cannot even begin to encompass a human being without indicating for each stages of his life cycle the framework of social influences and of traditional institutions which determine his perspectives on his more infantile past and on his more adult future.

পারিপার্শ্বিক ও সমাজের চলমান প্রবাহের মধ্যে নিজ কাহিনিকে সংস্থাপিত করার এই প্রবণতা বিভূতিভূষণের পরবর্তী রচনার মধ্যেও রয়েছে। এই ক্ষেত্রে কার্যকর ছিল তাঁর সুতীব্র ইতিহাস-চেতনা। বিভূতি-চর্চায় এই দিকটি উপেক্ষিত থেকে গেছে; কারণ, এস এন গাঙ্গুলি যাকে বলেছেন,"*the lack of historicity in the behaviour of the elite class of India*"। দেশজ ইতিহাসের অনিবার্য ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এই শ্রেণির উদ্ভব হয়নি। অতএব ইতিহাস-চেতনা এদের অনধিগম্য। বিভূতিভূষণের অবস্থান যেহেতু ছিল এই সমাজের বাইরে, তাই স্বোপার্জিত ইতিহাস-চেতনা তাঁর সৃষ্টিকর্মের পেছনে সতত সক্রিয় ছিল। এবং সে যুগের মানদণ্ডে তাঁর সেই চেতনার স্বরূপ ছিল আশ্চর্যরকমের জীবনধর্মী। রোম সাম্রাজ্যের পতনের ইতিহাস নিয়ে লেখা গিবনের বইটি বিশ্ববিশ্রুত, কিন্তু অপুর তা পছন্দ হয়নি। তবে কার ইতিহাস, কোন ইতিহাস অপু চাইছিল? অপুর জবানিতেই তার উত্তর পাচ্ছি ঃ

"মানুষের সভ্যতার ইতিহাস কোথায় লেখা আছে? জগতের বড় ঐতিহাসিকদের অনেকেই যুদ্ধবিগ্রহ ও রাজনৈতিক বিপ্লবের ঝাঁঝে, সম্রাট, সম্রাজ্ঞী, মন্ত্রীদের সোনালী পোষাকের জাঁকজমকে দরিদ্র কৃষকের, দরিদ্র গৃহস্থের কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। পথের ধারের আমগাছে তাহাদের পুঁটলিবাঁধা ছাতু কখন ফুরাইয়া গেল, সন্ধ্যায় ঘোড়ার হাট হইতে ঘোড়া কিনিয়া আনিয়া পল্লীর কোন মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের ছেলে তাহার মায়ের মনে কোথায় আনন্দের ঢেউ তুলিয়াছিল, দু'হাজার বছরের ইতিহাসে সে-সব কথা লেখা নাই—থাকিলেও বড় কম— রাজা যযাতি কী সম্রাট অশোকের শুধু রাজনৈতিক জীবনের গল্প শৈশব হইতে সবাই মুখস্থ করে — কিন্তু ভারতবর্ষের, গ্রীসের, রোমের যব, গম ক্ষেতের ধারে, ওলিভ, বন্যদ্রাক্ষা, মার্টলঝোপের ছায়ায় ছায়ায় যে প্রতিদিনের জীবন, হাজার হাজার বছর ধরিয়া প্রতি সকাল সন্ধ্যায় যাপিত হইয়াছে — তাহাদের সুখ-দুঃখ আশা-নিরাশার গল্প, তাহাদের বুকের স্পন্দনের ইতিহাস সে জানিতে চায়।" বহুদিন পর "বাঙালীর ইতিহাস" লিখতে গিয়ে ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায় এই ইতিহাসই খুঁজেছেন ঃ *" কিন্তু সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর যে অগণিত জনসাধারণ, তাহাদের বা তাহাদের আশ্রয়ে রচিত কোনো উপাদান আমরা পাই না কেন? চণ্ডাল পর্যন্ত যে অকীর্তিত জনসাধারণ, তাঁহাদের কথা না-ই বলিলাম, কিন্তু শিল্পী, মানব-ব্যাপারী-বণিক-ক্ষেত্রকর প্রভৃতি সম্প্রদায় রাজসভা বা ধর্মগোষ্ঠী কর্তৃক কীর্তিত বা কীর্তনযোগ্য বিবেচিত না-হইলেও, ইহাদের সকলের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখের, জীবন সমস্যার, নিজের বৃত্তি সম্পৃক্ত নানা প্রশ্নের এবং সাফল্য-অসাফল্যের প্রকাশ ও পরিচয় তদানীন্তন বাঙালী সমাজের মধ্যে কোথাও-না-কোথাও ছিলই। কিন্তু তাহা কোথাও লিপিবদ্ধ হইয়া থাকে নাই।"* অথচ, নীহাররঞ্জন বলছেন, *"ইহাদের সকলের কথা লইয়া তবে বাঙালীর কথা, বাঙালীর ইতিহাসের কথা।"* এই ইতিহাসই অপু জানতে চায় এবং তার এই আগ্রহ একান্ত অ্যাকাডেমিক নয়। অপুর এই জিজ্ঞাসা আত্মজিজ্ঞাসা—*'কোন এক দরিদ্র ঘরের ছোট ছেলের কাহিনী পড়িতে বড় ইচ্ছা যায়, সংসারের সুখ-দুঃখের সঙ্গে যুদ্ধ— তাহাদের জীবনের অতি ঘনিষ্ট ধরনের সংবাদ জানিতে মন যায়।"* স্পষ্টতই অপু ইতিহাসের প্রেক্ষিতে নিজেকে আবিষ্কার করতে চায়। মনে হয় অপুর স্রষ্টা এই অন্বেষণে সিদ্ধিলাভ করেছিলেন। তাঁর ইতিহাস বীক্ষণ অতীত ও বর্তমানের অনেক অন্তর্লীন ঐতিহাসিক সত্যকে অনায়াসে স্পর্শ করেছে— বিবর্তনপ্রবাহের মধ্যে লুক্কায়িত অতীতের ব্যর্থতা বা ভবিষ্যতের সম্ভাবনাও তাঁর নজর এড়িয়ে যায়নি। অপুর শৈশবের স্বপ্ন ছিল সে পোতোপ্লাতায় সোন খুঁজতে যাবে। নিতান্তই রোমান্টিক কল্পনা। কিন্তু বড় হয়েও অপু বহু নাবিক ও তাদের জলযাত্রার বৃত্তান্ত, দুর্ধর্ষ স্প্যানিশদের

দেশ আবিষ্কারের গল্প, সোনা রুপোর সন্ধানের বিবরণ পড়েছে। ইউরোপের সমৃদ্ধির ভিত্তি যে তার বাণিজ্যিক যুগ, সেই উপলব্ধি এর পেছনে রয়েছে। রত্ন সন্ধানের এই মোটিফটি বিভূতিভূষণ আবার ফিরিয়ে এনেছেন "চাঁদের পাহাড়" ও "হীরা মানিক জ্বলে"তে। বাংলার শ্যামল প্রান্তরে রেল লাইনের বিস্তার ও কদাকার যন্ত্র দানবের বিবরণ প্রকৃতির দুলাল অপু-দুর্গার কাছে উপদ্রব বলে ঠেকবে—এটাই সম্ভাব্য ছিল। কিন্তু ঘটেছে তার বিপরীত — রেলগাড়ি দেখার অপূর্ণ স্বপ্ন মৃত্যুর অল্প আগেও দুর্গাকে বিভোর রেখেছিল। আর অপুর কাছে প্রথম রেলগাড়ি দর্শনটা ছিল এক পরম স্মরণীয় ঘটনা। নূতন যুগের নূতন ইতিহাসের এই প্রতিভূকে গ্রাম-বাংলার বালক-বালিকা ঠিকই চিনতে পেরেছিল। আর অপুর বন্ধু প্রণব যে অ্যানার্কিস্ট থেকে অসহযোগ আন্দোলনের পথ বেয়ে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিজমে গিয়ে পৌঁছল সেই ১৯৩১ সালেই, এটাও আপতিক নয়। যুগচেতনার অভ্রান্ত স্বাক্ষর রয়েছে তাতে। এমনতরো ইঙ্গিত অন্য বইগুলোতেও অনেক রয়েছে। "ইছামতী"র কথা বাদ দিচ্ছি। ওটা তো উনিশ শতকের গ্রাম বাংলার ইতিহাসই। একান্তই প্রকৃতি প্রেমের মুখর বিবরণ হিসাবে চিহ্নিত যে "আরণ্যক" — তার কথা একটু উল্লেখ করতেই হয়। অতীত ইতিহাসের নেতিবাচক উত্তরাধিকার এবং ভাবীকালের সঙ্কটের ইঙ্গিত এই দুই-ই কিন্তু "আরণ্যক"-এ রয়েছে। সাওতাল নায়ক দোবরু পান্নার আবাসে গিয়ে সত্যচরণের মনে হয় ঃ *"আজও বিজিত আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। সভ্যতা-দর্পী আর্যগণ তাহাদের দিকে কখনও ফিরিয়া চাহে নাই, তাহাদের সভ্যতা বুঝিবার চেষ্টা করে নাই, আজও করে না। আমি বানোয়ারী, সেই বিজয়ী আর্য জাতির প্রতিনিধি। বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী ভানুমতী সেই বিজিত, পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি ওই সন্ধ্যায় অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি, ... ইতিহাসের এই বিরাট ট্র্যাজেডি যেন আমার সম্মুখে সেই সন্ধ্যায় অভিনীত হইল। ..."* প্রাচীন এই ট্র্যাজেডির পাশাপাশি নূতন সঙ্কটের বার্তাও রয়েছে। *"... সর্বে পাকিবার কিছু দিন আগে ছট্টু সিং নিজের দেশ হইতে বহু রাজপুত লাঠিয়াল ও সড়কিওয়ালা গোপনে আনিয়া রাখিয়াছিল, তাহার আসল উদ্দেশ্য এবার বোঝা যাইতেছে। নিজের তিন চারশ বিঘা ফসল বাদে সে লাঠির জোরে সমস্ত নাঢ়া বই হারের দেড় হাজার বিঘা (বা যতটা পারে) জমির ফসল দখল করতে চায়। কাছারির আমলারা বলিল — এদেশের এই নিয়ম হুজুর, লাঠি যার, ফসল তার। যাহাদের লাঠির জোর নাই, তাহারা আসিয়া আমার কাছে কাঁদিয়া পড়িল।"* আজ বিহারের ঝাড়খণ্ড আন্দোলন এবং রাজপুত-চাষী সংঘর্ষ নিত্যদিনের সংবাদ-শিরোনাম। বনানীর অন্তরালে আশ্রিত এই দুটি ক্ষতকে অর্ধশতাব্দী আগেই বিভূতিভূষণ চিহ্নিত করেছিলেন।

বিভূতিভূষণ ঐতিহাসিক ছিলেন না। বিভিন্ন রচনায় তাঁর ইতিহাস-চিন্তার ফসল যা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, তার সবই হয়তো ধোপে টিকবে না, টেকার কথাও নয়। বলার কথা এইটুকু যে সৃজনশীল সাহিত্যকর্মের পেছনে তিনি ইতিহাস-চিন্তাকে সচেতনভাবে সক্রিয় রেখেছিলেন। এর উৎস ছিল তাঁর সুগভীর মানবপ্রেম। ক্ষুদ্র মানুষের তুচ্ছ ইতিহাসের জন্য তাই তাঁর এত আগ্রহ। অপুর জবানিতে পাই, *" তাহার মনে হইল বড় সাহিত্যের প্রেরণার মূলে এই মানববেদনা। ১৮৮৩ সাল পর্যন্ত রাশিয়ার প্রজাস্বত্ব আইন, সার্ফনীতি, জার-শাসিত রাশিয়ার সাইবেরিয়া, শীত, অত্যাচার, কুসংস্কার, দারিদ্র্য-গোগল, ডষ্টয়ভস্কি, গোর্কি, টলস্টয় ও শেকভের সাহিত্য সম্ভব করিয়াছে।"* অথবা *"কাদের কথা বইয়ে লেখা থাকিবে? কত লোকের কথা, গরীবদের কথা। ওদের কথা ছাড়া লিখিতে ইচ্ছা হয় না।"* পটভূমিতে ইতিহাসকে

রেখে যে-লেখক মানুষের কথা, গরিবের কথা বলতে চান, সমাজ-বাস্তবতার নিবারণতাকে তাঁর এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই। সেক্ষেত্রে, আধ্যাত্মিকতা বা অন্য কিছুর আরোপণ যদি দারিদ্র্যকে একটা সুস্থ অভিজ্ঞতায় রূপান্তরিত করে, তবে তাকে একটা বড় রকমের সাহিত্যিক বিচ্যুতি বলেই ধরতে হবে। বিভূতিভূষণের দারিদ্র্য-বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশী প্রশংসার ছলেই যা বলেছেন, তা যথার্থ হলে বিভূতিভূষণ কিন্তু সেই বিচ্যুতির দায়েই পড়েছেন। প্রমথনাথের এই বিচার যে যুক্তিসঙ্গত নয়, সে-কথাটা তাই বলা প্রয়োজন। আসলে দারিদ্র্য বর্ণনা, শুধু দারিদ্র্য বর্ণনা কেন, যে কোনও দুঃখ বর্ণনায় বিভূতিভূষণ প্রথাগত পথে চলেননি। ব্যক্তিগত কাঁদুনির ব্যাখ্যা তিনি বরাবরই সযত্নে পরিহার করেছেন। তাঁর মুখ্য অন্বিষ্ট যেহেতু ছিল সমাজ-বাস্তবতার রূপায়ণ, অতএব দারিদ্র্যের নিষ্পেষণকে তুলে ধরেছেন প্রতিবেশের সঙ্গে সংশ্লেষের প্রেক্ষিতে। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা স্পষ্ট হবে। অপু-দুর্গা নিজেদের সঙ্গতিহীনতার জন্য মুড়কি-সন্দেশ কিনে খেতে পারে না, চিনিবাস ময়রার পিছু পিছু তারা গেছে ভুবন মুখুজ্যের বাড়ি। ও বাড়ির সেজবৌ নিজের ছেলে মেয়েদের খাবার কিনে দিয়েছেন, আর কৌতূহলী অপু-দুর্গাকে সামনে দেখে নিজের ছেলেকে ধমক দিয়ে বলেছেন,"যাও না, রোয়াকে উঠে গিয়ে খাও না।" অথবা সর্বজয়া অনশনের তাড়নায় সখের বৃন্দাবনী চাদর খানা বিক্রি করে চাল নেবে নিবারণের মায়ের থেকে — কিন্তু সত্য কথা, অভাবের কথা সরাসরি না বলে বলেছে; *"বিষ্টির জন্যে বাজার থেকে চাল আনাবার লোক পাচ্ছি না — টাকা নিয়ে বেড়াচ্ছি —,তা যদি কেউ রাজি হয়।"* কিংবা কলেজের ক্লাস পালাতে পারলে খাওয়াবে বলে অপু সহপাঠীরা বাজি ধরল। অপু ক্লাস পালাল, এসে দেখল বন্ধুরা নেই, চলে গেছে। সেই সময়ে অপুর আশাহত বেদনা — *"ওরা আচ্ছা তো? বলল খাওয়াবো, তাই তো আমি ক্লাস পালাতে গেলাম, নিজেরা এদিকে সরে পড়েছে কোনকালে।"* বন্ধুদের কাছে ক্লাস পালানোর মজাটাই মুখ্য ছিল। আর অপু সেটাকে নিয়েছিল খিদে মেটানোর উপায় হিসাবে। বন্ধুগোষ্ঠী আর অপুর অবস্থান তো এক নয়।

প্রমথনাথের বিবেচনায় "পথের পাঁচালী"র চরিত্রগুলো *"চিরশৈশবে অমরলোকে বিরাজমান"*। কারণ, তাঁর মতে, *"চিরশিশুর রাজ্যে আবার দুঃখ-সুখ অভাব-অনটন কোথায়?"* দৃষ্টান্ত হিসাবে দুর্গার মৃত্যুর উল্লেখ করেছেন, যা *"একটিমাত্র ছত্রে প্রদত্ত হয়েছে"*। সত্যিই বিচারবিভ্রাটের এমন দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। প্রথমত, দুর্গার মৃত্যুর প্রস্তুতি-পর্বটি বেশ বিশদভাবেই বর্ণিত হয়েছে উপন্যাসে। উৎকণ্ঠা, আতঙ্ক, অসহায়তার যে-মর্মভেদী বিবরণ সেখানে লিপিবদ্ধ, তাকে অমরলোকের আনন্দযজ্ঞের প্রস্তুতি বলে মনে করা সুকঠিন। আর দুর্গার মৃত্যু বর্ণনার ওই একটি ছত্রের পর ছোট্ট একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। সেখানে শরৎ ডাক্তার বলছেন ঃ *"ম্যালেরিয়ার শেষ ষ্টেজটা আর কি? ... ঠিক এরকম একটা Case সেদিন হয়ে গেল দশঘরায় ...।"* এটাই আসল মৃত্যুবর্ণনা। যে-ট্র্যাজেডি হরিহরের সংসারের ভিত নাড়িয়ে দিল — অন্যদের দৃষ্টিতে তা তৎক্ষণাৎ-ই পরিণত হলো একটি Case-এ, বর্ণনাযোগ্য একটি ঘটনায়। সমাজের বুকে তার অন্য কোনও অনুরণন আর রইল না দুঃখ-শোক-দারিদ্র্য বর্ণনার এই ভঙ্গিটি বিভূতিভূষণের একান্তই নিজস্ব — এবং এটা তাঁকে আবিষ্কার করতে হয়েছে। এই ধরনের বর্ণনার মধ্যে যে উচ্ছ্বাসহীন সংযম রয়েছে, তা আসলে বৈপরীত্যের উপস্থাপন দ্বারা অভিঘাতের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রয়োজনে ব্যবহৃত। বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতিতে ব্যক্তির বেদনার সামাজিক প্রকাশকে পরিস্ফুট করার জন্য এটা বিভূতিভূষণের এক বিশেষ ধরনের শিল্পকৌশল। সমালোচকদের ভ্রান্তিবিলাস একে ঠেলে দিয়েছে বৈদান্তিক নৈর্ব্যক্তিকতার

পর্যায়ে — হৃদয়বান শিল্পীর নির্বিকল্প সমাধির ব্যবস্থা তাতে পাকাপোক্ত হয়েছে। প্রকৃতিপ্রেমের সঙ্গে আরোপিত এই দার্শনিকতার অনুমান মিশিয়ে গুণগ্রাহীরা বিভূতিভূষণের যে-ইমেজটি গড়ে তুললেন, তাতে ধূলামলিন এই পৃথিবীর সংশ্রবই আর রইল না। মানুষ, সমাজ, সংসার, দুঃখ, দারিদ্র্যের ঊর্ধ্বে বিভূতিভূষণ সমাসীন হলেন ইন্দ্রিয়াতীত এক স্বর্গলোকে। হুমায়ুন কবীর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রদত্ত এক বক্তৃতামালায় বলেছিলেন ঃ *This obsession (with nature) at times becomes so strong that it leads him to the verge of repudiating human society and culture.* বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকেই এই কথা বলা সম্ভব হলো এই কারণে যে, ততদিনে গড়ে তোলা ওই ইমেজ স্বতঃসিদ্ধের মর্যাদা পেয়ে গেছে।

বাংলার আধুনিকতা বা বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতা—কোনওটারই সংজ্ঞা নিরূপণ আমরা করিনি। শুধু এটুকু বলেছি যে, পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে নব্য বাঙালির আধুনিক হওয়ার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল তার ভিত্তি নড়বড়ে, দৃষ্টি সঙ্কীর্ণ এবং উপাদান পরনির্ভর ছিল। দুর্বল এই উৎস থেকে উঠে এসেছে বলে বাংলা সাহিত্যেও আধুনিকতার ধারণাটা ভাসা ভাসা রয়ে গেছে, সংজ্ঞাবদ্ধ রূপ বা দৃষ্টিগ্রাহ্য অবয়ব পায়নি। এখন আবার পাশ্চাত্য দেশে আধুনিকতার পুরো ব্যাপারটা নিয়ে মৌলিকসব প্রশ্ন উঠেছে — এদেশেও তার অনুরণন চলছে। তবুও ইতিহাসের প্রয়োজনে আধুনিকতার এ-দেশীয় বিশিষ্ট রূপটির একটা সংজ্ঞা নিরূপিত হওয়া প্রয়োজন। কেউ কেউ সে চেষ্টা করছেনও। তাঁদের মোটামুটি প্রতিপাদ্য হচ্ছে শুধু পাশ্চাত্য অনুসারিতা আমাদের আধুনিকতার মৌল লক্ষণ বলে বিচার করাটা ভুল হবে। ঔপনিবেশিক পটভূমিতে দেশজ উৎস থেকে রস সংগ্রহ করে যে চিন্তা-চেতনা এদেশের অতীত ও বর্তমানকে নূতন করে বুঝতে চেয়েছিল, তাই হচ্ছে যথার্থ ভারতীয় আধুনিকতা। এই প্রতিপাদ্য মেনে নিলে বিভূতিভূষণ আধুনিকতার পুরোভাগে এসে যান। বলাই বাহুল্য, সে-দাবি যে অবলীলায় স্বীকৃত হবে এমন নয়। আধুনিকতার যেটুকু আবছা ধারণা বাঙালি সমাজে স্বীকৃত, তার রচয়িতা নাগরিক সমাজ—তাঁরা তার ব্যাখ্যাদাতা, সংরক্ষক ও নিয়ামকও বটে। ছিট মহলের বাসিন্দা এই সমাজ পরিব্যাপ্ত গ্রামীণ জনজীবনের সঙ্গে জন্মলগ্ন থেকেই বিচ্ছিন্ন। শিকড়হীনতার এই উত্তরাধিকার আজও বহমান। তাই তার দৃষ্টি ও উপলব্ধি দুই-ই এই খণ্ডচিন্তা থেকে উৎসারিত। যেহেতু তাঁর উত্তরাধিকার, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সবই স্বতন্ত্র উৎস থেকে আহরিত, তাই তার বিস্তৃতি ও গভীরতা দুই-ই নাগরিক বোদ্ধাদের বিশ্লেষণে অবহেলিত। ইতিহাস-সচেতন, মানবপ্রেমিক, সমাজ বাস্তবতার রূপকার যে-বিভূতিভূষণ—তাঁর পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি এখনও অনাবিষ্কৃত। উন্মোচনের জরুরি সেই কাজে হাত দিলে বঙ্গজ আধুনিকতার সংজ্ঞা ও স্বরূপ হয়তো নূতন করেই নিরূপিত হবে। *(সমযপ্রবাহ)*

■ *লেখক করিমগঞ্জ রবীন্দ্রসদন মহিলা কলেজের ইতিহাস বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক ও ইতিহাসবিদ।*

আধুনিকতা ও বিভূতিভূষণ ঃ গল্প-উপন্যাসের নিরিখে

মাশুক আহমদ

বাংলা উপন্যাস জগতে যে তিন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজস্ব মহিমায় উজ্জ্বল তাঁরা হলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই তিনজনের মধ্যে বিভূতিভূষণ সবচেয়ে কম আধুনিক। মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই আধুনিক উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। অতীত এবং বর্তমানের নিরিখে চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে ইংরেজিতে stream of consciousness technique বলা হয়ে থাকে। বিভূতিভূষণের উপন্যাসে কিন্তু চরিত্রের এই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নেই। প্রকৃতি-প্রেম, অতীত স্মৃতিচারণ ও বহমান কালচেতনা এবং অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিকতাই তাঁর উপন্যাসের প্রধান উপজীব্য। আর সে কারণেই তিনি কম আধুনিক। বিংশ শতাব্দীর তিরিশ-এর দশকের আগে থেকে গল্প-উপন্যাস লেখা শুরু করলেও বিভূতিভূষণকে আমরা কল্লোল-উত্তর যুগের অর্থাৎ তিরিশ-এর দশকের লেখক বলে ধরে নিতে পারি। ১৯২৯ সালে 'পথের পাঁচালী' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর জয়যাত্রা শুরু হয়ে যায়। পূর্বসূরী কল্লোলপন্থীদের অভিজ্ঞতা—বিরল রচনার 'অবাস্তবতা' অতিক্রম করে আসা তিরিশ-এর দশকের কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের স্বদেশ সন্ধানী চেতনায় স্বাভাবিক ভাবেই দেশজ মাটির স্পর্শ লক্ষ করা যায়। 'পথের পাঁচালী' সম্পর্কে অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ রায় যা বলেছেন তার সারসংক্ষেপ হলো 'পথের পাঁচালী' খুব একটা উঁচুমানের উপন্যাস নয়, তবু উপন্যাসটি জনপ্রিয়তা পেয়েছে পরিবেশিত নস্টালজিয়ার জন্যই। জীবন আর জীবিকার তাড়নায় মধ্যবিত্ত বাঙালি যখন সদা শহরমুখীন স্রোতের আবর্তে বিপর্যস্ত হয়ে নিজেকে হারিয়ে দিতে শুরু করেছিল তখন ওই পথের পাঁচালীই নিশ্চিন্দিপুরের বাঙালি পাঠককে মনে করিয়ে দিয়েছিল তার মূলোচ্ছেদের যন্ত্রণার কথা। সাম্প্রতিক কালের অন্যান্য সমালোচকদের মতে বিভূতিভূষণ শুদ্ধ বিস্ময়বোধের কবি, পল্লী-প্রকৃতির কাহিনিকার। পথের পাঁচালীর অপু আমাদেরই বিস্মৃত শৈশব। সারাটা উপন্যাস জুড়ে সেই শিশু চিত্তের বিকাশই চিত্রিত হয়েছে, যা কোনও শিশুই আর কোনওদিনই ফিরে পাবে না। আসলে 'পথের পাঁচালী' এমন একটি শিশুর জীবন কাহিনি যার মুগ্ধ শৈশব কখনওই শেষ হবার নয়। উপন্যাসের শেষ দিকেও দেবতা অপুকে বলেছেন, *"মূর্খ বালক, পথ তো আমার শেষ হয়নি তোমাদের গ্রামের বাঁশের বনে, ঠ্যাঙাড়ে বীরু রায়ের বটতলায়, কি বলছিতের খেয়া ঘাটের সীমানায়।... পথ আমার চলে গেল সামনে সামনে, শুধুই সামনে..., দেশ ছেড়ে দেশান্তরের দিকে, জানার গণ্ডী এড়িয়ে অপরিচয়ের উদ্দেশে। ... সে পথেরই বিচিত্র আনন্দযাত্রার অদৃশ্য তিলক তোমার ললাটে পরিয়েই তো তোমায় ঘরছাড়া করে এনেছি। .....: চল, এগিয়ে যাই।"* বাঁশবন, বটতলা, খেয়া-ঘাট ইত্যাদি নিয়ে একটা নিসর্গচিত্র ফুঁটিয়ে তুলেছেন বিভূতিভূষণ তাঁর এই উপন্যাসে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্যে এই নিসর্গচিত্র প্রায় অনুপস্থিত। নিসর্গ যদিওবা কখনও কখনও উঁকি দেয় তাও আবার মানুষের অস্তিত্বের যন্ত্রণাকে আরও প্রকট করে তুলতে। আধুনিক কবি টি, এস, এলিয়ট-এর কাছে তো সন্ধ্যা ইথার দেওয়া মূর্চ্ছিতা রোগী যে টেবিলের উপর শুয়ে থাকে। কবির কথায়, *"Let us go then, you and I / When the evening is spread out against the sky / Like a patient etherised upon a table."*

আধুনিক সাহিত্যে নিসর্গ বিকারগ্রস্থ। তাই প্রকৃতিপ্রেমিক বিভূতভূষণ আধুনিকতার মাপকাঠির এই নিরিখে বাতিল হয়ে যান। ভাষার জটিলতা, অস্বচ্ছতা, অস্পষ্টতা, আধুনিক সাহিত্যের আরেকটি লক্ষণ। এখানেও বিভূতিভূষণ ব্যর্থ। কাব্যময় লাবণ্যতাই তাঁর ভাষার বৈশিষ্ট্য। তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য-বিষয় নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে কখনও জীবন-জিজ্ঞাসার তীব্রতা উঠে আসে না তাঁর রচনায়। অস্তিত্বের সঙ্কট নিয়ে তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকারা বিব্রতবোধ করেন না। রাজনীতিও যদি আধুনিক সাহিত্যে ঢুকে পড়ে (শরৎচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ তো রাজনৈতিক উপন্যাস লিখেও গেছেন) তা হলে এখানেও বিভূতিভূষণ ব্যর্থ।

বিভূতিভূষণের গল্পগুলি আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যের জন্য সফল হলেও তাঁর উপন্যাসগুলি বিভিন্ন প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। 'অশনি সংকেত' বিভূতিভূষণের একটি শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। শোষণভিত্তিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপস্থাপনাতেই 'অশনি সংকেত' শ্রেষ্ঠতা পেয়েছে। উপন্যাসের নায়ক গঙ্গাচরণ পুরোহিত ব্রাহ্মণ। গ্রাসাচ্ছাদনের তাগিদেই গঙ্গাচরণ পূর্ব-পুরুষের ভিটামাটি ছেড়ে দিয়ে অন্যত্র বসতি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছে। গঙ্গাচরণ তার দিশেহারা স্ত্রীকে বুঝিয়েছে যে এই নতুন জায়গায়ই সে অনুকূল পরিবেশ পাবে। কারণ এখানে প্রতিদ্বন্দ্বী কোনও ব্রাহ্মণ নেই এবং নীচু জাতের গ্রামবাসীদের মধ্যে দেবদ্বিজে অনুষ্ঠানাদিতে বিশ্বাসের খুঁটি খুব শক্ত। শুধু তার কাজ এই শক্ত বিশ্বাসে নির্ভরতার শিকড় গাড়া। তাই সে বলেছে, *"ব্যাটাদের সব দিক থেকে বেঁধে ফেললে কোনো ভাবনা হবে না আমাদের সংসারে।"* বলা হয়, গঙ্গাচরণের কাহিনিতে লেখকের উচিত ছিল জীবিকা চ্যুতির এই দিকটিকে ধরে একেবারে ভিত্তি ভূমিতে চলে যাওয়া যা তিনি করেননি, বরং পেশাগত অনাচারের দিকটি তুলে ধরেই দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করেছেন। এভাবে ঔপন্যাসিকের দায়মুক্তি হয় না। শত বাঁধা বিপত্তি অতিক্রম করেও ডুবন্ত নৌকা থেকে তীরে উঠার প্রাণপণ চেষ্টার একটা চিত্রও ফুটিয়ে তুলতে হয় যা বিভূতিভূষণ করেননি।

নিজের জীবন দর্শনকে তুলে ধরে লেখক উপন্যাসে একটা নতুন মাত্রা যোগ করতে পারেন। কিন্তু তা করতে গিয়ে কালের চেতনাকে যাতে অস্বীকার করা না-হয়, বাস্তবতাকে যাতে অতিক্রম করা না-হয় এবং সর্বোপরি নায়ক-নায়িকার মানসিক ধৈর্যকে যাতে জলাঞ্জলি দেওয়া না-হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে। আর এই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির অভাবেই 'অপরাজিত'-র বিপুল আয়োজন ব্যর্থ হয়েছে। বিভূতিভূষণ তাঁর এই উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন যে অপু অপরাজিত। তাঁর 'পথের পাঁচালী' শেষ হয়েছিল অপুর নিশ্চিন্দিপুরে ফেরার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং 'অপরাজিত'-এর পরবর্তী চব্বিশ বছরের কাহিনি। এই চব্বিশ বছরে অপুর জীবনে নানা ঝড়ঝাপটা জটিলতা এসেছে; কিন্তু লেখকের বৃহৎ এই উপন্যাসটিতে সেই ঝড়ঝাপটা জটিলতা খুব একটা স্থান পায়নি। সুতরাং যে জীবনের ঝড়ঝাপটা জটিলতার সঙ্গে লড়াই না-করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারল না সে তো অপরাজিত হতে পারে না। অধ্যাপক নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাই 'অপরাজিত'কে সার্থক বলতে চাননি।

বিভূতিভূষণের উপন্যাসগুলি ডায়েরিধর্মী। 'বনে পাহাড়ে', 'হে অরণ্য কথা কও' ইত্যাদি রচনায় লেখক যেভাবে চোখে দেখা ধারাবাহিক সময় ও ঘটনাপ্রবাহর প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মন্তব্য করে গেছেন উপন্যাসগুলিতেও অনেক ক্ষেত্রে তাই করেছেন। 'আরণ্যক'-এর সত্যচরণ লেখক নিজেই। 'পথের পাঁচালী' এবং 'অপরাজিত'-র অপুও তিনি। 'ইছামতী'র ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ও তিনি। শুধু ভিন্ন ভিন্ন পারিপার্শ্বিকতায় ঘটনা প্রবাহকে দেখেছেন এবং

একটা জায়গায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন যা কখনও সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। অপু, ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায় এরা টাইপ চরিত্রই থেকে গেছে। অপুর রোমান্টিক মন আর ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধ্যাত্ম-চেতনা তাদেরকে টাইপ চরিত্র করে তুলেছে। বিভিন্ন চরিত্রের সুখ-দুঃখ উত্থান-পতন নিয়ে 'ইছামতী'-র শুরুটা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হলেও ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন-দর্শনের আধিক্যের জন্যই শেষ পর্যন্ত তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। 'ইছামতী' রচনাকালে বিভূতিভূষণের মনে জড়ো হয়েছিল গতিশীল জীবন আর জগৎ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রশ্ন। অভিজ্ঞতার বদৌলতে তিনি দেখেছিলেন, *"দিনকাল বড্ড বদলাচ্ছে।"* সেই পরিবর্তনের অনেক দিক মেনে নিতে পারেননি বলে 'ইছামতী'তে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন পরিবর্তনের মধ্যে সেই অপরিবর্তনশীলতাকে এবং তাই অদ্বৈতবাদিতার মাধ্যমে প্রাচীন ভারতের এই অনুধ্যানকে সজীব করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন এই উপন্যাসে। নায়কের চরিত্র চিত্রণেও তেমনি প্রয়াসী হয়েছিলেন। বয়সে সে প্রবীণ, পদযাত্রায় সে দেখেছে সারা ভারতবর্ষটাকে এবং পরিচিত হয়েছে ঈশ্বর-চিন্তার বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে বৈবাহিক সূত্রে গাঁট বাধে। তিলু, নিলু, বিলু, কুলিন ঘরের এই তিন বোন যাদের বয়স যথাক্রমে তিরিশ, সাতাশ, পঁচিশ, তাদেরকে নিয়ম মেনেই স্বামী সহবাস করতে হয়। এরূপ কোনও কাহিনির বিন্যাস আখ্যানবস্তুর অভিনবত্বে মন্থনজাত জীবনরস পাবারই কথা; কিন্তু সব ব্যর্থ হয়ে যায় জীবন-দর্শনের আধিক্যে।

প্রশ্ন উঠে যে বিভূতিভূষণের কোনও রচনায়ই দেহরাগ-অনুরাগ যথাযত চিত্রিত হয়নি। 'ইছামতী'-র তিলু তিরিশ উত্তীর্ণ নারী যার রূপের খ্যাতি নিয়ে মেয়েদের মধ্যেও ফিসফিস হয়; কিন্তু বিভূতিভূষণ সেই অপরূপা তিলুকে তেমনভাবে তুলে ধরেননি 'ইছামতী'তে। জ্যোৎস্নার রাতে স্বামী ভবানী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তিলু ইছামতী সাঁতরেছে এবং স্বামীকে কুমীরে ধরেছে মনে করে কুমীরকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান জানিয়ে ডুব সাঁতারে অগ্রসর হয়েছে। সেই তিলু অযথা ভুল শুধরে নিয়ে স্বামীকে ডোবা শুড়ের খাঁজ থেকে উদ্ধার করার চেষ্টায় অসাধ্য সাধন করেছে এবং এর পর ছিন্ন সিক্ত বসনে ক্লান্তিতে তীরে এসে লুটিয়ে পড়েছে। কিন্তু এই অপূর্ব ঘটনার যথার্থ চিত্রায়ণ হয়নি। বিভূতিভূষণের কাছে সব সময়ই নারী মাতৃরূপে, কন্যারূপে নাহলেও অধরা রোমান্টিকতায় রয়ে গেছে। আর সে কারণেই 'আরণ্যক'-এর রাজপুত-নারী কুন্তি, সাওতাল-কন্যা ভানুমতী, বৃদ্ধ নকছেদী ভগবতের যুবা স্ত্রী মঞ্চী কখনও যথার্থ শরীরী রূপ লাভ করতে পারেনি। তাদের নিয়ে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল এতে তাদের শরীরী রূপ ফুটিয়ে তোলার প্রয়োজনও ছিল। 'আরণ্যক' হয়ে উঠেছে মানুষ আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের একটা বর্ণনাধর্মী উপন্যাস। মুগ্ধ প্রকৃতির বিবরণই তাঁর রচনায় সর্বত্র প্রাধান্য পেয়েছে। একদিক থেকে অবশ্যই তা প্রশংসনীয়, যেহেতু বাংলা উপন্যাসে এর আগে কখনও প্রকৃতির অপরূপ রূপ এভাবে ফুটে উঠেনি। কিন্তু শুধু এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনায় উপন্যাস সার্থক হতে পারে না। এতসব ব্যর্থতা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ বিভূতিভূষণ।

বিভূতিভূষণের কিছু স্বকীয়তা তাঁর রচনায় খুঁজে পাওয়া যায়, যার জন্য তিনি বাংলা সাহিত্যে অদ্বিতীয়। বিভূতিভূষণ তাঁর গল্প-উপন্যাসে প্রথম বেছে নেন বিশ্ব-প্রকৃতিকে। চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত নিয়ে যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, মানুষ সেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেরই একটি অংশ— এই উপলব্ধি বিভূতিভূষণ ছাড়া আর কোনও বাংলা সাহিত্যের লেখকের লেখনীতে ফুটে ওঠেনি। এমনকী রবীন্দ্রনাথের বেলায়ও নয়। ইংরেজি সাহিত্যেও ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ মানুষ আর

প্রকৃতির মধ্যে এক অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক খুঁজে পেয়েছেন। তাই তিনি বলেছেন, *"To her fair works did Nature link / The human soul that through me ran, / And much it grieved my heart to think / What Man has made of Man."* বিভূতিভূষণের রচনায়ও মানুষ নিজেই হয়ে ওঠে প্রকৃতিরই এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে অবশ্য মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে এই সম্পর্কের কথা কিছুটা খুঁজে পেয়েছেন।

বিভূতিভূষণের রচনায় প্রচণ্ড বিস্ময় ধরা পড়ে। আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র নেবুলা জগৎ আর তার নীচের মনুষ্য জগতের প্রতি সারাটা জীবন শুধু মুগ্ধ বিস্ময়াবিষ্টভাবে চেয়ে থাকা খুব সাধারণ প্রাণ শক্তির কাজ নয়। কিন্তু বিভূতিভূষণ তা পেরেছেন। তিনি শিশুর মতো বিস্মিত হতে একেবারে অভ্যস্ত। অত্যন্ত পরিপক্ষ জ্ঞান ও বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও বিভূতিভূষণ নিতান্ত শিশুর ন্যায় বিস্মিত চোখে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতি চেয়ে থাকতে পারেন বলেই তিনি অদ্বিতীয়। এই বিস্ময়বোধের জন্যই বিভূতিভূষণ স্বতন্ত্র। নিশ্চিন্দিপুরের অধিবাসীরা দলে দলে নীলকুটির মাঠে নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যায়। দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষুধা সহ্য করেও নিতান্ত অশিক্ষিত গেয়ো মানুষের নীলকণ্ঠ পাখি দেখারও সখ আছে। অত্যন্ত সাধারণ এবং স্বাভাবিক ভাবেই এই নীলকণ্ঠ পাখি দেখার সখটা বর্ণণা করেছেন বিভূতিভূষণ। সাধারণ শ্রমজীবি গ্রাম্য মানুষ নিজের সকল কাজ ফেলেও অযথা কেন এই নীলকণ্ঠ পাখি দেখতে যাবে তার কোনও অজুহাতই দেখাতে হয়নি লেখককে। বিভূতিভূষণের কাছে বিস্ময়বোধও জীবনের বাস্তব চিত্র। অপু এক সময় পড়াশোনা করতে কলকাতার পথে পাড়ি দিয়েছিল। তবু নিশ্চিন্দিপুরেব গ্রাম্য জীবন তার কাছে পুরনো হয়ে ওঠেনি। কলকাতা শহরে শিক্ষিত যুবকের গ্রামের অশিক্ষিত মানুষজনের সঙ্গে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব থাকারই কথা, কিন্তু বিভূতিভূষণের অপুব কাছে তা ব্যতিক্রম এবং এজন্যেই পৃথিবী ভ্রমণে বেরোনোর আগে অপু ফিরে আসে তার শৈশবেব নিশ্চিন্দিপুবে আরও একবার।

দরিদ্র নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা বিভূতিভূষণের আবও একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। দরিদ্র নিপীড়িত ভবঘুরে লাঞ্ছিত মানুষকে আমরা অসংখ্যবাব বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসে দেখতে পাই। বিভূতিভূষণ তাদের দারিদ্র্য দূর করার কোনও উদ্যোগই নেননি তাঁর রচনার কোথাও। আসলে মানুষকে ভালোবাসাই বিভূতিভূষণের স্বপ্ন। সম্পদশালী ধুরন্দর বুদ্ধিমান মানুষের চেয়ে এইসব দরিদ্র, ভবঘুরে, নিপীড়িত মানুষদের ভালোবাসা সহজ। কারণ এরাই প্রকৃতির কাছের মানুষ, মাটির সঙ্গে এদেব সম্পর্ক। এই বাউণ্ডুলে দরিদ্র লাঞ্ছিতদের ভালোবেসে রহস্যাক্রান্ত হওয়া অথবা বহস্যাক্রান্ত হয়ে ভালোবাসাই বিভূতিভূষণের স্বপ্ন। এই স্বপ্নকে আমরা বিভূতিভূষণের মিস্টিসিজমও বলতে পারি।

সাহিত্য যেমন সমাজের প্রতিচ্ছবি তেমনি সমাজ পরিবর্তনেরও একটা হাতিয়ার। শেলি তাঁর কাব্যে একটি নতুন যুগের সূচনা করতে চেয়ে বলেছেন, *"Drive my dead thoughts over the universe / Like withered leaves to quicken a new birth."* বিভূতভূষণ কিন্তু সাহিত্যকে সমাজ পাল্টাবার তেমন কোনও হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেননি। তাই বলে আমরা বিভূতিভূষণকে সংস্কার বিরোধী সাহিত্যিক আখ্যা দিতে পারি না। আসলে সমাজ তাঁকে কখনো পীড়া দেয়নি, শাসনও করেনি। শেলি অবশ্য সমাজ দ্বারা পীড়িত হয়েই বলেছিলেন, *"I fall upon the thorns of life! I bleed!"* নজরুলও

তাঁর কাব্যে প্রবর্তিত সমাজ ব্যবস্থায় বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেছেন, *"আমি দুর্বার / আমি ভেঙ্গে করি সব চুরমার! / আমি অনিয়ম উশৃঙ্খল / আমি মানিনাকো কোনো আইন, / আমি ভরা-তরী করি ভরা-ডুবি, আমি টর্পেডো, আমি ভীম ভাসমান মাইন! / আমি ধুর্জ্জটী আমি এলোকেশে ঝড় অকাল-বৈশাখীর! / আমি বিদ্রোহী আমি বিদ্রোহীসুত বিশ্ব-বিধাত্রীর! / বল বীর / চির উন্নত মম শির!"* অথবা *"মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত, / যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না, / বিদ্রোহী রণক্লান্ত / আমি সেই দিন হব শান্ত।"* সুকান্তও তাঁর কাব্যে সমাজ পাল্টাবার চেষ্টা করে লিখেছেন, *"শোনরে মালিক, শোনরে মজুতদার, / তোদের প্রাসাদে জমা হলো কত মৃত মানুষের হাড় / হিসাব কি দিবি তার? / প্রিয়াকে আমার কেড়েছিস তোরা ভেঙ্গেছিস ঘর-বাড়ি / সে কথা আমি কি জীবনে-মরণে কখনো ভুলতে পারি / আদিম হিংস্র মানবিকতার যদি আমি কেউ হই / স্বজন হারানো শ্মশানে তোদের চিতা আমি তোলবই।"* বিভূতিভূষণের রচনায় এমন কোনও বিদ্রোহের সুর কোথাও ধরা পড়েনি। আসলে সমাজে মানুষজন যেভাবে আছে সেভাবেই তাদেরকে ভালোবেসে নিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব।

বিভূতিভূষণ যখন তাঁর সাহিত্য রচনায় পুরোপুরি আত্মনিয়োগ করেছিলেন তখন বিশ্বের নানা দেশে সাহিত্য আন্দোলন চলছিল এবং ভারতবর্ষেও ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘ-র কাজ জোর কদমে এগিয়ে যাচ্ছিল। রবীন্দ্রনাথও এতে যুক্ত ছিলেন। বিভূতিভূষণের দেহ-মনে এই আন্দোলনের হাওয়া লাগলেও যথেষ্ট উদ্দীপনা নিয়ে প্রথম সারিতে সামিল হবার প্রয়োজনীয়তা মোটেই অনুভব করেননি। যেহেতু কথা সাহিত্যিকের একমাত্র কাজ মানুষের রহস্যময় জীবনের সকল বাস্তবতা ও বিচিত্র সম্ভাব্যতাকে নিজের লেখনীর মাধ্যমে তুলে ধরা, তাতে তো বিভূতিভূষণ কোনও কসুর করেননি। আর তাই নতুন উদ্যমে এগিয়ে আসার প্রয়োজনীয়তার অপেক্ষাও রাখে না। 'ইছামতী' উপন্যাস আমাদেরকে বুঝিয়ে দিয়েছে যে 'মূক জনগণের ইতিহাসই' মানব সভ্যতার প্রকৃত ইতিহাস। ক্ষুধা-তৃষ্ণার জ্বালায় আমরা ছটফট করতে দেখি অপু, দুর্গা, ইন্দিরা ঠাকরুণ, গঙ্গাচরণ প্রভৃতি চরিত্রকে। লেখকের সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী রচনা 'আরণ্যক' উপন্যাসেও এই ক্ষুধা-তৃষ্ণার করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। তাঁর শতাধিক গল্পেও ক্লাইমেক্স সৃষ্টি করেছে এই ক্ষুধা-তৃষ্ণা। বাংলার অপরূপ রূপ যেমন বিভূতিভূষণ তাঁর গল্প-উপন্যাসে ফুটিয়ে তুলেছেন তেমনি গ্রাম-বাংলার জীর্ণ দশা, অনিশ্চিত জীবন যাত্রা, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতিও স্থান পেয়েছে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, বুভুক্ষার মনস্তত্ত্ব নিয়ে বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলি বেদনাক্লিষ্ট জীবনের স্থান রেখেছে। 'পথের পাঁচালী'র হরিহর চরিত্রের সংসার বেদনাক্লিষ্ট জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। সর্বজয়ার বৃদ্ধা ইন্দিরা ঠাকরুণ সম্পর্কে বিভূতিভূষণ বলেছেন, *"কোথাকার কে তার ঠিকানা নাই, কি তাহার সঙ্গে সম্পর্ক খুঁজিয়া মেলে না, বসিয়া বসিয়া অন্ন ধ্বংস করিতেছে।"* কঠিন জীবন সংগ্রামই মানুষের মনে নিষ্ঠুরতার জন্ম দেয় এবং প্রতিহিংসা লক্ষ্য স্থির করতে ব্যর্থ হয়েই নিরীহজনকেই বেছে নেয়। আর পর্যুদস্থ সর্বজয়াও তাই বেছে নিয়েছিল বাহাত্তর বয়স্কা বৃদ্ধা ইন্দিরা ঠাকরুণের মতো নিরীহ চরিত্রকেই। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর প্রবন্ধে বিভূতিভূষণের মতো মুর্খ, দরিদ্র, মুচি, মেথরকে ভালোবাসার স্বপ্ন দেখেছেন।

বিভূতিভূষণকে জানতে হলে তাঁর ডায়েরিধর্মী কয়েকটি গ্রন্থ যেমন, 'অরণ্য মর্মর', 'তৃণাঙ্কুর', 'স্মৃতির রেখা', 'উর্মিমুখর', 'বনে-পাহাড়ে' প্রভৃতিকে জেনে নিতে হবে। সমসাময়িক

জীবনের বিপন্ন অনিশ্চয়তা, ক্লেদকিন্ন পঙ্কিলতা কীভাবে তাঁকে বহির্মুখী করে তুলেছিল, গ্রন্থগুলি তারই প্রমাণ। ওই বহির্মুখিতা শুধু লেখক মনেরই নয়, তখনকার দিনের যুব মানসেরও একটা চিত্র। তাঁর ডায়েরিধর্মী গ্রন্থগুলি পাঠককে জানিয়ে দেয় যে পরিবেশ পরিমণ্ডলের অবরুদ্ধতায় হাঁপিয়ে ওঠা সে সময়কারই একজন কীভাবে হয়ে উঠেছিলেন বিভূতিভূষণ। বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন ভাষাতেই তিনি জীবনকে ধিক্কার জানিয়েছেন। কখনও তাঁকে বলতে দেখি, *"পুতপুতে মিনমিনে জীবন"* কখনও *"একঘেয়ে পোষ মানা জীবন"*, আবার কখনও *"খাঁচার পাখীর জীবন।"*

লেখক-জীবনের শুরু থেকেই বিভূতিভূষণ বুঝতে পেরেছিলেন, যেভাবে মানুষজন আছে বা থাকতে বাধ্য হয় সেভাবে মানুষের জীবন দৃঢ়মূল হয়ে প্রস্ফুটিত হতে পারে না। তাই বাড়ি এবং বাসস্থান তাঁর গল্প-উপন্যাসে স্বভাবতই স্থান পেয়েছে। তাঁর 'জাল' গল্পটিতে আদর্শ জনবসতি গড়ে তোলার স্বপ্নে বিকানিরের ধনকুবের রামলাল ব্রাহ্মণ হাজারিবাগের গভীর বনে নতুন উপনিবেশ গড়তে প্রয়াসী হয়েছে। এই গল্পে আমরা দেখি পরিণত বিভূতিভূষণ তখনও খুঁজে পাননি তাঁর কাঙ্ক্ষিত বাসস্থানটি। 'আরণ্যক' গল্পে সত্যচরণ দেখতে না-চাইলেও বারবার তার মানসপটে ভেসে উঠেছে *"গায়ে গায়ে কুশ্রী বেড়প খোলার একতলা কি দোতালা মাঠ-কোঠা, চালেচালে বসতি, ফণিমনসার ঝাড়, গোবর স্তূপের আবর্জনার মাঝখানে গরু-মহিষের গোয়াল—ময়লা কাপড় পরানো নারীর ভিড়, হনুমানজির মন্দিরে ধ্বজা উড়িতেছে, রূপার হাঁসুলি গলায় উলঙ্গ বালক-বালিকার দল"*, তেমনি বিভূতিভূষণ না-চাইলেও সমকালীন জীবনের পরিবেশ ও পরিজন পরিবার তাঁর কথাসাহিত্যে স্থান করে নিয়েছে। বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে স্বাধীনোত্তর জনজীবনের বিভিন্ন কাহিনি তাঁর এইসব লেখায় ফুটে উঠেছে। আহার সন্ধানের সেই প্রাণান্তকর চেষ্টাই চলেছে জনজীবন থেকে প্রত্যন্ত বনে। স্বাধীন ভারতবর্ষও কোনওরূপ নিশ্চয়তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে শোষণের ভয়াবহতা কমাতে। আর এই শোষণের ভয়াবহতার মধ্যেই আহার সংগ্রহের উৎকণ্ঠিত প্রয়াসে বাঁধা পড়ে রয়েছে গেয়ো তরুণ থেকে ভূমিজ-বাউরি-হো-সাওতাল সবাই। 'শিকারী', 'চাউল', 'পার্থক্য' প্রভৃতি গল্প এইসবের জ্বলন্ত প্রমাণ।

বিভূতিভূষণের অনেক গল্পে নায়ক মূলতঃ অতীত দিনের স্মৃতিচারণে নিজের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাবার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছে। সেইসব গল্পের নায়ক বহির্জীবনের সাফল্যের পাদপৃষ্ঠে দাঁড়িয়ে পিছন দিকে ফিরে তাকিয়েছে শৈশব-কৈশোর জীবনের দিকে। এইসব গল্পের শেষ দিকে বিশেষতঃ এই অতীত স্মৃতিচারিতা ফুটে উঠেছে এবং এক ব্যঞ্জনার ছবিও ধরা পড়েছে।

বিভূতিভূষণের গল্পে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নায়ককে অতীত দিনের স্মৃতিচারিতার মাধ্যমেই নিজেকে উপলব্ধি করতে দেখা যায়। 'উপেক্ষিতা' গল্পে নায়কের এই অতীত স্মৃতিচারিতা ধরা পড়ে। গল্পের নায়ক বিমল যৌবনের প্রথম দিকে এক গ্রাম্যবধূর স্নেহ-মমতার জালে জড়িয়ে পড়ে এবং নায়কের প্রবাস জীবনে সে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তবু দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর সমুদ্রতীরে কোথাও বসেবসে সেই গৃহবধূকেই তার মনে পড়ে— *"তোমায় আবার দেখতে বড় ইচ্ছে করছে দিদিমণি।"* বাংলাদেশের মাটির পথের বুকেবুকে সেই বধূটির পা দু'খানির রেখা আঁকা। এভাবে নায়ক পঁচিশ বছর পরেও সেই গৃহবধূটির সঙ্গে জন্মভূমির একাত্মতাকে উপলব্ধি করেছে। এভাবেই তাঁর গল্পের নায়ক ফেলে আসা দিনগুলির

দিকে ফিরে তাকায়। মাতৃভূমির প্রতি এবং মাতৃসত্তার প্রতি নায়কের অমোঘ আকর্ষণ ধরা পড়ে বিভূতিভূষণের অনেক গল্পে। এই প্রসঙ্গে 'আহ্বান' গল্পের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। 'ভূবনবোষ্টমী' বিভূতিভূষণের এরূপ আরেকটি গল্প যেখানে ভূবনবোষ্টমী এক সাধারণ গ্রাম্য নারী বালক বয়সে যার খুব বেশি সংস্পর্শে নায়ককে কখনও দেখতে পাই না। কিন্তু সেই ভূবনবোষ্টমী বারবার নায়কের স্মৃতিপটে হানা দেয়। এর চেয়ে অনেক বেশি মেলামেশা হয়েছে যাদের সঙ্গে তারা কিন্তু বিস্মৃতির অতলে। "কতবার ভেবেছি কেন এমন হয়?" যদিও এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নায়ক পায়নি। নায়কের এই রহস্যানুভূতি আত্ম অণ্বেষণেরই এক দৃষ্টান্ত। আসলে ভূবনবোষ্টমীর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে নায়কের জন্মভূমির প্রতি এক গভীর আকর্ষণই ধরা পড়ে। এভাবে মাটির টান এবং নায়কের নিজ সত্তার অনুসন্ধান বিভূতিভূষণের আরও অনেক গল্পে দেখা যায়।

'জন্মদিন', 'সার্থকতা' প্রভৃতি গল্পের নায়ক কর্মজীবনে সাফল্য লাভ করে অর্থ, যশ সবই অর্জন করেছে; তবু জীবনের কোনও এক সময়ে তাদের জীবনের সার্থকতা নিয়ে সন্দেহ জেগেছে। বিপন্ন জীবনে তাদের মনে হয়েছে বৈষয়িক সাফল্যের লক্ষ্য নিয়ে কাটিয়ে দেওয়া জীবনে তারা লক্ষ্যভ্রষ্ট। গভীর অনুভবের জগৎ থেকে তারা বিচ্ছিন্ন। আর সেই বিচ্ছিন্ন জীবন থেকে মুক্তি পাবার আশায় বারবার পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির দিকে ফিরে তাকিয়েছে। *"জীবনের সার্থকতা অর্থ উপার্জনে নয়, খ্যাতি প্রতিপত্তিতে নয় ... ভোগে নয় ... সে সার্থকতা শুধু আছে জীবনকে গভীরভাবে উপলব্ধি করার ভেতরে।" (তৃণাঙ্কুর)*

'জন্মদিন' গল্পের নায়ক রায়বাহাদুর নিজের জন্মদিনে এক অভিজাত বাড়িতে বসে বসেই ফিরে তাকাচ্ছেন তাঁর জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির দিকে। অর্থ যশ সবকিছু লাভ করার পরও নিজেকে রড় নিঃসঙ্গবোধ করছেন এই একষট্টি বছর বয়স্ক রায়বাহাদুর। চল্লিশ বছর আগের কলকাতার কোনও এক গ্রামের স্কুল শিক্ষককে আজ এত কিছু লাভ করেও (আভিজাত্য বাড়ি, গাড়ি, অঢেল অর্থ) যৌবনের ফেলে আসা দিনগুলি পীড়া দিচ্ছে যিনি ফিরে যেতে চান সেই পুরনো দিনে। নিরুপমার সঙ্গে প্রেমে পড়ার অতীত স্মৃতি তাঁকে আরও পীড়া দিচ্ছে। রায়বাহাদুর ফিরে যেতে চান রাতুলপুরের সেই বাঁশবনে। এভাবেই ব্যক্তি সত্তার প্রকৃত পরিচয়ের সন্ধানের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়ে মাতৃভূমির টান।

সুতরাং বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাস সর্বত্রই নায়কের 'নস্টালজিক' স্মৃতিচারণ ধরা পড়ে। নিজের আত্ম অনুসন্ধানের সঙ্গে জন্মভূমির টান কথাশিল্পী বিভূতিভূষণের চরিত্রগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য। চরিত্রের এই 'নস্টালজিকতা' আমাদের বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিকতা হারায়নি। বিপন্ন দিশেহারা জীবনে আজও মানুষ যখন পায়ের তলার মাটি খুঁজে পায় না তখন বিভূতিভূষণের গল্প-উপন্যাসগুলিই আমাদের সম্বল হয়ে দাঁড়ায়।

■ *লেখক একজন সাহিত্যকর্মী ও এই পত্রিকার সম্পাদক।*

স্বদেশ-এর জীবনানন্দ সংখ্যা ঃ একটি পাঠ-প্রতিক্রিয়া

জয়শ্রী ভট্টাচার্য

ফুল ফুটুক বা না ফুটুক কোনও এক কবি সেদিন ভুবন মনমোহন বসন্তের আগমনকে স্বাগত জানালেন তাঁর জ্যোতির্ময় চিন্তনের বিভায়। আত্মহারা আনন্দের অট্টহাসিতে মাতিয়ে দিলেন দিগ্বিদিক। অলিখিত বসন্তের প্রলোভনে, নিয়মের বেড়া টপকে আমাকেও হারিয়ে যেতে দেখেছি আমি। আরও দেখেছি অমন পাগলামোর ব্যাপারটা কণ্ঠভরে জগৎকে জানিয়ে দিতে মোটেই লজ্জা করে না আমার। বরং ইচ্ছে করে আরও পাগল হই — পৌঁছে যাই পারিজাতের বনে—নন্দন কাননে, ইচ্ছের জোর ছিল বলেই তো পৌঁছোতে পারলাম *"হীরা ঝরা হরিণের চোখের"* মতো জীবনানন্দীয় স্বদেশে!

জীবনানন্দ সংখ্যা যাঁদের সৃষ্টি সম্ভারে সমৃদ্ধ, তাঁদের অতল গভীর প্রতিভার আহ্বানে সাড়া দিয়ে আবার ফিরে আসার কথা ভাবতেও আতঙ্ক জাগে—প্রতিদিনের লড়াই কি লড়তে পারব আর! একটা ঝিনুকের সময় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল — হাসল মুক্তা — অন্ধকার ভেদ করা হাসি! হাল ভাঙা দিশেহারা নাবিকের চোখের দৃষ্টি তখনও আচ্ছন্ন। সামনে পড়েছিল দিলীপ বিশ্বাসের, "স্বদেশ-এর জীবনানন্দ বিশেষ সংখ্যা ঃ পাঠ প্রতিক্রিয়া" মুক্তার আলোয় স্পষ্টই উদ্ভাসিত হল *'সবুজ ঘাসের দেশ দারুচিনি দ্বীপের ভিতর'*!

প্রচ্ছদেই শ্যামলসুন্দর জীবনানন্দকে নিয়ে এসে চন্দ্রকান্ত যে একটা মহৎ কাজ করেছেন সেই স্বীকৃতি তাঁর প্রাপ্যের সামান্য অংশই পূরণ করে। অসংখ্য বিরহী বিরহিনী, যারা হৃদয় বিছিয়ে বসেছিল তাদের তৃষাহরা তাপহরা সঙ্গসুধায় ভরিয়ে দিতে শ্যামলসুন্দর জীবনানন্দের আবির্ভাব, ইতিহাস অবশ্যই ধরে রাখবে।

বিশ্বায়নের দাপট কিন্তু স্বদেশ-এর সম্পাদককে ঠেকাতে পারেনি। জ্বলন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মুখোমুখি হয়েও ঐতিহ্যের ভিত্তি থেকে ছিন্নমূল বিজ্ঞাপন শাসিত সাম্প্রতিক জীবনকে সাবধান থাকতে সুপরামর্শ দেন সম্পাদকীয়তে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দেশের চরম অব্যবস্থার দিনে সম্পাদকের কঠিন প্রয়াস আত্মদানেরই নামান্তর এবং এই আত্মদানের উৎসধারায় মঙ্গলঘট ভরে নিতে সুস্থ রুচিসম্পন্ন পুণ্যার্থীর ভিড় ক্রমবর্ধিত হবেই।

আমন্ত্রিত সম্পাদক সঞ্জীব দেবলস্কর তাঁর লেখনীর টানে আমাকে মন্ত্রমুগ্ধ করে দিলেও চিত্রদর্পিতা হয়ে ওঠার মুহূর্তে কোনওরকমে সামলে নিয়েছি। সম্পাদক ও আমন্ত্রিত সম্পাদক কখন মিলে মিশে একাকার হয়ে অখণ্ড প্রকাশের দ্যোতনায় আমাকে আন্দোলিত করেছেন। আমি শুনেছি জীবনের দাবি—সে অবিস্মরণীয় সততাকে চায়। একদিকে ব্রহ্মাণ্ড পুড়লেও প্রকৃতি কিন্তু তার দানে অটল অনড়; নইলে নির্বাসিত পরবাসীদের রূপসী বাংলা আশ্রয় দেয় কীভাবে! কীভাবেই বা অদৃশ্য সুতোর বুনোনে রূপসী বাংলার মানচিত্র বিস্মৃত হয়ে যায় নির্বাসিতা বাংলার সবুজ কান্তারে। তাই তো বলছিলাম জ্বলন্ত ব্রহ্মাণ্ডের মুখোমুখি হয়েও ভয় পান না সম্পাদক ও অতিথি সম্পাদক। ওঁরা বুঁদ হয়ে থাকেন জিরি-চিরি ধলেশ্বরী স্বর্ণবতী রুক্মিণী সুরমা কুশিয়ারা বরাকের সবুজ করুণ ডাঙায় ভেসে বেড়ানো রূপসী বাংলার নরম ধানের গন্ধে।

'কবিতার কথা ঃ নব প্রস্থানের দিকে' — তপোধীর ভট্টাচার্য-এর প্রবন্ধ, পাঠ করতে বসার সময় ঘড়ি দেখিনি যদিও তবু সূর্যদেব যে তখন মাথার উপরেই প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করছিলেন, সেকথা হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু তারপর! সূর্য কখন সরেছে কখন ঢলেছে বলতেই পারি না। কিছু বলার তাগিদ বোধ করলাম 'শেষ হয়ে না হইল শেষ' সেই তৃষ্ণার গভীর আকুলতায়! যখন চরৈবেতির অমোঘ ইশারা একটা বোবা যন্ত্রণার শিকলে আটকে পড়ে গেল, শুনতে পেলাম সাগরের বন্দী আহ্বান! তুলসীর বেদীমূলে জ্বলছিল প্রদীপ — তার চিরন্তনী শিখার উজ্জ্বল আলোয় প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল সত্যের স্বরূপ— *"মানুষের কাছে মানুষের স্বাভাবিক দাবির আশ্চর্য বিশুদ্ধতার বার্তাবহ কবিই মানব সমাজকেই চিনে নেবার ও চিনিয়ে দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে ওঠে।"*

হে জ্ঞান তাপস! সময়ের কাছে আমাদের সবকে পৌঁছে দেবার দায়িত্ব নিতে হবে আপনাকেই। জীবনানন্দ যদি ব্রহ্মাণ্ড বিচরণের অছিলায় কবিতা থেকে কিছুক্ষণের জন্য প্রস্থান করে প্রবন্ধে প্রবেশ করেন আবার প্রস্থান-প্রবেশ উপন্যাসে—নব নব নতুনতর দিক উন্মোচনের প্রয়াস, তবে আমাদেরও প্রবেশ-প্রস্থানের চলাচল অব্যাহত থাকুক অসত্য থেকে সত্যে, তম থেকে জ্যোতিতে এবং মৃত্যু থেকে অমৃতে — কাণ্ডারী তপোধীর!

বনলতা সেন ঃ আলোচনা অমরেন্দ্র গণাই। এই প্রবন্ধ অনেক দেরী করে পেলাম। জানি না 'নতুন কালের নব যাত্রী ছেলেমেয়েরা' আমার মতো দুর্ভাগ্যের শিকার হচ্ছে কি না। রবীন্দ্রনাথ যেখানে শেষ করেছেন সেখান থেকে জীবনানন্দের যাত্রা। প্রতিটা সন্ধিক্ষণই তো তাৎপর্যময়! আবার দুজন কবিরই পরিসমাপ্তি অন্ধকারে অথচ দুই কবির অন্ধকারের চেহারাটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। কী অপূর্ব গবেষণা! স্মৃতি মেদুর আবেশে হারিয়ে যাই সত্তর দশকের এক অলস দুপুরে। মেহগিনীর ছায়া পিছনে ফেলে, অশোকের বন ধরে যে পায়ে চলার পথ গিয়েছে, সে পথে হেঁটে দীঘির পাড় আলো করে দাঁড়িয়ে থাকা ঝকঝকে লাইব্রেরিতে ঢুকে পড়ি। সেই উন্মুক্ত দিনগুলোয় কেন যে জীবনানন্দে নেতিয়ে পড়তাম কেউ জিজ্ঞেস করলে চেতনা এক বিপন্ন বিস্ময়ে আক্রান্ত হত। তখন তো আসতে পারতেন অমরেন্দ্র। যদি আসতেন তবে মুখস্থেই ফুরিয়ে যেত না জানার পরিধি "ভাব এবং বাণী রূপ এবং রসের পার্বতী পরমেশ্বর মিলনে কাব্যের কুমারসম্ভব" — (শংকরীপ্রসাদ বসু) তবু বনলতা সেনের কাছে বাঁধা রইলুম চিরদিনের জন্য! আপনি না পাঠাতেন যদি জানতাম কী করে বলুন কাব্যের আঙ্গিক কাকে বলে।

কবিতার চিত্রিত ছায়া ঃ জীবনানন্দের উপন্যাস / বিকাশ রায় — ছোট্ট এই প্রবন্ধের মূল্যায়ন করতে গিয়ে সাহিত্য তত্ত্বের একটা প্রচলিত তুলনা আমার চিত্তে যখন বারবারই উদ্ভাসিত হচ্ছে তখন বলেই ফেলি, গোষ্পদের সামান্য জলেও পূর্ণ চাঁদ যেমন তার মায়া বিছায় ওমনই স্বল্প পরিসরেও প্রাবন্ধিক, বিস্তৃতির স্পষ্ট প্রতিভাস ফুটিয়ে তুলেছেন। আসলে কবি, প্রাবন্ধিক ঔপন্যাসিক সব জীবনানন্দই তো চলেছেন একটা ঠিকানাতেই। কিংবা জীবনানন্দকেই ধরে নিই যদি এক সুদীর্ঘ যাত্রাপথ এবং কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস যাত্রাপথের বিরামস্থল তবে দোষ কোথায়। এই পথ ধরে এগুবার অর্থই তো মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যাওয়া। তাই কি উপন্যাসে কবিতার টর্চের আলো ফেলে বিকাশ রায় আমাদের দেখিয়ে দিলেন নিরূপম যাত্রায় যাত্রী জীবনানন্দকে যার পদধ্বনিতে ধ্বনিত হয় "জ্ঞান নেই আজ এ

পৃথিবীতে / জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই /" জীবনানন্দের কবিতার আলো ও অন্ধকার কিভাবে তার গদ্যের সৃজনভূমিতে ও অন্তর্বয়নে ঢুকে পড়েছে সেই খবর দেওয়ার কালে বিকাশ রায় কি বুঝতে পেরেছেন আরও কত রত্নখচিত সংবাদ উপহার দিলেন আমাদের? — জীবনানন্দের উপন্যাসগুলোর সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয় ঘটিয়ে দিলেন বিকাশ রায়ই।

জীবনানন্দের কাব্য ভাষা / জন্মজিৎ রায় — প্রবন্ধে লেখকের অক্লান্ত নিষ্ঠার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলি, কবির স্বাতন্ত্র্যদীপ্ত কাব্যভাষার প্রয়োগ বৈশিষ্ট্যের নমুনাগুলো আমরা তো অনায়াসে পেয়ে গেলাম। কিন্তু এইসব বৈশিষ্ট্যের বৈজয়ন্তী মহিমায় যদি কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠতে প্রয়াসী হই তখন যেন নীল নক্ষত্রের দেশে পৌঁছে আত্মহারা আনন্দে পথিকৃৎকে ভুলে না যাই।

মনোবিজ্ঞান, পরাবাস্তবতা ও জীবনানন্দের কবিতা / বিশ্বজিৎ চৌধুরী — বৈজ্ঞানিক বিচার বিশ্লেষণের নিরিখে জীবনানন্দের সার্থকতা নিরূপনে প্রাবন্ধিক তাঁর অসাধারণ যোগ্যতার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন সেই দৃষ্টান্ত কখনই অম্লান হবার নয়। অথচ আলোচনার গভীরতম প্রদেশে প্রবেশ করে নির্যাসটুকু টেনে নেব, সেখানে আমি নিতান্তই দীন তবু অপূর্ব এই সৃষ্টির সৌন্দর্য ঢাকা থাকে না। আমিও আলোড়িত হই। চেতনার স্বাভাবিক স্তরে পৌঁছে দেখি বিশ্বজিৎ আমার প্রাণ ভরে দিয়েছেন, চমৎকার উপহারে—কবির বিচিত্র স্বাদের বিভিন্ন কবিতার প্রতিটা পঙক্তিই অনন্য। অনন্য পঙক্তিগুলোর পাঠ্য হবার সমান দাবি। বিশ্বজিতের প্রেরণায় গভীর উৎসাহ নিয়ে জীবনানন্দের কাব্য পাঠের পাশাপাশি মনোবিজ্ঞান পরাবাস্তবতা ও জীবনানন্দের কবিতার সংযোগ সাধনের রহস্যটা জানতে আবার লোভী হয়ে উঠি। এবং চোখে পড়ে বিশ্বজিতের নির্দেশ — 'প্রতিটি কাব্যগ্রন্থেই কবি নিজেকে অতিক্রম করে গেছেন। এই অতিক্রমনের প্রয়াস যেখানে মৃত্যু অবধি অব্যাহত থাকে, সেখানে পাঠক হিসেবে অন্যমনস্ক হবার জো নেই।"

জীবনানন্দের বাংলাদেশ / অনুরূপা বিশ্বাস — এই প্রবন্ধ পাঠকালে মনে হয়েছে কবির মণিকোঠায় এসে উপস্থিত হয়েছি। এই মণিকোঠায় কবি তাঁর জীবনের সব যন্ত্রণার শবদেহের উপর নির্মাণ করেছেন এক মণিময় আসন যার উপর বসে তিনি রূপময় প্রেমের ধ্যানে মগ্ন! সুগন্ধি ধূপের ধোঁয়ায় রূপসীর অবয়ব মূর্ত হয়! মধুর ঘ্রাণে মদীর কবি তবু শঙ্কাহীন — "শীত এসে আর নষ্ট করে দিয়ে যাবে না তার রূপ!"

শতজলঝর্নার শুশ্রূষা ও জীবনানন্দ / মৃন্ময় দেব — প্রবন্ধটা সেই সোনার কাঠি, যাঁর ছোঁয়ায় আধুনিক কবি-প্রতিভা মন্ত্রঘুম ভেঙে জেগে উঠবে। আবিষ্কার করবে যে কোনও বিষয় — এমনকী অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসও শিল্প সুষমায় মন্ডিত হয়ে উঠার দাবি রাখে। অন্ধকার ও অবিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে জীবনমুখী কবি হয়ে ওঠার অভিষেক উৎসবে শততীর্থের জল ধরে ঝর্না ঝরে অবিরল ধারায়। ভগীরথের মতোই তীর্থঙ্কর মৃন্ময় বুঝি বয়ে আনলেন সঞ্জীবনী সুধার বারিধারা! — জীবনানন্দের কমন্ডলুতে সুরক্ষিত জিজ্ঞাসার উত্তর 'মানুষ যা' আর মানুষ যা হতে পারে তার মাঝখানে বাস্তব সম্ভাবনার বিস্তীর্ণ ভূমি! তবে আর দেরী কেন? সম্ভাবনাময় প্রতিভার নিরলস অভ্যাস অব্যাহত থাকুক সেই ভূমিতে জীবনানন্দের পরিচালনায়।

দীন থেকে দীপ্ত জীবনে তাদের উত্তরণের পথে চেয়ে রইলুম আমরা।

জীবনানন্দীয় বোধ, তাঁর সংসার, সমাজ ও সাইকোসিস / দিলীপকান্তি লস্কর — কবিতা থেকে পাগলাগারদ, পাগলাগারদ থেকে কবিতায় যাতায়াতের পথে সহৃদয় হৃদয় সংবাদী দিলীপকান্তি লস্কর যে তাঁর দূরদৃষ্টির তেজরাশিতে কবিদের মর্ম সহচর হয়েছেন সে ঘটনা অনস্বীকার্য। প্রবন্ধের গভীরে প্রবেশ করবার দুর্নিবার আকর্ষণ থাকলেও যেটুকু বোধ সঞ্চয় করতে দুঃসাহস করি তা দিয়ে বোধিসত্ত্বের অধিকার দাবি করা অসম্ভব। তবু ইলিউশন, হেলুসিনেশন, ডিলিউশন, ডিপ্রেশন এবং সাইকোসিসের নিখুঁত বিভাজনগুলো কিন্তু সত্তাকে সজাগ করে বলে দেয়—একেই বলে কবি এবং কবিতাকে ভালোবাসা।

ইতিহাস ও জীবনানন্দ / সুজিৎ চৌধুরী — প্রবন্ধে ইতিহাস রসের যথার্থ উপস্থাপন আমাকে একই সঙ্গে আপ্লুত এবং উদ্বুদ্ধ করেছে। To the glory that was greece, and the grandeur that was Rome এডগার এলান পো'র ইতিহাস সাক্ষ্যের মতো জীবনানন্দের অন্ধকারে বিদিশা কিংবা কারুকার্যময় শ্রাবস্তী যে ঐতিহাসিক বিবরণ নয় সেটা এতদিন জানলেও সুজিৎ চৌধুরী যখন শরীরটাকে বাদ দিয়ে ইতিহাসের আকরটুকু আত্মসাৎ করার কৌশল শিখিয়ে দেন, তাও আবার জীবনানন্দীয় ফরমুলায়, তখন কিভাবে যে তাঁকে অভিবাদন জানাব ভেবে কূল পাই না। কবি জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনা সমন্বিত সম্প্রতি পুনরুদ্ধারকৃত নিবন্ধটির উল্লেখ করে সুজিৎ চৌধুরী আমাদের আরও ঋণে দায়বদ্ধ করলেও আমরা কিন্তু তাঁর দরজায় কড়া নাড়া থেকে থেমে যাব না — আমাদের যে প্রয়োজন অন্তহীন!

এইসব ইতিহাস স্মৃতি পরম্পরা / সুধাংশু সেন — মানুষ জীবনানন্দ যে এমনভাবে প্রতিভাত হবেন কোনওদিন কি ভাবতে পেরেছিলাম! সুধাংশু সেনের সাথে অন্ধকারে লাখুটিয়ার খাল-পাড় ধরে এগিয়ে যেতেই যেদিকে জগচ্চন্দ্র দাসের বাগানে ব্রাহ্মণদের শ্মশান, মাঝখানে লাশকাটা ঘর, বেশ কিছু ঝাঁকড়া মাথা রাবার গাছের ছায়ারা জটলা করেছিল, সেই ছায়াপথ ধরেই দ্রুত পদে এগিয়ে আসছিলেন ইংরাজির অধ্যাপক জীবনানন্দ দাশ। সুধাংশু সেন যদিও নিশ্চিত জানেন না লাশ কাটা ঘরের পথ শ্মশানের পথ জ্বলন্ত চিতাকাঠ কে তাঁকে সেই রাত টানছিল? আত্মপরীক্ষারত ভীষণ নিস্পৃহ উদাসীন এই ব্যক্তিটিকে কোন্‌দিকে নাড়ানো যায় ভাবতে ভাবতে সুধাংশু তাঁর আরও ছাত্রবন্ধুদের নিয়ে স্বদেশী আন্দোলন ও রাজনৈতিক প্রসঙ্গ নিয়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন — কাজ হল। বলতে শুরু করলেন *"তোমরা তো দ্রষ্টা। তোমাদের সামনেই ইতিহাস তৈরি হচ্ছে। তোমরা দেখে যাও — বিশ্বযুদ্ধ চলছে — ভয়ঙ্কর দিন আসছে — অনেক কিছু ঘটবে — তোমরা তো তরুণ — গভীর দৃষ্টি চাই।"*

ধন্যবাদ সুধাংশু—আপনার অবদান আমাদের হৃদয়ের গাঁথায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত হয়ে রইল। মানুষ জীবনানন্দের উদাসীনতা উৎসাহ প্রদান সবকিছুর প্রত্যক্ষ প্রমাণ যাদুঘরে সংরক্ষিত থাক বা না থাক, আমরা ধরে রইলাম।

দৃষ্টিনন্দন মধুরিমায় জীবনকে দেখার আনন্দ পেয়েছিলেন বলেই কবি শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পেরেছিলেন *"আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই প্রেমে"* ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েন থেকে কবির জীবনজিজ্ঞাসা জন্ম নিয়েছিল আমার মেনে নিতে মন সায় দেয় না। বিষণ্ণতাবোধ মনে হয় সার্থক কবিদের সার্থকতার চাবিকাঠি যার সূত্র স্থাপন করে দিয়ে গেলেন শেলি তাঁর স্কাইলার্ক কবিতায় '*our sweetest songs are those* ...' ইত্যাদি।

অলৌকিক আনন্দের ভার যে আধারকে আশ্রয় করে টিকে থাকতে পারে সেটাই তো না। তাই আনন্দ বেদনা একটা মুদ্রার দুটো দিক। জীবনানন্দের বিষণ্ন বাণী শোনার জন্য ৩ যে শ্রোতা সে কি কবির কম পাওয়া!

স্বদেশ পত্রিকার এই অপূর্ব প্রয়াসকে হৃদয়ের গভীরে শ্রদ্ধা জানাই। চোখের সামনে ভ ছে অসংখ্য জিজ্ঞাসুর চেহারা যারা এই ধরনের রচনার স্বাদ গ্রহণের জন্য উৎসুক চিত্তে পক্ষা করে ক্লান্ত হচ্ছে। তাদের মহৎ তৃষ্ণা, তৃষ্ণাই কি থেকে যাবে মহাকালে তরী তীরে স ভিড়া অবধি!

লেখিকা বিশিষ্ট কবি ও প্রাবন্ধিক, পেশায় শিক্ষিকা।

চিঠিপত্র

আপনাদের 'স্বদেশ' জীবনানন্দ সংখ্যাটি আমার হাতে এসেছে বেশ কিছুদিন আগে যদিও দেখা যাচ্ছে পত্রিকার প্রকাশকাল সেই জুন ২০০২ সাল। এর মাঝে আরও দু' সংখ্যা পেয়েছি দু'তিন পৃষ্ঠার। আমি খুবই দুঃখিত যে এত দেরিতে আমাকে লিখতে হল।

পত্রিকার প্রথম পাতায় লেখা আছে— প্রাপ্তি সংবাদ, কবিতা ও পাঠ-প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশিত। সে-জন্যে ধন্যবাদ। সত্যি বলতে কী আমি একটা দীর্ঘ উপন্যাস (১৯ ফ লেখার কাজে খুব বেশি ব্যস্ত ছিলাম। অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেরিয়েছে ২-৩ দিন আগে। এখন মনটা স্থির করে লিখতে বসলাম।

আমি জানি না আমার নাম, ঠিকানা কিংবা পরিচয় কীভাবে আপনারা পেলেন। আম নামটা পুরো নেই। বাড়ির নাম ভুল। তবে সংক্ষিপ্ত নাম দিয়ে ভালই করেছেন। আজকাল চিঠিপত্র হারায়। তবে খোলা ডাকের পত্রিকা হলে হারায় না। এ জন্যেই হয়তো পেয়ে আমার নাম খালেদা এদিব চৌধুরী।

যাক, এবার আপনাদের পত্রিকার কথা বলি। আমি খুব মন দিয়েই এ সংখ্যা পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে। জীবনানন্দ আমারও প্রিয় কবি। তাঁকে নিয়ে আপনাদের আয়োজন ও প্রচেষ্টা আমাকে মুগ্ধ করেছে। প্রতিটি প্রবন্ধ-নিবন্ধই খুব সিরিয়াস এবং লেখকে অন্তর্লোকের আলোকে উদ্ভাসিত। আমি সেই কোন অতীতে কলেজ জীবন থেকেই জীবনান পড়ি। তখন তো অনেক কিছু বুঝতাম না কিন্তু শব্দগুলো আমাকে আক্রান্ত করত — মনা কোন আলো-অন্ধকারের ছায়ায় তা টেনে নিয়ে যেত খুব মনে আছে। সে কত কথা!

আমি দু'চারটা প্রবন্ধ নিবন্ধ লিখেছি ওঁর উপরে। কিশোরদের জন্যে জীবনানে উপর আমার একটা বইও আছে। অথচ এই কবি কিশোরদের জন্যে কখনওই লিখেন আমার এই বইটি কলকাতার মার্কেটেও গিয়েছিল মুক্তধারা প্রকাশনীর মাধ্যমে। যাক্ এসব কথা।

আপনাদের সংখ্যাটির ঠিক সমালোচনা যে করব সে সময়ও আমার হাতে নেই তবে বলতে পারি সব লেখার মধ্যে অমরেন্দ্র গণাইর 'বনলতা সেন' এবং সুজিৎ চৌধুরী 'ইতিহাস ও জীবনানন্দ' আমাকে একটু বেশি আলোড়িত করেছে। তবে কোনও লে হালকা নয়। প্রত্যেক প্রবন্ধকারই নিজের লেখার ব্যাপারে ভীষণভাবে আন্তরিক ও সচেত

এমন একটি সুন্দর পত্রিকা করিমগঞ্জ—আসাম থেকে প্রকাশিত হয় এ আমার জ ছিল না। ১৯৭৪-৭৫ সালের পর থেকে কলকাতার অনেক লিটল-ম্যাগে লিখেছি। মাঝে হয়ে যায় নানা কারণে। এখন আবার দু'চারটা কাগজে যোগাযোগ করলে লেখা পাঠাই 'সাহিত্য সেতু', 'কোরক', 'লা-পয়েজি', 'গোধূলিমন', 'ইন্দ্রাণী' পত্রিকায় প্রচুর লিখেছি অনেকের সঙ্গেই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে গেছে। তবে কবি নির্মল বসাকের 'ইন্দ্রাণী' পত্রিক নিয়মিতই লিখি। উনি যোগাযোগ রাখেন। ইদানিং 'একই আকাশ' এবং 'দৌড়' পত্রি লিখেছি। 'একই আকাশ' পত্রিকা আমি পেয়েছি। কিন্তু 'দৌড়'-সম্পাদক কবি মধুমঙ্গল বি আমার লেখা পাঠানোর পর পত্রিকাই পাঠাননি। জানি না উনি তা পেয়েছেন কি না। আপনা পত্রিকায় তাঁর একটা চিঠি দেখলাম। কলকাতার সম্প্রতি প্রয়াত কবি মঞ্জুষ দাশগুপ্তের

মার বেশ কিছু কবিতা বিভিন্ন পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। মঞ্জুষ আমার বন্ধু। তবে কোনও কই আমাকে পত্রিকা পাঠাননি। কী আর করি। আশির দশকের প্রথম দিকে সুনীলদা'র য়ে আমার কবিতা 'দেশ'-এ ছাপা হত। এখন আর যায় না। সে যাকগে।

বরাক উপত্যকার অনেক কবি সাহিত্যিকের নাম উঠে এসেছে আপনার পত্রিকায়। তাদের জানতে ও চিনতে পারলাম। তা ভাল লাগছে। দেখলাম আপনারা 'বরাক কা বঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলন'ও করছেন।

আপনারা আমার সম্বন্ধে হয়তোবা কিছুই জানেন না। অথচ পত্রিকা পাঠাচ্ছেন। এটা ন্য আনন্দের। আমি মূলত কবিতা লিখি ষাটের মধ্যভাগ থেকে। এ ছাড়া শিশু গল্প উপন্যাসও কিছু কিছু লিখি। আমি এ দেশের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার 'বাংলা মি সাহিত্য পুরস্কার' পেয়েছি। এবং আরও কিছু ভাল পুরস্কারও পেয়েছি। আমি ব আমার কবিতা সমগ্র ক্যুরিয়ার ডাকে আপনাকে পাঠাতে।

আপনার পত্রিকার জন্যে কবিতা পাঠালাম। জীবনানন্দ সংখ্যাটা সমালোচনা করতে না সময়ের অভাবে। যদি পারি পাঠাব। হালকা সমালোচনা করতে চাই না।

পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সকল কবি-সাহিত্যিকদের আমার শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানাই। রক্ষা করতে চেষ্টা করব।

পনি আমার প্রীতি শুভেচ্ছা ও শ্রদ্ধা জানবেন।

ইতি

খালেদা এদিব চৌধুরী

ঢাকা, বাংলাদেশ

(২)

পনার সম্পাদিত স্বদেশ জীবনানন্দ সংখ্যাটি আমি গভীর মনোযোগ সহকারে রাক উপত্যকার ছোট্ট শহর করিমগঞ্জ থেকে এত সমৃদ্ধ রচনা সংগ্রহ কীভাবে া আমার কাছে আশ্চর্য লেগেছে।

ধুনিক বাংলা সাহিত্যের শক্তিমান কবি জীবনানন্দ দাশ। বাংলা দেশের সবুজ প্রকৃতি, মান্টিকতার এক আশ্চর্য ছোঁয়ায় কবি তাঁর কবিতার ভুবনকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর ডানার চিলের' সাথে ইংরেজ কবির 'Oh curlew cry no more in the air' ার আশ্চর্য মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ীবনানন্দ দাশকে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের নিকট নতুন করে উপস্থাপনার জন্য ানাই। যারা লেখা দিয়ে আপনার স্বদেশ ম্যাগাজিনকে সমৃদ্ধ করেছেন তাদেরকে ন্তরিক শুভেচ্ছা।

ানুষের জীবন অত্যন্ত গতিশীল। মানুষ প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতার সাথে সংগ্রাম করতে ক সময় ঝিমিয়ে পড়ে, হতাশ হয়। আবার নতুন করে বাঁচার শক্তি খুঁজে পায়। একঘেঁয়েমি ক্লান্তি অবসাদ থেকে একটু ভিন্নতার জন্য বেড়াতে আসবেন। এক জন্য আসলে সিলেটে যে সমৃদ্ধ সাহিত্যচর্চা হচ্ছে তার একটা ধারণা নিতে পারবেন।

ইতি

কাওছার রশিদ (বাহার)

জকিগঞ্জ, বাংলাদেশ

(৩)

'স্বদেশ' পত্রিকা জীবনানন্দ সংখ্যা পাঠানোর জন্যে ধন্যবাদ। এমন একটি জন্য ধন্যবাদ। জীবনানন্দ শতবর্ষে এত বেশি ও এত অহেতুক বিড়ম্বনা সংখ্যা বেরি এই ধরনের অপরিকল্পিত শ্রদ্ধা সংখ্যার নামে শ্রাদ্ধ সংখ্যায় বেশ ভীত হয়েছি।

আপনাদের সংখ্যায় কিছু মূল্যবান ও মননশীল লেখা পাওয়া গেল। ধন্যবাদ

সন্দীপ দত্ত
টেমার লেন, কলক

বাংলার বাইরে বাংলা কবিতা ১ম ও ২য় খ
প্রকাশ সাফল্যের পর বহির্বঙ্গের কবিদের
কবিতার সংকলন প্রকাশের কাজ চল
বহির্বঙ্গের কবিবন্ধুরা

দীপিকা বিশ্বাস

সম্পাদক , দৌড়
মিলন পল্লি, ডাক : হৃদয়পুর,
কলকাতা — ১২৭

ঠিকানায় চিঠিতে অথবা ফোনে

০৩৩-২৫৬২-৩৯৩৮

নম্বরে যোগাযোগ করুন।

নানন্দ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করছেন বিশিষ্ট জীবনানন্দ গবেষক তথা আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের যশস্বী অধ্যাপক ড০ তপোধীর ভট্টাচার্য।

বনানন্দ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সাহিত্য আসরে স্বরচিত পাঠ করে শোনাচ্ছেন কবি হাসনা আরা শেলি। পাশে রয়েছেন আসরের সভাপতি বিশিষ্ট কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী।

জীবনানন্দ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছে
অনুষ্ঠানের সভাপতি বিশিষ্ট কবি অনুরূপা বিশ্বাস।

জীবনানন্দ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রা
শিলচর গুরুচরণ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক তথা বাংলা সাহিত্যের
গবেষক ড০ বিশ্বতোষ চৌধুরী।

জীবনানন্দ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করে প্রাসঙ্গিক বক্তব্য রাখছেন বিশিষ্ট জীবনান
গবেষক ড০ তপোধীর ভট্টাচার্য।

জীবনানন্দ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখছেন
প্রাবন্ধিক সঞ্জীব দৈবজ্ঞ।

নাইনা চৌধুরী কর্তৃক স্বদেশ সাহিত্য প্রকাশনী, সেটেলমেন্ট রোড, করিমগঞ্জ থেকে প্রকা
মডার্ন প্রিন্টার্স, মেইন রোড, করিমগঞ্জ থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক (অবৈতনিক) ঃ মাশুক